লাহোর থেকে কান্দাহার
সৈয়দ মবনু

লাহোর থেকে কান্দাহার
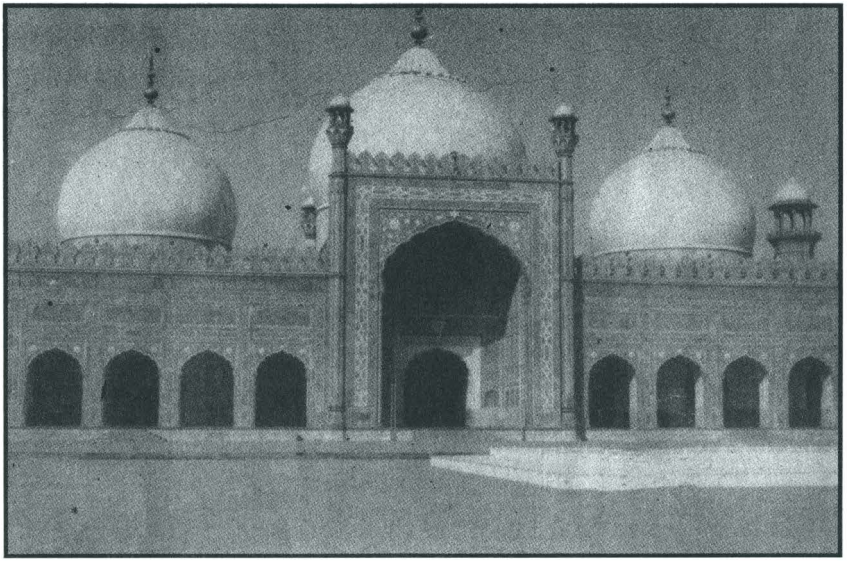
লাহোরের ঐতিহাসিক বাদশাহী মসজিদ
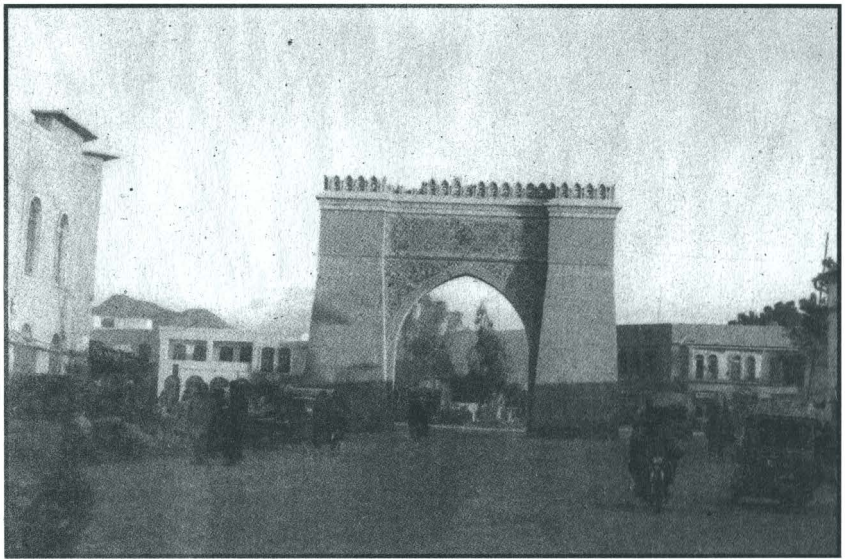
কান্দাহারঃ এই গেটের ভিতরে আমিরুল মুমিনীন মোল্লা মোহাম্মদ ওমরের প্রধান কার্যালয়

লাহোর থেকে কান্দাহার

সৈয়দ মবনু

আবাবীল পাবলিকেশন্স

লাহোর থেকে কান্দাহার
সৈয়দ মবনু

প্রকাশক
মুহাম্মদ মুহিউদ্দীন
আবাবীল পাবলিকেশন্স
১৩/১, কারকুন বাড়ী লেন
ঢাকা-১১০০

প্রথম প্রকাশ
আগস্ট ২০০০

দ্বিতীয় প্রকাশ
জুলাই ২০০১

গ্রাফিক্স ডিজাইন
কাভার স্ক্যান

মুদ্রণ
তিতাস প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং লিঃ

মূল্য ঃ নব্বই টাকা মাত্র

LAHORE THEKE KANDAHAR : BY SAYED MOBNU. PUBLISHED BY MUHAMMAD MUHIUDDIN FOR ABABIL PUBLICATIONS. FIRST EDITION AUGUST 2000. SECOND EDITION JULY 2001.

PRICE : TAKA 90.00 ONLY. US 6$

দু'আ

আমার কলিজার টুকরো—আত্মার অংশ
সৈয়দা মারহামা ও সৈয়দ মুজাদ্দিদ
তোমাদের ধমনীতে শহীদে কারবালার খুন প্রবাহিত।
তোমরা যেন তাঁরই আপোষহীন আদর্শে আজীবন বাতিলের মোকাবেলায় যুদ্ধ করার হিম্মত রাখ। তোমাদেরকে ইনসানে কামেল রূপে দেখার আকাংখায়

– তোমাদের জনক

দু'টি কথা

এক

পাকিস্তান গিয়েছিলাম কেন, আফগানিস্তান গেলাম কিভাবে, তা সামনে পাবেন। তবে এই বই লেখা হতো না, যদি লন্ডনের পাক্ষিক 'ইসলামিক সমাচার সম্পাদক আব্দুল মুখতার মুকিত তাড়া না দিতেন। তাঁর উৎসাহ, প্রেরণা এবং বার বার ফোন করে তাগিদ দেয়ার ফলে আমি গাফেল হয়ে বসে থাকতে পারিনি। আজ এই যা দাঁড়িয়েছে, তা তাঁরই উৎসাহের ফসল। যা দেখেছি ও জেনেছি, আমি এ বইয়ে তা-ই লিখেছি। বাকী বিবেচনা ও মূল্যায়নের দায়িত্ব সুপ্রিয় পাঠকের।

দুই

একটি ইংরেজী গানের কলি মনে পড়ছে– "No Woman No Cry" অর্থাৎ– নারী নেই, কান্নাও নেই। বিয়ের পর সত্যটা বুঝলাম। একদিন লেখার টেবিল থেকে পিছন ফিরে দেখি, আমার স্ত্রীর চোখ দিয়ে টপ-টপ করে অশ্রু ঝরছে। জানতে চাইলাম, ব্যাপার? সালমা বললো, এই সন্তানগুলো কি আমার একার?

ঃ তা হবে কেন!

ঃ যার যা পাওনা, তা আদায়ের নাম কি ইনসাফ নয়?

ঃ অবশ্যই।

ঃ এই বাচ্চা দু'টো পিতৃস্নেহ ও মমতার আশায় আব্বু আব্বু বলে সারাদিন তোমায় ডাকে; অথচ তুমি এদের দিকে একটুও ফিরে তাকাও না! তুমি কি মনে করো, সন্তানদের প্রতি তোমার কোন দায়িত্ব নেই?

–হ্যাঁ, আছে বটে। তবে তার জন্য আমাকে আর কয়েকটা দিন সময় দিতে হবে। "লাহোর থেকে কান্দাহার" মাঝপথে থেমে গেলে আর লেখা হবে না। ওয়াদা করছি, যদি কোনদিন এটি বই আকারে প্রকাশিত হয়, তবে এই ক'দিনের পিতৃস্নেহ ও মমতা থেকে বঞ্চিত সন্তানদের ইনসানে কামেল হওয়ার দোয়া দিয়ে বইটি পাঠকের হাতে তুলে দিব।

সৈয়দ মবনু

প্রকাশকের কথা

'লাহোর থেকে কান্দাহার'। নামে-ই বোঝা যাচ্ছে, এটি একটি ভ্রমণ-কাহিনী বিষয়ক বই। ঈমানদীপ্ত প্রবাসী যুবক সৈয়দ মবনু সাহেব তার সন্ধানী চোখে দেখা ইমারাতে ইসলামী আফগানিস্তানের বাস্তব চিত্র তুলে ধরেছেন বইটিতে। সেই সাথে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের বস্তুনিষ্ঠ মূল্যায়ন, পাকিস্তানের কয়েকজন বিখ্যাত রাজনীতিক-বুদ্ধিজীবি এবং কয়েকজন তালেবান মন্ত্রী-কমান্ডারের সাক্ষাৎকার বইটিকে অধিক সমৃদ্ধ করে তুলেছে। সব মিলিয়ে বলা যায়, এটি একটি সময়োচিত সাহসী শব্দচিত্র। বইটি বাংলাভাষী পাঠকদের চিন্তার জগতে আলোড়ন সৃষ্টি করতে সক্ষম হবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

সর্বাঙ্গীন নিখুঁত ও নির্ভুলভাবে আমরা বইটি পাঠকের হাতে তুলে দেয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করেছি। তবু ভুল-ত্রুটি থেকে যাওয়া স্বাভাবিক। তথ্যগত ভুলও থাকতে পারে। এ ব্যাপারে সুহৃদ পাঠকের হৃদ্যিক পরামর্শ একান্ত কাম্য।

বইটি আমাদের কাছে ভাল লেগেছে। আপনাদেরও ভাল লাগবে। সমাদৃত হবে সকল মহলে। এই বিশ্বাস ও আশায় 'লাহোর থেকে কান্দাহার' আপনাদের হাতে তুলে দিলাম। আল্লাহ্ আমাদের শ্রম স্বার্থক করুন। আমীন।

সূচীপত্র

বিসমিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম

পাকিস্তানের জন্মের সময় এ গ্রহে আমার অস্তিত্ব-ই ছিল না। পাকিস্তান ভেঙ্গে বাংলাদেশ হওয়ার সময় আমার বয়স মাত্র এক বছর। ইতিহাসের এই পর্ব আমার দৃষ্টির আড়ালে। আমাদের প্রজন্ম আজ বিভ্রান্ত ইতিহাসের এই পর্ব নিয়ে। ভারত-কেন্দ্রিকতার স্পর্শে ১৯৭১ সালের পর আমাদের ইতিহাস অস্পষ্ট। আমরা জানি পাকিস্তানের জন্ম হয়েছিল কালেমার শ্লোগানে। বলা হতো, "পাকিস্তান কা মতলব কেয়া-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌"। আবার আমরা জানলাম, পাকিস্তানী মুসলমানেরা ইসলামের নাম নিয়ে বাংলার মুসলমানদের উপর অকথ্য নির্যাতন চালিয়েছিল, মা-বোনদের ইজ্জত হরণ করেছিল। লুটে-পুটে নিয়ে গেছে ধন-মান-ইজ্জত। কেন? তারা এমন করলো কেন? আমরা কি অপরাধ করেছিলাম? তারা কি আমাদেরকে মুসলমান মনে করে না? না এটা ছিল নেতৃত্বের লড়াই? হতে পারে। আওয়ামী লীগ ও পিপল্‌স পার্টি দু'টি-ই কিন্তু সেক্যুলার সংগঠন। ওদের দ্বারা ইসলামের লালন ও প্রতিষ্ঠা আশা করা যায় না। পাকিস্তানের সাধারণ মানুষ কি জানে, ১৯৭১ সালে বাংলার মুসলমানদের উপর তারা কি নির্যাতন করেছিল?

পাকিস্তানের সাথে, পাকিস্তানের জন্মের সাথে বাংগালী মুসলমানদের একটা ঐতিহাসিক সম্পর্ক রয়েছে। বৃটিশবিরোধী আন্দোলনে হিন্দুদের বড় অংশই ছিল বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে। বিশেষ একটি অংশ ছিল বৃটিশবিরোধী আন্দোলনের সাথে। তাদের সাথে মুসলমানদের একটা সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। কিন্তু বিংশ শতকের শুরুতে তা-ও ভেঙ্গে গেল। ইংরেজরা যেহেতু মুসলিম শাসকদের কাছ থেকে ভারতবর্ষের ক্ষমতা অবৈধভাবে দখল করে নিয়েছিল, তাই মুসলমানদের ব্যাপারে তারা ছিল শংকিত। তাদের সংঘাতটা মুসলমানদের সাথেই বেশি ছিল।

হিন্দুরা এটাকে সুবর্ণ সুযোগ হিসেবে বিভিন্নভাবে ব্যবহার করেছে। তাদের মধ্যে যারা ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য লড়াই করেছে, তারা খুব সচেতন ছিল, যাতে মুসলমানরা ক্ষমতা ফিরে না পায়। হিন্দুদের এই ষড়যন্ত্রের নীল-নক্‌শা মুসলমানরা প্রত্যক্ষ করল বিশ শতকের শুরুতে। ভারতের বড় লর্ড কার্জনের সময় প্রশাসনিক সুবিধার্থে ১৯০৫ সালে উত্তর ও পূর্ব বাংলাকে আসামের সাথে যুক্ত করে 'পূর্ববঙ্গ ও আসাম' নামে একটি নতুন প্রদেশ সৃষ্টি করা হয়। এই প্রদেশের রাজধানী করা হয় ঢাকায়। এখানে একটি আইনসভাও প্রতিষ্ঠিত হয়। কংগ্রেসের হিন্দু মহাশয়গণ তা মেনে নিতে পারলেন

না। তারা জানতেন, যদি ঢাকা একটি প্রদেশের রাজধানী হয়ে যায়, তবে মুসলমানরা সুযোগ-সুবিধা পেয়ে যাবে। তাই তারা 'বঙ্গভঙ্গ রদ' আন্দোলন শুরু করলেন।

এই আন্দোলনের ফলে শেষ পর্যন্ত ভাইসরয় লর্ড হার্ডিঞ্জ বঙ্গ বিভাগ রদের সুপারিশ করেন। ১৯১১ সালের ১২ই ডিসেম্বর সম্রাট পঞ্চম জর্জের অভিষেক অনুষ্ঠান উপলক্ষে আহূত দিল্লীর দরবারে বঙ্গভঙ্গ রদের ঘোষণা করা হয়। এরপর মুসলমানরা স্পষ্ট বুঝে ফেলেন যে, এ্যালান অক্টোভিয়ান হিউম নামক ইংরেজের হাতে ১৮৮৫ সালে জন্ম নেয়া কংগ্রেসও মুসলমানদের মিত্র নয়। ইংরেজরা চাচ্ছে তাদের পর ভারতবর্ষে হিন্দুদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে। এই উদ্দেশ্যেই তারা কংগ্রেসের জন্ম দিয়েছে। কংগ্রেসের সাথে মুসলমানদের সহাবস্থান অসম্ভব। কংগ্রেসের মাধ্যমে মুসলমানদের কোন অধিকার আদায় দুঃস্বপ্ন বৈ নয়। তাই ১৯০৬ সালের ৩০শে ডিসেম্বর ঢাকায় উপমহাদেশের মুসলিম নেতৃবৃন্দের এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে নবাব সলিমুল্লাহ্‌র প্রস্তাব অনুসারে সর্বসম্মতিক্রমে 'নিখিল ভারত মুসলিম লীগ' প্রতিষ্ঠিত হয়। শেষ পর্যন্ত মুসলমানদের স্বতন্ত্র আবাসভূমি হিসেবে পাকিস্তানের জন্ম হয় এই মুসলিম লীগের আন্দোলনের মাধ্যমে।

মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র আবাসভূমির স্বপ্নদ্রষ্টা বিশ্ববিখ্যাত দার্শনিক কবিসম্রাট ড. আল্লামা ইকবাল। ১৯৩০ সালে তিনি এক ভাষণে মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র আবাসভূমির প্রস্তাব করেন। পরে ১৯৩৩ সালে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র চৌধুরী রহমত আলী সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম এলাকাগুলোর জন্য 'পাকিস্তান' নামের উদ্ভাবন করেন। এরপর আন্দোলন, নির্বাচন, রক্তপাতের মধ্য দিয়ে পাকিস্তানের জন্ম। এই পাকিস্তান কিংবা পাকিস্তানের চিন্তাই আসতো না, যদি বাংলার কৃতি সন্তান নবাব সলিমুল্লাহ্‌ মুসলিম লীগ গঠনের প্রস্তাব না করতেন। যদি শেরে বাংলা ফজলুল হক ১৯৪০-এর লাহোর অধিবেশনে ঐতিহাসিক প্রস্তাব না করতেন, তবে ভারতবর্ষে পাকিস্তান আন্দোলন গর্জে উঠতো না। যদি ১৯৪৬ সালে বাংলার মুসলমানরা মুসলিম লীগকে নির্বাচনে ভোট দিয়ে বিজয়ী না করতো, তবে ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্র বাস্তবে রূপ নিতো না। ১৯৪৬ সালে মুসলিম লীগের বিজয়ের জন্য যদি বাংলার মুসলিম লীগ নেতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী চেষ্টা না করতেন, তবে কি জিন্নাহ-লিয়াকত আলীরা বিজয়ের মালা গলায় পরে মুচকি হাসি হাসতে পারতেন? এখন প্রশ্ন হলো, যে বাংগালী মুসলমানেরা পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রের জন্ম দিলো, তারাই আবার কেন পাকিস্তান ভাংতে গেল?

এসব প্রশ্ন আমার এবং আমাদের প্রজন্মের অনেকের। এই প্রশ্নগুলোকে সামনে নিয়েই দীর্ঘদিন থেকে ভাবছি পাকিস্তান সফরে যাবো। শেষ পর্যন্ত আমি, আমার বন্ধু আবু উমর মোহাম্মদ মোস্তফা এবং আবুল কাসেম সিদ্ধান্ত নিলাম পাকিস্তান সফরের।

২৭শে ফেব্রুয়ারী ১৯৯৯ ইংরেজী সকাল ৯টায় আমরা বার্মিংহাম এয়ারপোর্ট থেকে কে.এল.এম. বিমানে পাকিস্তানের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করি। হল্যান্ডের আমস্টারডাম

বিমানবন্দর থেকে কে.এল.এম-০৪৪৯ ফ্লাইট আমাদেরকে নিয়ে একই দিন দুপুর ১টায় করাচীর উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করে।

করাচী এয়ারপোর্ট

আট ঘণ্টা চলার পর বিমান আকাশের কালো মেঘ ঠেলে নিচের দিকে নামতে থাকে। যেতে যেতে এক সময় সে তর্জনী দিয়ে দু'পা মাটিতে রাখলো। এরপরই এলিয়ে দিলো সমস্ত শরীর। সবার মধ্যে চাঞ্চল্য ভাব। অদৃশ্য কণ্ঠ থেকে ভেসে এলো, "সম্মানিত যাত্রীবৃন্দ! আমরা অত্যন্ত আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে, আমাদের প্লেন এই মাত্র করাচী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করেছে। আগামীতে আবারও দেখা হওয়ার প্রত্যাশা নিয়ে জানাচ্ছি যে, আপনাদের ভ্রমণ শুভ হোক।"

কর্তৃপক্ষের এই আশীর্বাদ বাণীটি ডাচ্, ইংরেজী ও উর্দুতে প্রচার করা হলো। উর্দু ভাষায় আনাড়ী একটা লোক এখানে উর্দু বলেছে। বিদেশী বিমানে বাংলা ভাষার ক্ষেত্রেও এই অসহনীয় বিষয়টা মাঝে-মধ্যে সহ্য করতে হয়েছে। আমরা এতো টাকা দিয়ে যাদের প্লেনে ভ্রমণ করি, তারা কি আমাদের স্বার্থে একজন বিশুদ্ধ বাংলাভাষী বাংলাদেশীকে চাকরি দিতে পারে না? কে.এল.এম-০৪৪৯ তার নির্ধারিত গেইটে থামলো।

করাচী বিমানবন্দর (যাকে উর্দু ভাষায় 'হাওয়ায়ী আড্ডাখানা' বলে) এর আন্তর্জাতিক কাস্টম লাউঞ্জে পা দিতেই স্মরণ হলো আমার সোনার বাংলার জিয়া আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কথা। না, কোন ব্যবধান নেই। এখানেও দালালরা আছে। আমাদেরকে দালালদের সামনে দাঁড়াতে হয়েছে। ইমিগ্রেশন লাইনে দাঁড়ানো অবস্থায় তারা জানতে চাইলো, "স্যার! মাল তো জিয়াদা নেহি, আগার চাহে তো হাম মদদ কর সেকতে?" একজন নয়, এক এক করে পাঁচজন একই কথা বললো। অবশেষে একজনকে আমার অসহ্যের কথা জানিয়েই দিলাম। এর পর আর কেউ আসেনি। পানির মত পরিষ্কার আমাদের কাগজপত্র, ভিসা-পাসপোর্ট সব কিছু। দালালের কি প্রয়োজন? ইমিগ্রেশন শেষে বেরিয়ে দেখি খলিল দাঁড়িয়ে। বার্মিংহামের লোক। লেখাপড়া করে করাচীতে। তার সাথে টেলিফোনে আগে যোগাযোগ হয়েছে। একশ রুপী দিয়ে গাড়ি ভাড়া করা হলো। মাল-পত্র সহ আমরা গাড়িতে উঠলাম। ড্রাইভার পুলিশকে সেলামি দিয়ে যাত্রা শুরু করলো।

গাড়ি এসে থামলো গুরু মন্দির কলোনিতে। দেখতে প্রায় আজিমপুর কলোনির মতো। ভাড়া পরিশোধ করে আমরা হাঁটতে শুরু করি। সিঁড়ি ভেঙ্গে উপরে উঠতে উঠতে ক্লান্ত হয়ে গেলাম। পাঁচ তলার উপর খলিলের ফ্ল্যাট। উঠতে একটু কষ্ট হলেও ফ্ল্যাটের পরিবেশ খুব মনোরম। খলিলের সাথী মাওলানা শামীম আমাদের জন্য খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করেছেন। আমরা সবাই মজা করে খেলাম। এখন ঘুমাবার পালা। রুমে ফ্যান থাকলেও আমরা ব্যবহার করিনি। শত গরম হলেও ফ্যান চালিয়ে ঘুমাতে আমার অসহ্য লাগে। জানালা খোলা। জানালা দিয়ে আরামদায়ক কুদরতি বাতাস আসছিলো। একটু আয়েশ করেই ঘুমালাম।

ফজরে ঘুম ভাংলো চারদিকে আজানের ধ্বনি শোনে। শয়তান এসে বিছানা গরম করছে, যাতে না উঠি। ইস্তেগফার করতে করতে উঠে গেলাম। অজু করে নামাজ পড়ে কুরআন তেলাওয়াতে বসলাম। দীর্ঘদিন পর সকালের কুরআন তেলাওয়াতের সাথে কাকের কা-কা, চড়ুই-এর কিচির-মিচির শুনতে খুব মধুর লাগছে। বৃটেনে সাধারণত এমন পরিবেশ পাওয়া দুষ্কর। তেলাওয়াত শেষে খোলা জানালার সামনে এসে দাঁড়ালাম।

মুক্ত বাতাসের একরাশ ঝাপ্টা এসে লাগলো শরীরে । এই ফ্ল্যাট শহর থেকে অনেক উঁচুতে। এর বাতাসে শহরের কোলাহলের স্পর্শ নেই। আরব সাগরের কোল ঘেঁষে গড়ে উঠেছে করাচী শহর। এক সময় এটি পাকিস্তানের রাজধানী ছিল। পরে তা পরিবর্তন করে ইসলামাবাদে নিয়ে যাওয়া হয়। পাকিস্তানের বিশিষ্ট রাজনীতিক ড. ইসরার আহমাদের মতে, পাকিস্তান ভাঙ্গার কারণগুলোর মধ্যে একটি হচ্ছে রাজধানী পরিবর্তন।

(নেদায়ে খেলাফত, ডিসেম্বর ১৯৯৬ সংখ্যা)

করাচী শহরের ভেতরে প্রবেশ করলে বোঝা-ই যায় না যে, এটা সাগর-তীরের শহর। তবে খলিলের ফ্ল্যাট থেকে কিছুটা অনুভব করা যায়। বাতাসে একটু একটু ঠান্ডা লাগছে। খলিলের ফ্ল্যাটের সবচাইতে আকর্ষণীয় বস্তু হলো কলিং বেল। টিপ দিলেই বলে উঠে–"আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ"।

জানালার সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে এক সময় ভুলে গেলাম নিজের অবস্থান। এর মধ্যে কে একজন কলিং বেল টিপলো। দু'তিনজন এক সাথে প্রবেশ করলেন। বাংলায় কথা বলছেন। বুঝলাম, তারা বাঙালী। পরে বুঝলাম, তারা এসেছেন আমাদের সাথে দেখা করতে। তাদের সাথে পরিচয় হলো। কথা হলো, তাদেরকে সাথে নিয়ে ঘুরে দেখব করাচী শহর।

রশীদ ট্রাস্টের মসজিদ

বিরাট বিরাট এলাকা নিয়ে পাকিস্তানে এক একটি কলোনী গড়ে উঠেছে। এর একটি মুজাহিদ কলোনী। মুজাহিদ কলোনী নাম শুনে কেউ ভয় পেয়ে যেতে পারেন। তবে ভয়ের কিছু নেই। নামে মুজাহিদ কলোনী হলেও এটি একটি সাধারণ মহল্লা। আসরের নামাজের সময় আমরা মুজাহিদ কলোনীতে পৌছলাম। এখানেও একটি মাদ্রাসা রয়েছে। মাদ্রাসার পাশেই রশীদ ট্রাস্ট। মুফতী রশীদ আহমদ সাহেবের নামানুসারে এর প্রতিষ্ঠা। এই ট্রাস্টে রয়েছে মাদ্রাসা, মসজিদ, দারুল ইফ্তা। 'জরবে মুমিন' নামক একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয় এখান থেকে। মুফতী রশীদ আহমদ বর্তমান পাকিস্তানের একজন বয়োঃবৃদ্ধ বিজ্ঞ আলেম। আমরা তাঁর মসজিদে আসরের নামাজ পড়তে গেলাম।

এক আশ্চর্য অবস্থা। মসজিদের গেইটের দু'পাশে দু'টি সামরিক চৌকি। পাকিস্তানে অবস্থানকালে আমি যে দিন যে মুহূর্তে এই চৌকির ছিদ্রগুলোর দিকে দৃষ্টি দিয়েছি, তখনই দেখেছি সতর্ক প্রহরীর জোড়া জোড়া চোখ। অর্থাৎ প্রতি মুহূর্ত সতর্ক পাহারা চলছে। এছাড়া মসজিদের গেইটের বাইরে একজন এবং ভেতরে একজন ক্লাশিনকভ নিয়ে দাঁড়িয়ে। অপর একজন প্রহরী প্রবেশরত মুসল্লীদেরকে তন্ন তন্ন করে তল্লাশী করছেন। আমরা সকল ঝামেলা শেষে ভেতরে গেলাম। জামাত শুরু হওয়ার দু'এক মিনিট পূর্বে আরেকজন ক্লাশিনকভ নিয়ে মসজিদের আঙ্গিনার দিকে এগিয়ে গেলেন। খুব সতর্ক দৃষ্টিতে চারদিকে দেখলেন। তারপর চলে গেলেন। কিছু সময় পর ইমাম সাহেবকে সাথে নিয়ে ফিরে এলেন। এই ইমাম সাহেবই হচ্ছেন মুফতী রশিদ আহমদ সাহেব। জামাত শুরু হলো। মসজিদের মিম্বরের উপর ক্লাসিনকভ হাতে একজন দাঁড়িয়ে রইলেন। হয়তো তিনি আগে নামাজ পড়ে নিয়েছেন। অথবা পরে পড়বেন। যদি করাচী প্রবাসী সাথী আগে আমাকে এসব দৃশ্যের কথা না বলতেন, তবে হয়তো এসব দেখে আমি ভয়-ই পেতাম।

দৃশ্যটা খুবই অসহ্য। যুদ্ধের ময়দান কিংবা ফিলিস্তিন, কাশ্মীর, ভারত হলে তা মেনে নেওয়া যেত। পাকিস্তানের মতো একটি মুসলিম দেশ, যার জন্ম ইসলামের ভিত্তিতে, সেখানে এই দৃশ্য কষ্টদায়ক। এটা হয়েছে শিয়া-সুন্নী সংঘাতের কারণে। বছর দুয়েক আগে শিয়ারা এই মসজিদে ব্রাশ ফায়ার করে সেজদারত পাঁচ-ছয়জন মুসল্লীকে শহীদ করেছিল। তাই মসজিদ কর্তৃপক্ষ এই ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হয়েছে। শিয়াদের ভয়ে শুধু এই মসজিদ-মাদ্রাসাই নয়, বরং গোটা পাকিস্তানের সকল মসজিদ-মাদ্রাসায় কমবেশি এমন অবস্থা। আসরের নামাজ পড়ে আমরা চলে আসি।

করাচীর বাঙালী

করাচীতে যে এত বাঙালীর বসবাস, তা আমার আগে জানা ছিল না। ইংল্যান্ডের বাঙালীদের মত করাচীর বাঙালীরা প্রায় স্থায়ী হয়ে গেছে। সেখানে বয়স্করা ভালোভাবে বাংলায় কথা বলতে পারলেও নতুন প্রজন্ম উর্দু মিশিয়ে বাংলাকে খিচুড়ি করে ফেলে। নতুন প্রজন্মের বাঙালীকে পাকিস্তানে ঠাট্টা করে অনেকে 'ফটোস্ট্যাট বাঙালী' বলে। বিশেষণটা আমার কাছে এক প্রকারের গালি মনে হয়েছে। যাদেরকে সম্ভব হয়েছে, নিষেধ করেছি এমন শব্দ ব্যবহার করতে। ওদের পরিচিতি হতে পারে 'পাকিস্তানী বাঙালী'।

মাওলানা শামীমকে নিয়ে তিনহাট্টি বাঙালী কলোনীতে গেলাম। টেক্সি থেকে নেমে বস্তির ভেতরে যাওয়ার পথেই দেখা হলো মাওলানা ইউনুসের সাথে। তিনি স্থানীয় বাঙালী মসজিদের ইমাম। মাওলানা শামীমের তিনি পূর্ব পরিচিত। আমাদের পরিচয় করিয়ে দেয়া হলো। হুজরাখানায় (ইমাম সাহেবের ঘর) আমাদেরকে নিয়ে যাওয়া হলো। অল্প সময়ের মধ্যে বেশ কিছু বাঙালী সমবেত হয়ে গেল।

তাদের কাছে জানতে চাইলাম, করাচীতে আপনারা কিভাবে অবস্থান করছেন?

তাদের মধ্যে সবচাইতে যিনি বেশী বয়স্ক, তিনি উত্তর দিলেন, আমাদের অনেকেই এসেছে ত্রিশ-চল্লিশ বছর পূর্বে। পাকিস্তান তখন এক ছিল। আর অনেকে এসেছে ১৯৭১ সালের পর। এসেছে দেশের আর্থিক ও সামাজিক অবস্থা খারাপ হয়ে যাওয়ার কারণে। এখানে সরকারীভাবে বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা পাওয়ায় শেষ পর্যন্ত অনেকে দেশ থেকে পরিবার-পরিজন নিয়ে এসেছে। এরপর আস্তে আস্তে সরকারী খাস জমির উপর বাড়ী-ঘর তৈরী করে বস্তির পর বস্তি গড়ে তুলেছে। করাচীতে প্রচুর বাঙালী বস্তি রয়েছে। সরকারী হিসাব অনুযায়ী গোটা পাকিস্তানে আট-দশ লাখ বাঙালী রয়েছে। মুসলিম লীগ সরকার তাদের অনেককে 'শনাক্তি কার্ড' অর্থাৎ নাগরিকত্ব দিয়েছে এবং অনেককে কাজের অনুমতিক্রমে সেটেল করার চিন্তা করেছিল। অবশ্য পুরাতন অনেকেরই শনাক্তি কার্ড আছে। তা ছাড়া এখানে ছাত্র ভিসায়ও প্রচুর বাঙালী আছে।

ঃ সরকারের এই উদ্যোগে আপনারা কতটুকু খুশি?

ঃ হ্যাঁ! আমরাও চাই এমন একটা কিছু হোক।

জানতে চাইলাম, পাকিস্তানের সরকার ও সাধারণ মানুষ বাঙালীদের সাথে কি ধরনের ব্যবহার করে?

তাদের মধ্য থেকে একজন উত্তর দিলেন, বর্তমান সরকারের ব্যবহার ভালো। বেনজীর ভুট্টোর দল ক্ষমতায় এলে বাঙালীদের খুব নির্যাতন করে। বর্তমানে আমাদেরকে পানি, গ্যাস, বিদ্যুৎ দেওয়া হয়েছে। বেনজীর ভুট্টোর সময় বাঙালীদেরকে পিপলস্ পার্টি ও আলতাফ হোসেনের কওমী মুহাজির দলের কর্মীদের সাথে পুলিশও নির্যাতন করতো। ১৯৭১-এর হিংসায় ভুট্টোর দল বাঙালীদেরকে সহ্যই করতে পারে না। নওয়াজ শরীফ ক্ষমতায় আসার পর অবস্থার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। মুসলিম লীগ সর্বদাই বাঙালীদেরকে সমীহ করে। মাঝে-মধ্যে দু' একজন ছাড়া এবং পিপলস্ পার্টির কর্মী ও নেতারা ছাড়া বাকি লোকদের স্পষ্ট বক্তব্য যে, দুই নেতায় ক্ষমতা নিয়ে যুদ্ধ করে পাকিস্তান ভেঙ্গেছে। সাধারণ মানুষের কোন দোষ নেই। সৈন্যরা যে নির্যাতন করেছে, তা অন্যায়। যাদের মধ্যে ইসলামী চেতনা আছে, তারা মনে করে, বাঙালী, পাকিস্তানী বড় কথা নয়। আমরা সবাই মুসলমান। ১৯৭১ সালে পাকিস্তানের উভয় অংশে যারা নেতৃত্বে ছিল, তাদের বেশির ভাগ ছিল ধর্মীয় অনুশাসনের প্রতি অনুরাগ ও অনুভূতিশূন্য।

ঃ আলতাফ হোসেন মুহাজিরদের নেতা। আর আপনারা মুহাজির। সমস্যাটা কোথায়?

ঃ আলতাফ হোসেন চাপাবাজ ও সন্ত্রাসী। মুহাজিরদের নাম ভাঙ্গিয়ে সে ও তার দলের লোকেরা মস্তানী এবং আয়েশ-বিলাস করছে। সে চেয়েছিল আমরা তাকে সমর্থন করি। কিন্তু আমরা তা করিনি। কোন ভাল লোক তাকে সমর্থন করতে পারে না। তাই সে নারাজ।

আপনাদের ইমিগ্রেশনের অবস্থা কি?

ঃ আমাদের অনেকের শনাক্তি কার্ড আছে। আবার অনেকের নেই। মুহাজির কওমী দলও বিহারীদের সংগঠন। তারা চায় আমরা বাংলাদেশে চলে যাই। আর বাংলাদেশ থেকে বিহারীরা ফিরে আসুক। এ নিয়ে আগে হাঙ্গামা হতো প্রায়ই। বর্তমানে দেশে ফৌজী শাসন (সামরিক শাসন) চলছে, তাই অবস্থা এখন শান্ত।

ঃ শুনলাম, এখানে পাকিস্তানীরা বাঙালীদেরকে কাজ করিয়ে পয়সা দেয় না। এটা কি সত্য?

ঃ এমন ঘটনা আমাদের জানা নেই। তাছাড়া বর্তমানে সব বিষয়কে রাজনীতির আলোকে বিচার করা হয়। রাজনীতিকরা তিলকে তাল বানায়। বাংলাদেশে কি এমন ঘটনা ঘটে না যে, কাজ করিয়ে পয়সা দেয়া হয় না?

ঃ বাংলাদেশের বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ হলো, করাচীর বাঙালী মহিলারা বেশির ভাগ দেহ ব্যবসার সাথে জড়িত। এখানে না-কি প্রকাশ্যে বাঙালী নারী ক্রয়-বিক্রয় হয়। এসব কি সত্য?

ঃ এসব ডাহা মিথ্যা কথা। বাংলাদেশের নারায়ণগঞ্জ কিংবা ইংলিশ রোড গিয়ে যদি কেউ বলে, বাংলাদেশে বেশির ভাগ মহিলা পতিতা, তবে কি সত্য হবে?

শয়তানী সব স্থানেই কমবেশি আছে। তবে নারায়ণগঞ্জ বা ইংলিশ রোডের মতো প্রকাশ্য নয়। তাছাড়া ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যাপারটা প্রকাশ্য হাট-বাজারের কোন বিষয় নয়। আমাদের দেশে যেভাবে বিয়ের সময় বরকে কনে পক্ষের যৌতুক দিতে হয়, তেমনি এখানের কিছু কিছু গোত্রে কনে পক্ষকে বর পক্ষের টাকা দিতে হয়। কখনো এই টাকার পরিমাণ খুব বেশি হয়ে থাকে। তাই অনেকে আর্থিক অসামর্থের কারণে নিজের গোত্রে বিয়ে করতে না পেরে অন্য গোত্রে বিয়ে করে। এই সুযোগে আমাদের কিছু কাণ্ডজ্ঞানহীন বদমাশ বাঙালী দেশ থেকে মহিলা নিয়ে আসে এবং নিজে গার্জিয়ান হয়ে টাকার বিনিময়ে তাদের বিয়ে দেয়। তবে এসব চলে অতি গোপনে।

ঃ আপনারা কি বর্তমানে এখানে খুব সুখে আছেন?

ঃ আলহামদু লিল্লাহ, আল্লাহ্ আমাদের সুখে রেখেছেন। আল্লাহ্ ছাড়া কে সুখী করতে পারে?

ঃ এই মসজিদটি কি বাঙালীদের দ্বারা পরিচালিত?

ঃ হ্যাঁ, এই মসজিদটি বাঙালীদের দ্বারা পরিচালিত। এছাড়া এই বস্তিতে বাঙালীদের আরো সাতটি মসজিদ আছে । তবে এটা প্রথম মসজিদ। প্রত্যেক মসজিদে মক্তব, মাদ্রাসা ও হিফজখানা আছে। এই যে বিরাট বস্তি দেখছেন, এটি এক সময় জঙ্গল ছিল।

ঃ এখানে বাঙালীরা সাধারণত কি কাজ করে?

ঃ বেশির ভাগই গার্মেন্টসে।

ঃ বেতন কেমন?

ঃ পিস ওয়ার্ক। কেউ দশ-বিশ হাজার রূপীও রোজগার করছে। আর সর্বনিম্ন দু-তিন হাজার।

ঃ ছেলে-মেয়েদের লেখা-পড়ার কি ব্যবস্থা?

ঃ স্কুলে যায়। প্রতিটি মহল্লায় মাদ্রাসা আছে। যাদের উৎসাহ নেই, তারা নিরক্ষর থাকছে।

দীর্ঘ আলোচনার ফাঁকে ফাঁকে চা-বিস্কুট-পানের ব্যবস্থাও ছিল। তাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বের হওয়ার পথে দেখলাম, এক দোকানের সাইনবোর্ডে বাংলায় লেখা 'হাশেম রেকর্ডিং হাউস। এখানে বাংলা পত্রিকা, ম্যাগাজিন, ক্যাসেট, বই ইত্যাদি পাওয়া যায়।' এছাড়া সাথে একটা পানের দোকানও আছে। পান খাওয়ার বাহানা করে দোকানের মালিকের সাথে কথা বললাম। শেষ পর্যন্ত লোকটা পানের দাম নিলো না। বরং চা-বিস্কুটের ব্যবস্থা করলো। দেখতে দেখতে প্রচুর লোকের সমাগম হয়ে গেল। সবাই বাঙালী। বেশির ভাগ নোয়াখালী ও ফরিদপুরের লোক। তাদের সাথে কিছুক্ষণ আলাপ-আলোচনা করে বিদায় হলাম। টেক্সি পাওয়া যাচ্ছে না। তাই বাসে উঠলাম। পাকিস্তানের বাস এমনভাবে সাজানো, যেন ময়ূরপঙ্খী। রাত তখন প্রায় বারোটা।

পাকিস্তানের যানবাহন

এক শহর থেকে অন্য শহরে যাওয়ার জন্য প্লেন, ট্রেন, বাস ও উন্নতমানের কোচ রয়েছে। ট্রেনে আবার রয়েছে বিভিন্ন শ্রেণীর আসন। লোকাল বাস সার্ভিস আছে। টেক্সি ও রিক্সা আছে। টেক্সি হলো কার। আর রিক্সা হলো বেবি টেক্সি। সেখানে টেক্সি-কার বেশির ভাগ চলে গ্যাস দিয়ে। অর্থাৎ পেট্রোলের প্রয়োজন হয় না। বেশির ভাগ গাড়ী দেশীয় কারখানায় তৈরী। আমাদের দেশে যাকে রিক্সা বলা হয়, পাকিস্তানে তা নেই। সেখানে টেক্সি ও রিক্সায় মিটার লাগানো আছে। তবে বেশির ভাগ মিটার খারাপ। ভাড়া প্রতি মিটার বর্তমানে তিন রূপী। ড্রাইভাররা মিটার হিসাবে যেতে চায় না। তারা চুক্তিভিত্তিক যেতে চায়। ড্রাইভার যদি পাঞ্জাবী হয়, তবে সাবধান। ওরা ঝামেলায় উস্তাদ। অন্যরা কেউ ভালো; কেউ খারাপ। আর যদি ড্রাইভার পাঠান হয়, তবে নিরানব্বই ভাগ ভরসা করা যায়। ওরা হলো এক দম এক কথার লোক।

মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ-র কবর

১৯০৬ সালের ৩০শে ডিসেম্বর ঢাকায় নবাব সলিমুল্লাহর উদ্যোগে মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই মুসলিম লীগের নেতৃত্বেই পরবর্তীতে মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র

আবাসভূমি হিসাবে পাকিস্তানের জন্ম। মুসলিম লীগ যদিও ভারতের মুসলমানদের অধিকার আদায়ের আন্দোলনের পটভূমিতে সৃষ্টি হয়েছিলো, কিন্তু জিন্নাহর নেতৃত্বের পূর্ব পর্যন্ত মুসলিম লীগ কোন গণসংগঠন ছিলো না। বরং তা ছিলো স্যার-নবাবদের 'ড্রইংরুম' সংগঠন।

মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর নেতৃত্বে মুসলিম লীগ একটি গণসংগঠনের রূপ নেয় এবং পাকিস্তান আন্দোলনকে শক্তিশালী করে। এরপর ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রের জন্ম হয়। ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাসে জিন্নাহ একটি অনিবার্য অধ্যায়। কেউ চাইলেও তাঁকে বাদ দিতে পারবে না। ইসলামের দৃষ্টিতে বিবেচনা করলে জিন্নাহ নেতৃত্বের কতটুকু যোগ্য ছিলেন, তা চিন্তার বিষয়। তবে জাগতিক দৃষ্টিতে, পাশ্চাত্যের রাজনীতির মানদণ্ডে জিন্নাহ বড় নেতাদের একজন ছিলেন।

করাচীতে জিন্নাহর কবর। ভাবলাম একটু দেখা প্রয়োজন। মাওলানা শামীমকে নিয়ে বাদ ফজর বের হয়ে গেলাম। সাথে আবুল কাসেম। বিরাট এলাকা নিয়ে কবর চত্বর। প্লান করে বিভিন্ন প্রকার গাছ লাগানো। প্রবেশ পথে বিরাট রাস্তার মধ্যখানে পানির ফোয়ারা। এরপর মর্মর পাথরের সিঁড়ি। অতঃপর গম্বুজের আদলে বিরাট সমাধি সৌধ। এই সৌধের ভেতর মরহুম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর কবর। সবকিছু মর্মর পাথরের। মূল কবর দু'টি গ্যালারী দিয়ে বেষ্টিত। এর একটি সম্পূর্ণ সোনার এবং একটি রূপার। (আমি কিন্তু সোনা-রূপা পরীক্ষা করিনি। দেখতে সোনা-রূপার মতো লেগেছে। আমার সাথীরা বলেছে এগুলো সোনার তৈরী।)

কবরের চারদিকে চারজন স্বশস্ত্র সৈন্য দাঁড়িয়ে। বাইরেও সৈন্য রয়েছে। ওরা কিছুক্ষণ পর পর স্যালুট দিচ্ছে। মনে মনে ভাবলাম, হায় রে নেতা! মরেও তোমাদের স্বশস্ত্র সৈন্যের বেষ্টনিতে থাকতে হচ্ছে। কোথায় রাসূল (সাঃ)-এর আদর্শ আর কোথায় তোমাদের অবস্থান। যেমন খলীফা রেখে গেছ, তেমনি ব্যবহার পাচ্ছ। কবরের উপরের মতো ভেতর না হলে সবই ব্যর্থ। আল্লাহ্ মাফ করুন এই জাতিকে। রক্ষা করুন আমাদের সবাইকে বিদ'আত, অপচয় ও কবর পূজা থেকে।

মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর কবর চত্বরের নিকটেই তাঁর বোন ফাতেমা জিন্নাহ্, পাকিস্তানের প্রথম প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান, যাকে 'শহীদে মিল্লাত' বলা হয়। কারণ ১৯৫১ সালে তিনি আততায়ীর হাতে নিহত হয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী থাকা অবস্থায়। পূর্ব পাকিস্তানের এক সময়ের গভর্নর নূরুল আমীনের কবর। সবই মর্মর পাথরে সোভিত।

আল্লাহ্র ঘরের দৈন্যদশা

মহানবী (সাঃ) বিদায় হজ্বের ভাষণে যে সকল উপদেশ বাণী উম্মতের উদ্দেশে বলে গেছেন, তার মধ্যে একটি হলো ঃ "তোমরা অন্যান্য জাতির মতো আমার কবরকে

ঢালাই করো না। তোমরা আমার অবর্তমানে কবর পূজায় লিপ্ত হয়ো না।" কিন্তু আজ আমরা করছি তার বিপরীত। অত্যন্ত দুঃখজনক ব্যাপার হলো যে, জিন্নাহ সাহেব ও তাঁর 'খলীফাদের' এত সুন্দর সুন্দর কবরের পাশে যে মসজিদখানা রয়েছে, সেটির দেয়াল রং-প্লাস্টার ছাড়া অসমাপ্ত বলে মনে হল। যদি দেওয়ালের গায়ে "ইয়ে মসজিদ হে" লেখা না থাকতো, তবে আমরা এটাকে মসজিদ বলে বুঝতে-ই পারতাম না। একটি মুসলিম দেশের প্রধান শহরের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে আল্লাহ্‌র ঘর মসজিদের এই দৈন্যাবস্থা সত্যিই দুঃখজনক। অন্য কোথাও এমন অবস্থা হলে মেনে নেয়া যেত। কিন্তু মর্মর পাথরের ঢালাইকৃত কবরসমূহের পাশে একটা মসজিদের এই করুণ অবস্থা মেনে নেওয়া যায় না।

শায়খুল ইসলামের মাজারে কিছুক্ষণ

জিন্নাহর কবর জিয়ারত করে হাঁটতে হাঁটতে চলে আসি শায়খুল ইসলাম আল্লামা শাব্বীর আহমদ ওসমানী (রহঃ)-এর মাজারে। আল্লামা শাব্বীর আহমদ ওসমানী (রহঃ) দারুল উলূম দেওবন্দের হাদীসের শিক্ষক ছাড়াও একজন বিজ্ঞ রাজনীতিক ছিলেন। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনে তিনি শায়খুল হিন্দ মাহমুদুল হাসান দেওবন্দী (রহঃ)-এর শিষ্য ছিলেন। শায়খুল হিন্দ মাহমুদুল হাসান (রহঃ) ছিলেন বৃটিশবিরোধী আন্দোলনের এক বীর পুরুষ ।

১৮০৩ সালে ইংরেজ কর্তৃক মুসলিম ভারতের প্রাণকেন্দ্র দিল্লী দখলের পর যখন ঘোষণা করা হলো- "এখন থেকে ভারতবর্ষের শাসনতান্ত্রিক নীতি হবে-সৃষ্টি স্রষ্টার, সাম্রাজ্য সম্রাটের আর কর্তৃত্ব থাকবে কোম্পানী বাহাদুরের"। তখন শাহ আব্দুল আজিজ মুহাদ্দিসে দেহলবী (রহঃ) হাদীসের উদাহরণ দিয়ে ঘোষণা দিয়েছিলেন, "এখন থেকে ভারতবর্ষ দারুল ইসলাম নয়; বরং দারুল হরব। কাজেই আগ্রাসী শক্তিকে রুখে দাঁড়ানো এবং জিহাদে অবতীর্ণ হওয়া প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ফরজ, অলংঘনীয় কর্তব্য।" (তাহরীকে দেওবন্দ-মাওঃ মুশতাক আহমদ)

শায়খুল হিন্দ মাহমুদুল হাসান (রহঃ) পরবর্তীকালে শাহ আব্দুল আজিজ (রহঃ)-এর জিহাদী আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনের এক পর্যায়ে শায়খুল হিন্দ মক্কা শরীফে যান এবং তাঁর শিষ্য উবায়দুল্লাহ সিন্ধী (রহঃ)-কে কাবুলে জিহাদ প্রশিক্ষণের জন্য প্রেরণ করেন। হযরত সিন্ধী (রহঃ) কাবুল থেকে শায়খুল হিন্দের কাছে তিন টুকরো রেশমী কাপড়ে প্রস্তুতি ও আন্দোলনের অবস্থা বর্ণনা করে পত্র লিখেন। কিন্তু গাদ্দারের গাদ্দারির ফলে সেই পত্র পাঞ্জাবের গভর্নর মাইকেল ওভায়েলের হাতে পৌছে যায়। শেষ পর্যন্ত এই রেশমী রুমাল মামলায় মক্কা থেকে শায়খুল হিন্দকে গ্রেফতার করে এনে ভূমধ্য সাগরীয় দ্বীপ মাল্টার জেলে বন্দী করা হয়। ইতিহাসে এই আন্দোলন 'রেশমী রুমাল আন্দোলন' নামে খ্যাত।

শায়খুল হিন্দ (রহঃ)-এর ইচ্ছে ছিলো তাঁর ইন্তেকালের পর এই জিহাদী আন্দোলনের নেতৃত্ব দেবেন তাঁরই শিষ্য মাওলানা আবুল কালাম আজাদ। তাই তিনি জীবনের শেষপ্রান্তে দাঁড়িয়ে এক বৈঠকে বলেছিলেন, "ভারতবর্ষে আর শায়খুল হিন্দের প্রয়োজন নেই। এখন প্রয়োজন ইমামুল হিন্দের। আমি মনে করি, বয়সে তরুণ হলেও মাওলানা আবুল কালাম সেই যোগ্যতা রাখে।"

'ইমামুল হিন্দ' পদবী নিয়ে সে দিনের বৈঠকে মতানৈক্য দেখা দিয়েছিলো। সেই বৈঠক অসমাপ্ত থেকে যায়। পরবর্তী বৈঠক পর্যন্ত আর শায়খুল হিন্দ (রহঃ) এ পৃথিবীতে থাকেননি। তাই অসমাপ্ত আলোচনা অসমাপ্তই থেকে গেলো। পরবর্তীতে মাওলানা আজাদ শায়খুল হিন্দ (রহঃ)-এর চিন্তাধারার রাজনীতি ছেড়ে করম চাঁদ গান্ধীর চিন্তাধারার কংগ্রেসে গিয়েছিলেন। তখন এই নেতৃত্বের শূন্যস্থান পূরণ করতে এগিয়ে এসেছিলেন আল্লামা সৈয়দ হুসাইন আহমদ মাদানী (১৮৭৯-১৯৫৭) এবং আল্লামা শাব্বীর আহমদ ওসমানী (১৮৮৭-১৯৪৯)।

১৯২৮ সালে এই দুই সংগ্রামী আলেমের নেতৃত্বে গড়ে উঠেছিলো সর্বভারতীয় সংগঠন জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ। কিন্তু ১৯৪০-এর পর দ্বিজাতিতত্ত্বের প্রশ্নে মাওলানা মাদানী ও মাওলানা ওসমানীর মধ্যে তীব্র মতানৈক্য দেখা দেয়। মাওলানা মাদানী ছিলেন অখন্ড ভারতের পক্ষে। মাওলানা ওসমানী ছিলেন দ্বিজাতিতত্ত্বের পক্ষে। মাওলানা শাব্বীর আহমদ ওসমানী (রহঃ) অনেক চেষ্টা করেছেন মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী (রহঃ)-কে এ কথাটি বোঝাতে যে, অতীত থেকে আমাদের তিক্ত অভিজ্ঞতা আছে হিন্দু মানসিকতা সম্পর্কে। তাই আমাদের উচিত পৃথক হয়ে যাওয়া। কিন্তু মাদানী (রহঃ) তাঁর অখন্ড ভারত দর্শনে দৃঢ় থাকেন। শেষ পর্যন্ত এই দুই চিন্তায় ভারতবর্ষের উলামায়ে কিরাম দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে যান।

১৯৪৫ সালে কোলকাতার মোহাম্মদ আলী পার্কে শায়খুল ইসলাম মাওলানা শাব্বীর আহমদ ওসমানী (রহঃ)-কে সভাপতি করে 'জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ' নাম পরিবর্তন করে 'জমিয়তে উলামা-এ ইসলাম' নাম রাখা হয়। জমিয়ত হয়ে গেলো দু'ভাগ, একভাগে মাওলানা সৈয়দ হুসাইন আহমদ মাদানী অখন্ড ভারতের পক্ষে, অন্যভাগে শাব্বীর আহমদ ওসমানী (রহঃ) পাকিস্তানের পক্ষে। পাক-ভারত-বাংলার প্রসিদ্ধ আলেমদের মধ্যে শায়খুল ইসলামের নেতৃত্বে জমিয়তে উলামা-এ ইসলামে সে দিন যোগ দিয়েছিলেন হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (১৮৬২-১৯৪৩), মাওলানা জাফর আহমদ ওসমানী (১৮৮৭-১৯৭৪), মাওলানা মুফতী মোহাম্মদ শফি, মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী (১৮৯৫-১৯৬৯), মাওলানা মোহাম্মদ উল্লাহ হাফেজ্জী হুজুর, মাওলানা ইহতেশামুল হক থানবী, মাওলানা সৈয়দ সুলায়মান নদভী, ফুরফুরার মাওলানা আব্দুল হাই সিদ্দিকী, মাওলানা আতাহার আলী (১৮৯৪-১৯৭৬), মাওলানা দ্বীন মোহাম্মদ খান (১৯০০-১৯৭৪) প্রমুখ বিখ্যাত আলিমগণ।

বাংলাদেশের মধ্যে শুধু সিলেটে জমিয়তে উলামা-এ হিন্দের কিছুটা প্রভাব ছিলো। কারণ মাওলানা সৈয়দ হুসাইন আহমদ মাদানীর অনেক ভক্ত-শিষ্য সিলেটে রয়েছেন এবং রমজানে তিনি সিলেটে প্রায়ই বছর ইতেকাফ করতেন। তবে মাওলানা সৈয়দ সোলায়মান নদভী, মাওলানা জাফর আহমদ ওসমানী ও সিলেটের মাওলানা আতাহার আলী সাহেবের প্রচেষ্টায় সিলেটে পাকিস্তানের পক্ষে বিরাট গণআন্দোলন গড়ে উঠে। শেষ পর্যন্ত গণভোটে সিলেটের জনগণ পাকিস্তানের পক্ষেই রায় দেয়।

মাওলানা শাব্বীর আহমদ ওসমানীর মাজারের পাশেই মাওলানা সৈয়দ সোলায়মান নদভীর মাজার। মাওলানা নদভী রাজনৈতিক ময়দানের চেয়ে জ্ঞানের ময়দানে বেশি পরিচিত ছিলেন। তিনি ভারতবর্ষের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ছিলেন। তাঁর জীবনের সবচাইতে বড় কৃতিত্ব আমার মতে 'সীরাতুন্নবী' গ্রন্থ। মহানবী (সাঃ)-এর জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে এই গ্রন্থের প্রথম লেখা শুরু করেছিলেন বিশ্ব বিখ্যাত জ্ঞানতাপস আল্লামা শিবলী নোমানী (রহঃ)। সমাপ্তির আগেই তিনি ইন্তেকাল করেন। পরে আল্লামা সৈয়দ সোলায়মান নদভী তা সমাপ্ত করেন। কিন্তু পাঠক বইয়ের পটভূমি না পড়লে বুঝবেনই না কার লেখা কোন অংশ। অর্থাৎ জ্ঞানের দিকে সৈয়দ সোলায়মান নদভী এতই অগ্রসর ছিলেন।

শায়খুল ইসলামের মাদ্রাসা

আল্লামা শাব্বীর আহমদ ওসমানী (রহঃ) পাকিস্তান আসার পর করাচীতে একটি দ্বীনি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। মাদ্রাসার পাশে একটি মসজিদও ছিলো। কিন্তু সরকার পরবর্তীকালে এটাকে ইসলামিয়া কলেজ-এ রূপান্তরিত করে। বর্তমানে এই প্রতিষ্ঠানটি শায়খুল ইসলামের চিন্তা-ধারা থেকে বহু দূরে। অর্থাৎ ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে এবং প্রতিষ্ঠানের পরিবেশে ইসলামী তাহজীব-তামাদ্দুন নেই বললেই চলে। কলেজটি তাঁর মাজারের পাশেই অবস্থিত।

শায়খুল ইসলামের বাড়ী

ইসলামিয়া কলেজের পাশেই শাব্বীর আহমদ ওসমানী (রহঃ)-এর বাড়ীটি আজ জনৈক প্রভাবশালীর অবৈধ দখলে। অথচ এই বাড়ীতে বসে তিনি পাকিস্তানের জন্য অনেক কিছুই করেছেন। পাকিস্তানের প্রথম জাতীয় পতাকা উত্তোলনকারী এই নেতার বাড়ীকে সরকারের উচিৎ ছিলো ঐতিহাসিক কারণে সংরক্ষণ করা।

আফগান মরিজখানা

আল্লামা শাব্বীর আহমদ ওসমানী (রহঃ)-এর মাজার, কলেজ, বাড়ী, মসজিদ দেখে ফেরার পথে হঠাৎ দেখি এক বাড়ীর গেইটে ছোট একটি সাইনবোর্ডে লেখা, "ইয়ে তালেবান মরিজখানা হে"। ভাবলাম একটু দেখে যাই। পুরাতন একটা বাড়ী, দরজা-জানালা ভাংগা। আহত ও অসুস্থ তালেবান মুজাহিদদের চিকিৎসাধীন অবস্থায় থাকার

জন্য পাকিস্তানের সরকার এই বাড়ীটি দিয়েছে। সেখানে গিয়ে, তাদের সাথে কথা বলে মাথায় এক নতুন চিন্তা এলো। এই ফাঁকে যদি আফগানিস্তান সফর করে যাই, তবে কেমন হয়? আমার আবার কোন কিছু মাথায় আসলে অশান্তি শুরু হয়ে যায়। তাই ভাবতে লাগলাম কিভাবে যাওয়া যায়। ভাবতে ভাবতে রুমে ফিরে আসি।

মাওলানা মাজহার একজন ভালো মানুষ

মাওলানা আব্দুর রহমান ও মাওলানা সিদ্দীকে আকবরকে অল্প সময়ের পরিচয়ে বন্ধুত্বের পর্যায়ে উপনীত করেছি। দু'জন মাওলানা সাহেবকে নিয়ে গুলশান-ই ইকবালে গেলাম। উদ্দেশ্য আফগানিস্তানে যাওয়ার ব্যবস্থা করা এবং আমার শ্যালক একরামুল হকের সাথে দেখা করা। গুলশান-ই ইকবালে পাকিস্তানের বিশিষ্ট পীরে কামেল হাকীম মাওলানা আখতার সাহেবের মাদ্রাসা আশরাফুল মাদারিস অবস্থিত। একরামুল হক এই মাদ্রাসার ছাত্র। মাদ্রাসা পরিচালনা করেন হাকীম আখতার সাহেবের ছেলে মাওলানা মাজহার সাহেব। আফগানিস্তানের শিক্ষা ও চিকিৎসার উন্নয়নে তিনি ইতোমধ্যে বেশ প্রশংসনীয় কর্মসূচী হাতে নিয়েছেন এবং তা অনেকাংশে বাস্তবায়ন করেছেন। কান্দাহারের হাসপাতালটি যুদ্ধকালীন সময়ে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিলো, মাওলানা মাজহার তা মেরামত করে দিয়েছেন। বর্তমানে জামেয়া উমর নামে একটি শিক্ষা প্রকল্পে হাত দিয়েছেন। আমীরুল মু'মিনীন মোল্লা উমরের সাথে তার ব্যক্তিগত সুসম্পর্ক রয়েছে। আমরা দুপুর বারোটায় তার সাথে দেখা করি। পরিচয় দিলাম। আসার উদ্দেশ্য বললাম। একটু হাসলেন। পাশে বসা লোকটিকে বললেন (হয়তো সেক্রেটারী) কলম কাগজ দিতে। আফগানিস্তানের নায়েবে উজিরে খারেজা (পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী) মোল্লা আব্দুল জলিল সাহেবের কাছে পত্র লিখলেন। তা ছাড়া বললেন, করাচীর আফগান সফীর (অর্থাৎ আফগানিস্তানের রাষ্ট্রদূত) মোল্লা রহমতুল্লাহর সাথে দেখা করতে। রহমতুল্লাহর নামে একটি চিরকুট লিখে দিলেন এবং টেলিফোনে বলে দেবেন বললেন। আমরা অবশ্য মোল্লা রহমতুল্লাহকে পাইনি। কারণ যেতে যেতে অফিসের সময় শেষ হয়ে গিয়েছিলো।

হাবীবের নানা বাড়ী

আলহাজ্ব আব্দুর রহমান করাচীর একজন সফল ব্যবসায়ী। জাতে বাংগালী। কাপড় ও আগরের ব্যবসার সাথে জড়িত। তিনি হলেন হাবীবের নানা। হাবীব হলো আমার মেয়ে মারহামার মামাতো ভাই। সালমার মেঝ ভাই মুফতী ফয়জুল হক করাচীতে লেখা পড়া করেছেন। এরপর বিয়ে করে ভাবীসহ দেশে ফিরেন। আমি আসার আগে জানতে পারি যে, ভাবী বর্তমানে করাচীতে আছেন। তাই সালমা কিছু উপহার সাথে দিয়েছিলো। একরামুল হককে নিয়ে হাবীবের নানার গার্ডেন ইস্টের বাড়ীতে গেলাম। সেখানে দেখা হলো হাবীবের মামা মাওলানা ইসমাঈলের সাথে। বড় সরল-সহজ মানুষ। কথা প্রসঙ্গে জানান, তাঁর ইচ্ছে বাংলাদেশে গিয়ে কোন মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করার। কিন্তু সরকার যদি

সত্যই মাদ্রাসা শিক্ষা বন্ধ করে দেয়, তবে সেই ইচ্ছা আর পূরণ হবে না। আলেম-ওলামা ও মাদ্রাসার প্রতি বর্তমান সরকারের জেল-জুলুম, হয়রানী-তল্লাশী, হুমকি-ধমকি ও কওমী মাদ্রাসা শিক্ষা বন্ধের পাঁয়তারার কথা বিদেশের পত্রিকাগুলোতেও ফলাও করে প্রচারিত হয়েছে। যে কারণে মাওলানার মনে দারুণ শংকার সৃষ্টি হয়েছে। আমি তাকে বললাম আশাহত না হতে। বর্তমান সরকার এত বড় দুঃসাহস দেখাবে না। তাছাড়া সত্তর বছরের নাস্তিক্যবাদী শাসনের পরও রাশিয়া থেকে ইসলামকে ধ্বংস করা সম্ভব হয়নি। মাদ্রাসা শিক্ষা বন্ধ হয়নি। ভারতবর্ষে বৃটিশ শাসকগণ অনেক চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছে। শেখ হাসিনা কিংবা তাঁর দল আওয়ামী লীগের পক্ষেও তা সম্ভব নয়।

করাচী থেকে কোয়েটা

৩রা মার্চ ১৯৯৯ সাল। আজ করাচী থেকে আফগানিস্তানের উদ্দেশ্যে রওনা হবো। এখান থেকে প্রথমে যেতে হবে কোয়েটা। সকালে এয়ারপোর্ট যাওয়ার পূর্বে ভাবলাম মোল্লা রহমতুল্লাহ্‌র সাথে দেখা করবো। এত সকালে তাঁর অফিসে থাকার প্রশ্নই উঠে না। তাঁর বাসায় টেলিফোন করলাম। কেউ রিসিভ করলো না। শেষ পর্যন্ত না পেয়ে এয়ারপোর্ট চলে গেলাম। কোয়েটায় আফগানিস্তানের সফারতখানা (দূতাবাস) আছে, সেখানে চেষ্টা করবো। করাচী এয়ারপোর্টের অবস্থা আগেই বলেছি-বাংলাদেশের মতো। আমরা বেশ ক'জন যাচ্ছি। এয়ারপোর্ট গিয়ে দেখি, সীট নেই। অথচ টিকিট ওকে। শুধু যে আমাদেরই এই অবস্থা, তা কিন্তু নয়। অনেক যাত্রীর এই একই অবস্থা। শুরু হয়ে গেল হৈ চৈ। শেষ পর্যন্ত কর্তৃপক্ষ একটা উড়োজাহাজের ব্যবস্থা করলেন। সকাল ন'টায় আমরা কোয়েটার উদ্দেশ্যে আকাশে উড়লাম। আকাশ পথে করাচী থেকে কোয়েটা এক ঘন্টায় পৌঁছা যায়, সেখানে পাঁচ ঘন্টা লাগলো। পথে অতিরিক্ত দু'টি স্টপিজ নিলো। প্রথমটি নিলো টারবাট এয়ারপোর্ট এবং দ্বিতীয়টি নিলো ডালবানডি এয়ারপোর্ট। দু'টোই ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট। কিন্তু অবস্থা দেখে মনে হয় বাসস্টপ। একটা পাবলিক টেলিফোন পর্যন্ত নেই। দুপুর দু'টায় আমরা কোয়েটা এয়ারপোর্টে পৌঁছি।

কোয়েটায় এক রাত

আমরা যারা ১৯৭১ সালের পূর্বের বাংগালী সেনাবাহিনীর ইতিহাস কিছু কিছু জানি, তাদের কাছে কোয়েটা অপরিচিত থাকার কথা নয়। কারণ পাকিস্তান আমলে বাংগালী সৈন্যদের বেশির ভাগের অবস্থান ছিলো কোয়েটায়। আমরা দুপুর দু'টায় কোয়েটা এয়ারপোর্টে পৌঁছি। একটা গাড়ী নিয়ে সরাসরি আফগান সফারতখানায় চলে যাই। কর্তৃপক্ষ জানালেন, যদি তালেবানদের গাড়ী দিয়ে সীমান্ত শহর চমন পর্যন্ত যেতে হয়, তবে আজ রাত থাকতে হবে। থাকার জন্য কোন অসুবিধা নেই। তাদের নিজস্ব মেহমানখানা রয়েছে। বেশ কিছু কারণে আমরা থাকার সিদ্ধান্ত নিলাম।

প্রথমতঃ পাকিস্তানী পুলিশদের অসদাচরণ, ঘুষ না দিলে লুট-পাট করে দামী জিনিসপত্র নিয়ে যাওয়া ইত্যাদি।

দ্বিতীয়তঃ আমার সাথে ক্যামেরা। আফগান সীমান্তে যদি তালেবানরা ব্যাগ পরীক্ষা করে, তবে ক্যামেরা নিয়ে ভেতরে যেতে দেবে না। যদি তালেবানদের সাথে যাই, তবে এই ভয় কম। পররাষ্ট্র দফতর পর্যন্ত যেতে পারলেই ক্যামেরা সাথে রাখার একটা ব্যবস্থা করা যাবে।

তৃতীয়তঃ কোয়েটা শহর দেখার লোভ। কারণ এই শহরের সাথে আমাদের সেনাবাহিনীর একটা ঐতিহাসিক সম্পর্ক রয়েছে। বিশেষ করে মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানের বীরত্বপূর্ণ অনেক ঘটনা জড়িয়ে আছে পাকিস্তানের সাথে। ১৯৭১-এর পূর্ব পর্যন্ত ভারতের সাথে যুদ্ধে পাকিস্তানকে বেশি ডিফেন্স করেছে আমাদের বাংগালী সৈন্যরাই।

বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসীরা ভাবতে পারেন, আমি বার বার বাংগালী শব্দ ব্যবহার করে বাংগালী জাতীয়তাবাদের পক্ষ নিচ্ছি। বাস্তবে আমি কোন প্রকার জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী নয়। আমি মনে করি, ১৯৭১ সালের পূর্ব পর্যন্ত আমাদের পরিচিতি ছিলো বাংগালী হিসেবে। কারণ আমরা সেই সময় কখনো ভারতের অংশ আবার কখনো পাকিস্তানের অংশ ছিলাম। কিন্তু ১৯৭১ সালের পর আমাদের একটি স্বাধীন দেশ হয়েছে। তাই আমাদের পরিচিতি এখন বাংলাদেশী। কারণ এখন যদি বাংগালী পরিচয় দেই, তবে প্রশ্ন আসবে কোথাকার বাংগালী? তাই পরিচয়টা সহজ করার জন্য বাংলাদেশের মানুষের পরিচয় বাংলাদেশী হওয়াটাই সমীচীন। স্মরণ রাখতে হবে, ভারত, পাকিস্তান, বৃটেনসহ বিশ্বব্যাপী আজ বাংগালীদের অবস্থান। আমি যে বাংগালী বলছি, তা ১৯৭১-এর পূর্বের বাংগালী। তাই আমি যে বাংলাদেশের বাংগালী তা বুঝানোর জন্য নিজেকে বাংলাদেশী বলাই যৌক্তিক।

যা-ই হোক, কোয়েটার বেশীর ভাগ জনসাধারণ পাঠান। আবহাওয়া প্রচন্ড ঠান্ডা। তালেবান অফিসে জিনিসপত্র রেখে একটা রিক্সা (অর্থাৎ বেবিটেক্সি) নিয়ে শহরের ভিতরে চলে যাই। শহরটি আমাদের দেশের শহরগুলোর মতই। আমাদের উদ্দেশ্য পাগড়ী খরিদ করা। পাগড়ী একটি জরুরী জিনিস। আমরা সবাই একটা করে কালো পাগড়ী নিলাম।

আমাদের সাথীদের একজনের খুব পানের নেশা। তার ধারণা ছিলো, করাচীতে যেমন প্রতিটি মহল্লায় শত শত পানের দোকান আছে, তেমনি সমস্ত পাকিস্তানেও থাকবে। কিন্তু কোয়েটায় এসে দেখা গেলো এখানে পানের দোকান নেই। ভদ্রলোক খুব মনক্ষুণ্ন হলেন। আমরা বললাম, আসুন শেষ চেষ্টা করে দেখি কোথাও পাওয়া যায় কি-

না। খুঁজতে খুঁজতে একটা পানের দোকান পাওয়া গেল। তবে দাম খুব চড়া। এক খিলির দাম চার রূপী। আমরা সবাই একটি করে খেলাম। বন্ধু মাওলানা এহ্সান উদ্দিন মোহাম্মদ মুহসিন অনেকগুলো পান, সুপারী, জর্দা খরিদ করলেন। আমরা অবশ্য মনে মনে খুশি হলাম, মাঝে-মধ্যে খাওয়া যাবে। এর পর আমরা টেলিফোন একচেঞ্জে এসে করাচী ও বৃটেনে ফোন করি। নসরু, সালমা ও শেফার সাথে আলাপ করলাম। শেফার সাথে আলাপ করে মনটা খারাপ হয়ে গেলো। সে কাঁদছে।

শেফা যদিও বয়সে আমাদের ছোট, তবে সে আমার চার বোনের মধ্যে বড়। শুনেছি বড় বোন মায়ের স্নেহ নিয়ে জন্মে। আজ বাস্তব অভিজ্ঞতা হলো। তাকে বোঝালাম, আমি কি আফগানিস্তানে যুদ্ধ করতে যাচ্ছি যে, সেখানে গেলেই মরে যাবো? কিন্তু এরপরও বাবা, মা, ভাই, বোন, স্ত্রী, আত্মীয়-স্বজন সবাই আফগানিস্তানে যাচ্ছি শোনে আতংকিত। অজানা শংকায় সবার চোখে পানি। বাবা তো শোনার সাথে সাথেই মাকে এক গাল শুনিয়ে দিয়েছেন; দেখছো, তোমার কারবারী ছেলে এখন আফগানিস্তানের পথে যাত্রা শুরু করেছে। অপদার্থ কোথাকার? মানুষ বৃটেনে গিয়ে টাকা উপার্জন করে আর তোমার ছেলেরা পাকিস্তান–আফগানিস্তান সফর করে, পত্রিকায় লেখা-লেখি করে সময় নষ্ট করে। আফগানিস্তানে এখন যুদ্ধ চলছে। তার সেখানে যাওয়ার কি প্রয়োজন? দেখবে, হঠাৎ সংবাদ পাবে, তোমার ছেলের উপর বোমা এসে পড়েছে। সে শহীদ হয়ে গেছে। বাহঃ কি খুশি। তুমি হবে শহীদের মা।

ছেলেটা পেয়েছে কি? সে কি আমাদের সবাইকে রেখে একা বেহেস্তে যেতে চাচ্ছে? মোটেই পারবে না। আমি কিন্তু বন্দুক নিয়ে তার বেহেস্তের দরজায় দাঁড়িয়ে থাকবো, ইত্যাদি।

আম্মা বেচারী এমনি চিন্তিত। এরপর বাবার ব্যঙ্গাত্মক কথা। আমরা যখন বাবার অপসন্দের কিছু করি, তখন বাবা সব রাগ মাকে দেখান। আর যখন তাঁর মনমত কাজ করি, তখন তিনি ভীষণ খুশী হয়ে জনে জনে নিজের নাম ফলান। দোষের সময় আমরা যেন শুধু মা-এর সন্তান। এটা হয় তো সব বাবাদেরই চরিত্র। আমিও এখন নিজের মধ্যে এই চরিত্র খুঁজে পাই।

যা-ই হোক, টেলিফোন পর্ব শেষ করে রিক্সা নিয়ে অফিসে ফিরে আসি। শীতল বায়ুর এলাকা হলেও রিক্সায় এত বেশি ঠান্ডা লাগে না। কারণ দরজা আছে। বেবি টেক্সিতে দরজা জীবনে এই প্রথম দেখলাম।

আফগানিস্তানের কোয়েটা প্রতিনিধির নাম এই মুহূর্তে স্মরণ হচ্ছে না। রাতে খাওয়া-দাওয়া শেষে তার সাথে দেখা করতে গেলাম। এখানে অফিস বলতে আহামরি কিছু নয়। আমাদের দেশে গ্রাম্য মক্তবগুলোতে যেমন দফতর হয়, তেমনি। প্রধান

অফিসার যিনি, তার সাথে আমাদের দেশের গ্রামের সরল-সহজ কওমী মাদ্রাসার একজন শিক্ষকের তুলনা দেয়া যায়। ছিলেনও হয় তো তা-ই। সালাম করে মুসাফাহা করলাম। তিনি এক নিঃশ্বাসে বলতে লাগলেন, 'ছাংগে, জুরে, তাগরে, তবিয়েত খেদে, পা খায়ের দে, শে, উহ, বাচ্চা-মাচ্ছা খেদে, হান্ডি ওয়ালা খেদে।' আমি কিছুই বুঝলাম না। শুধু চেয়ে থাকলাম তাঁর দিকে। পরে বুঝলাম এসবের অর্থ কি। ছাংগে-কি অবস্থা? জুরে-ভালো আছেন? তাগরে-শরীর কি ভালো আছে? তবিয়েত খেদে- মেজাজ ভালো তো? পা খেয়ের দে-ভালো। শে-হ্যাঁ ভালো। উহ- হ্যাঁ। বাচ্চা-মাচ্ছা খেদে- ছেলে-মেয়ে ভালো তো? হান্ডি ওয়ালা খেদে-সাথী ভালো আছে তো?

আমাদের যিনি রাহ্‌বার, তিনিও এ ধরনের বাক্য উচ্চারণ করে উত্তর দিলেন। এরপর বললাম, আমাদের উদ্দেশ্য। ভদ্রলোক মোটামুটি উর্দু জানেন। মাওলানা মাজহার সাহেবের লেখা মোল্লা আব্দুল জলিলের নামে যে চিঠি ছিলো, তা এগিয়ে দিলাম। তিনি টেলিফোন হাতে নিয়ে কার কাছে জানিনা ফোন করলেন। পশতুতে কি বলে রিসিভার আমার দিকে এগিয়ে দিলেন। অপর প্রান্ত থেকে শুধু নাম জিজ্ঞেস করা হলো। নাম শুনে বললেন, শুকরিয়া! উস কো দে- দো। আমি রিসিভার ফিরিয়ে দিলাম। তারা দু'জন কি যেনো আলাপ করলেন। রিসিভার রেখে বললেন, "সকালে যে গাড়ী যাবে, তাতে উঠে চলে যাবেন। রাতেই আমি ওদেরকে বলে দেবো।" আমরা ফিরে এলাম মেহমানখানায়।

কোয়েটা থেকে চমন

ফজরের নামাজ শেষে সকালের নাস্তাপর্ব সমাপ্ত হলো। আটটায় গাড়ীতে উঠলাম। এই গাড়ী আমাদেরকে নিয়ে যাবে পাকিস্তানের শেষ সীমানা চমন শহরে। চার ঘন্টা সময় লাগবে। গাড়ী চলতে লাগলো। পাহাড়-পর্বত ডিঙ্গিয়ে গাড়ী যতই অগ্রসর হচ্ছে, ততই নিজের মনের চঞ্চলতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। অপেক্ষার চার ঘন্টা প্রায় চার প্রহরে অতিক্রান্ত হলো। আমরা দুপুর বারোটায় চমন এসে পৌছি। চমন যদিও পাকিস্তানের অংশ, কিন্তু পাকিস্তান সরকারের শাসন সেখানে অচল। বেশির ভাগ জনগোষ্ঠী পাঠান। সেখানের এম, পি হচ্ছেন মাওলানা আব্দুল গনি। তাঁর সাথে কিছুদিন পূর্বে বার্মিংহামে দেখা হয়েছে। দেওবন্দী আলেম। দেখেই বোঝা যায়, নেক এবং আল্লাহ্‌ওয়ালা। তিনি পাকিস্তান সরকারের সাথে আলোচনাক্রমে চমন এলাকায় ইসলামী শাসন ব্যবস্থা চালু করেছেন। কিন্তু আফগানিস্তানের মতো পূর্ণ ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠিত করা যাচ্ছে না, যেহেতু চমন গণতান্ত্রিক পাকিস্তানের একটি অংশ। কোয়েটার মতো চমনের আবহাওয়াও ঠান্ডা। আমরা চমন শহর থেকে একটি গাড়ী নিয়ে আফগান সীমান্ত এলাকায় পৌঁছলাম। এবার আফগানের ভিতরে প্রবেশের পালা।

আফগানিস্তান

ভেতরে প্রবেশ করা মাত্রই স্পষ্ট বোঝা গেলো, এটা ইসলামী দেশ, তালেবানের দেশ। সীমানা অতিক্রমের সাথে সাথে সব গাড়ি বাম দিক থেকে ডান দিকে চলে গেলো। গান-বাজনার আওয়াজ নেই। কোন প্রাণীর ছবি দিয়ে বিজ্ঞাপন রাস্তায় লাগানো নেই। সবার মাথায় পাগড়ী। দাড়ী ছাড়া কোন পুরুষ নেই এবং বোরকা ছাড়া কোন নারী নেই। আবেগের তাড়নায় আমার বিশ্বাসই হচ্ছে না যে, আমি আফগানিস্তানের মাটির উপর দিয়ে চলছি।

আফগানিস্তানের সাথে রয়েছে আমাদের অনেক ঐতিহাসিক-ঐতিহ্যগত সম্পর্ক। আফগানিস্তানের সাথে আমাদের অনেক প্রেরণাদায়ী ঘটনা জড়িত। আফগানিস্তান আমাদের মনে জাগায় আবেগ, জ্বালায় উচ্ছ্বাসের মশাল। শেষ পর্যন্ত আমি এসেছি সেই আফগানিস্তান দেখতে। আফগানিস্তান মধ্য এশিয়ার একটি স্থলবেষ্টিত পার্বত্য দেশ। অধিকাংশ অধিবাসী মুসলমান। বর্তমানে সেখানে ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। এশিয়ার অতি প্রাচীনতম ঐতিহাসিক দেশ আফগানিস্তান।

প্রাচীনকালের আফগান

আফগানিস্তানের উত্তরে আপার ফল পলিথিক-এর সমতলে বেশ আগে মানুষের মাথার কিছু খুলি (স্কাল) আবিষ্কৃত হয়েছিল। আমেরিকার বিশিষ্ট গবেষক প্রফেসর লুইস-এর মতে, সেগুলো বিশ হাজার বছর পূর্বের। সেই সময়ে একটা পাথরের সিন্দুকের ভেতর কাউকে দাফন করা হয়েছিলো (আফগানিস্তান ঃ যাওয়াল ছে উরূজ তক)। এ থেকে প্রমাণিত যে, আফগানিস্তানে মানুষের আগমন আজ থেকে অন্তত বিশ হাজার বছর পূর্বে। এছাড়া বেশ কিছুদিন আগে আফগানিস্তানের গজনী এলাকায় বেশ কিছু পাথরের যন্ত্রপাতি পাওয়া গেছে। গবেষকদের মতে, এগুলো অতি প্রাচীনকালের মানুষদের ব্যবহারিক যন্ত্রপাতি। (ঐ)

মধ্য এশিয়া, অর্থাৎ– মিসর, সিরিয়া, জেরুজালেম, ইরাক ইত্যাদি এলাকার আদি মানুষদের মতো আফগানের আদি মানুষেরাও জীবন যাপনের জন্য কৃষি কাজের কলাকৌশল শিখে নিয়েছিলো। ইতিহাস থেকে প্রমাণিত যে, আফগানিস্তানে মানুষ বৃদ্ধির সাথে সাথে বর্তমান কান্দাহারে শাক-সব্জি ক্রয়-বিক্রয়ের একটি কেন্দ্র গড়ে উঠেছিলো। তা আনুমানিক খৃস্ট-পূর্ব তিন হাজার সালের দিকে। তাই আফগানিস্তানের প্রথম শহর হিসাবে ইতিহাসে কান্দাহারের নাম রয়েছে। কৃষকদের মাধ্যমে যে একটি শহর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে, তা কান্দাহারের কৃষকরা প্রমাণ করে দেখিয়েছে।

আফগানিস্তানের রাজনৈতিক ইতিহাস

একটা দেশের রাজনৈতিক ইতিহাস লেখা কঠিন কাজ। আর আফগানিস্তানের মতো দেশের রাজনৈতিক ইতিহাস এত সংক্ষিপ্ত পরিসরে মোটেও সম্ভব নয়। এরপরও আফগানিস্তানের ইতিহাস সম্পর্কে দু'চার কথা লেখা জরুরী মনে করছি।

ইসলাম-পূর্ব আফগানিস্তানের রাজনৈতিক অবস্থা

দক্ষিণ এশিয়ার গুরুত্বপূর্ণ দেশ আফগানিস্তান। দক্ষিণ এশিয়ায় প্রবেশের জন্য এটা হচ্ছে রাজপথ। এই পথ দিয়ে এক সময় মানুষ ইরান, গ্রীস, মঙ্গোলিয়া, তুরস্ক, আরব ইত্যাদি অঞ্চল থেকে এসে উপমহাদেশে বসতি স্থাপন করেছিলো। দক্ষিণ এশিয়ার রাজনীতিতে প্রভাব বিস্তারের জন্য আফগানিস্তানকে নিয়ন্ত্রণে রাখা খুব জরুরী। আর এই নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে গিয়েই বার বার সৃষ্টি হয়েছে যুদ্ধ ও সংঘাত। এক সময় আর্য রাজা-বাদশারা নির্যাতনের মাধ্যমে আফগানিস্তানে তাদের রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক আধিপত্য বিস্তার করে নিয়েছিলো। দীর্ঘদিন এই অঞ্চল পারস্যসম্রাট প্রথম খসরুর দখলে ছিলো। ৩২০ খৃস্টাব্দে খসরুকে পরাজিত করে রোমসম্রাট সিকান্দরে আজম (আলেকজান্ডার দি গ্রেট) তার আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেন। তবে সিকান্দরে আজমের শাসন ছিলো স্বল্পকালীন। যূচী গোত্র সিকান্দরে আজমের কাছ থেকে তা দখল করে নিয়েছিলো। এরপর আবার চলে যায় পারস্য সম্রাটদের অধীনে।

খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগ

ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা হযরত ওমর (রাঃ)-এর সময় হযরত আনফ বিন কয়েস (রাঃ) ইরানের বাদশা য়য্দগিরদ তৃতীয়কে পরাজিত করে আফগানিস্তানে প্রবেশ করেন এবং খোরাসান এলাকায় ইসলামী পতাকা উড্ডীন করেন। ইসলামের তৃতীয় খলীফা হযরত উসমান (রাঃ)-এর সময়ে আফগানিস্তানের আরো কিছু এলাকা মুসলমানদের দখলে আসে। খলিফা কর্তৃক তখন আনফ বিন কয়েসকে (রাঃ) মরু ও হেরাত, আব্দুল্লাহ্ বিন আমরকে (রাঃ) সীস্তান এবং খোবাইব বিন কার'রাহ্ ইয়ারবোয়ীকে (রাঃ) বল্খ ও বাকারিস্তান প্রদেশের হাকিম নিযুক্ত করা হয়। ইসলামের চতুর্থ খলীফা হযরত আলী (রাঃ)-এর সময়, অর্থাৎ- ৬৬১ খৃস্টাব্দে মুসলমানরা হেলমান্দ প্রদেশের রাজধানী লস্করগড় জয় করেন। এই বছরই হযরত আলী (রাঃ)-এর শাহাদতের মধ্য দিয়ে খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগ শেষ হয়ে যায়। এরপর শুরু হয় উমাইয়াদের রাজতান্ত্রিক শাসন। ৮৫০ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত তা চলে। এই সময়ের মধ্যে অসংখ্য সাহাবী আফগানিস্তানে আসেন। অনেক শহীদ সাহাবীর মাজার এখনো সেই স্মৃতি বহন করছে।

আব্বাসী শাসনামল

মহানবী (সঃ)-এর চাচা হযরত আব্বাস (রাঃ)-এর নামে আব্বাসী বংশের নামকরণ। আব্বাসী বংশের প্রথম শাসক আবু আব্বাসের সময় খোরাসানের প্রসিদ্ধ ব্যক্তিত্ব আবু মুসলিমের সাহায্যে ইয়াকুব বিন লাইস খুরাসান দখল করেন এবং আবু মুসলিমকে খোরাসানের গভর্নর নিয়োগ করে তিনি ৮৭০ খৃস্টাব্দে বামিয়ান ও ৮৯২ খৃস্টাব্দে কাবুল দখল করে ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। ঐতিহাসিক মতে, এই সময় যদিও গোটা আফগানিস্তানে ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়নি, কিন্তু গোটা আফগানিস্তানের অধিকাংশ মানুষ মুসলমান হয়ে গিয়েছিলো। বিশ্ববিস্তৃত আব্বাসী খেলাফতের এককেন্দ্রিকতা যদিও ১২৫০ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত অটুট ছিলো, কিন্তু নবম শতকের দিকে খেলাফতের অধীন রাষ্ট্রগুলো একে একে পৃথক হয়ে যেতে থাকে ।

গজনবীর শাসনামল

সুলতান আলপ্তগীন গজনী রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর ইন্তেকালের পর প্রথমে তাঁর ছেলে, এর পর তাঁর দুই গোলাম ক্ষমতার মসনদে বসেন। এরপর ক্ষমতার মসনদে বসেন সুলতান আলপ্তগীনের তৃতীয় গোলাম সবুক্তগীন। এসব ৯৭৬ খৃস্টাব্দের কথা। সবুক্তগীন একজন সৎ চরিত্রের অধিকারী বীর যোদ্ধা ছিলেন। তাঁর সময় ভারতের পশ্চিম এলাকার হিন্দু রাজা জয়পাল আফগাস্তিানে দু'বার আক্রমণের চেষ্টা করে ব্যর্থ হয় । শেষের বার পরাজিত হয়ে জয়পাল সিন্ধু নদীর তীর পর্যন্ত গজনীর সুলতানের হাতে তুলে দেয়। ৯৯৭ খৃস্টাব্দে সবুক্তগীন ইন্তেকাল করেন। এরপর ক্ষমতায় আসেন সুলতান সবুক্তগীনের ছেলে বিশ্বখ্যাত বিজয়ী যোদ্ধা সুলতান মাহমুদ গজনবী (রহ:)। ১০৩০ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি বেঁচে ছিলেন। তাঁর ইন্তেকালের পর কিছুদিন তাঁর ছেলেরা রাজ্য পরিচালনা করেন। এরপর ক্ষমতা চলে যায় ঘোরী বংশের হাতে।

ঘোরীদের শাসনামল

গজনী ও হেরাতের মধ্যখানে একটা পার্বত্য অঞ্চল রয়েছে। এখানে বাস করে ঘোর বংশের লোক। এই লোকগুলো যুদ্ধবাজ। সুলতান মাহমুদ গজনবী ছাড়া আর কেউ ইতোপূর্বে তাদের উপর শাসন করতে পারেনি। সুলতান মাহমুদের ইন্তেকালের পর তাঁর ছেলেদের সাথে ঘোর সর্দারদের সংঘাত শুরু হয়ে যায়। এক পর্যায়ে তারা স্বাধীনতা ঘোষণা করে। ১১৫১ খৃস্টাব্দে ঘোর সর্দারদের নিয়ে ঘোর রাজ্যের নরপতি আলাউদ্দিন হোসেন তাঁর ভাই হত্যার প্রতিশোধ নিতে গজনী রাজ্য আক্রমণ করেন। শুধু আক্রমণ নয়, তারা ব্যাপক লুটপাট, গণহত্যাসহ শহরে আগুন লাগিয়ে দেয়। সাতদিন পর্যন্ত এই আগুন জ্বলছিলো। আলাউদ্দিন জালেম ও দুষ্ট প্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি তাঁর দুই

ভ্রাতুষ্পুত্রকেও বন্দী করে জেলে নিক্ষেপ করেছিলেন। আলাউদ্দিনের মৃত্যুর পর তাঁর দু' চাচাতো ভাই গিয়াসউদ্দিন ও শিহাবউদ্দিনকে মুক্ত করা হয় এবং গিয়াসউদ্দিনকে ঘোর রাজ্যের ক্ষমতায় বসান হয়।

১১৭৩ খৃস্টাব্দে গিয়াসুদ্দিন গজনী দখল করলে তাঁর ভাই শিহাবুদ্দিনকে গভর্নর নিযুক্ত করেন। তাঁরা দু'ভাইয়ের মধ্যে অত্যন্ত মধুর সম্পর্ক ছিলো। এই শিহাবুদ্দীনই ভারতের রাজ সিংহাসনে এক সময় ইসলামী পতাকা উড্ডীন করেছিলেন। আমরা ইতিহাসে তাঁকে পেয়েছি সম্রাট মইজুদ্দিন মোহাম্মদ বিন ঘোরী অথবা মোহাম্মদ ঘোরী নামে। ১১৮২ সালে তিনি গজনী রাজ্য বিলুপ্ত করে ঘোরী রাজ্য ঘোষণা করেন। ১১৯৪ খৃস্টাব্দে ঘোর রাজ্যের সৈন্যরা কনোজ, বানারস, লক্ষ্মৌ, বিহার, বাংলা জয় করে নতুন সালতানাত প্রতিষ্ঠতা করে। ১২০৫ খৃস্টাব্দে ঘোরীরা খাওয়ারেজমের উপর আক্রমণ করে। তখন খাওয়ারেজমের শাসক ছিলেন আলাউদ্দিন মোঃ খুয়ারেজম। মরু এলাকায় যুদ্ধ হয়। এতে মুইজুদ্দিন মোহম্মদ ঘোরীর সৈন্যরা পরাজিত হয়। এর পরই আফগানিস্তানের উপর ঘোরীদের প্রভাব শেষ হয়ে যায়। (তারিখে হিন্দ ও পাক)

খাওয়ারেজম শাহের শাসনামল

তের শতাব্দীর শুরুতেই ঘোরীরা বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে। মরু'র যুদ্ধে ঘোরী সৈন্যদের পরাজয়ের পর থেকেই আফগানিস্তানে আস্তে আস্তে খাওয়ারেজম শাহের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। তেরো শতাব্দীর শুরুতেই আফগানিস্তানে আলাউদ্দিন মোহাম্মদ খাওয়ারেজমের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। খাওয়ারেজম শাহ্ আফগানিস্তানের ক্ষমতা লাভের পর ইসলামী বিশ্বের আধ্যাত্মিক নেতা হওয়ার ইচ্ছে পোষণ করেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি আব্বাসী খলিফাকে ক্ষমতা থেকে সরানোর পরিকল্পনায় বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে ১২১৮ খৃস্টাব্দে বাগদাদের দিকে যাত্রা করেন। তিনি যখন বাগদাদের নিকটে গিয়ে পৌঁছেন, তখন সংবাদ পেলেন, মোঙ্গলী সৈন্যদের নেতা চেঙ্গিস খান আফগানিস্তানে হামলা করেছেন। তাই খাওয়ারেজম শাহ্ আফগানিস্তানে ফিরে আসেন। এদিকে চেঙ্গিস খানের বাহিনী হেরাত, বামিয়ান, গজনী ইত্যাদি এলাকার শাসকদের নির্মমভাবে হত্যা করে। চেঙ্গিস বাহিনীর এই গণহত্যায় লাখ লাখ মানুষ প্রাণ হারায়।

মোগল শাসন আমল

মোঙ্গলী থেকেই মোঘল। চেঙ্গিস খান কর্তৃক আফগানিস্তানে সর্বপ্রথম মোঘল শাসনের ভিত্তি নির্মিত হয় । চেঙ্গিস খান ও তার ছেলে তুলি খান ব্যাপক ধ্বংসলীলা চালিয়ে প্রথমে হেরাতে তাদের শাসন প্রতিষ্ঠিত করেন। কিন্তু হেরাতীরা চালাকী করে প্রচুর মোঙ্গলীদের হত্যা করে। এর প্রতিশোধ হিসেবে চেঙ্গিস খান আনুমানিক বিশ হাজার সৈন্য নিয়ে হেরাত অবরোধ করেন। দীর্ঘ ছয় মাস অবরোধ করে রাখার পর

হেরাতীদের পরাজয় ঘটে। চেঙ্গিস খান তার অমানুষিক নির্যাতনের মাধ্যমে সেদিন হেরাতের অবয়ব পাল্টে দিয়েছিলেন। ঐতিহাসিকদের মতে, তিনি ১২২১ খৃস্টাব্দে আফগানিস্তান আক্রমণ করেন এবং ১২২৮ খৃস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যু-পরবর্তী শাসকদের নর্তকী আর শরাব পেয়ে বসে। ফলে মোঘল সালতানাতে দুর্বলতা দেখা দেয়। কিন্তু চৌদ্দ শতকে আবার তৈমুর লং শক্তি সঞ্চয় করে তুরস্ক, আফগানিস্তান, ইরান, ইরাক, উত্তর হিন্দুস্থান, এশিয়ার ছোট ছোট বেশ কিছু অঞ্চলসহ রোমের সমুদ্রতীর পর্যন্ত মোগল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁর ইচ্ছে ছিল চীন জয় করার। সেই উদ্দেশ্যে যাত্রাও করেছিলেন। তৈমুর লং-এর ছেলে শাহরুখ একজন সংস্কৃতিমনা শিক্ষাসেবক ছিলেন। তাঁর প্রচেষ্টায় একসময় হেরাত শিক্ষা সংস্কৃতির কেন্দ্রের রূপ নেয়। ১৪০৫ খৃস্টাব্দ থেকে ১৫৯১ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত তৈমুরের রাজধানী হেরাত ছিলো। তৈমুর লং-এর প্রপৌত্র জহিরউদ্দিন মুহাম্মদ বাবর বর্তমান তুর্কিস্তানের অধিবাসী ছিলেন। ষোল শতাব্দীর প্রথমে তিনি আফগানিস্তানের কিছু অংশ, বিশেষ করে কাবুল ও গজনী জয় করে নিয়েছিলেন। ১৫২৫ খৃস্টাব্দে জহিরউদ্দিন মুহাম্মদ বাবর হিন্দুস্তান আক্রমণ করেন এবং দিল্লী জয় করার পর তিনি হিন্দুস্তানের প্রথম মোঘল বাদশা হিসাবে ক্ষমতায় বসেন। তাঁর বংশের লোকেরা ১৮৫৭ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত হিন্দুস্তান শাসন করেন। (আফগানিস্তান ঃ যাওয়াল ছে উরূজ তক)

কিন্তু ১৭০৭ খৃস্টাব্দে মোঘল বংশের শ্রেষ্ঠ শাসক আওরঙ্গজেব আলমগীরের ইন্তেকালের পর পরই মোঘলদের পতনের ধারা শুরু হয়ে যায়। এই সময় ইরানের সফবী বংশের প্রদীপটিও টিম্ টিম্ করে জ্বলছিলো।

সফবী ও তাকীদের যুগ

১৮০৯ খৃস্টাব্দ তাকী গোত্রের সর্দার মীর ওয়াইয বিদ্রোহ করে বসলেন ইরানের সফবী হুকুমতের বিরুদ্ধে। বিদ্রোহীদেরকে সাথে নিয়ে তিনি কান্দাহার দখল করেন। ১৮১৫ খৃস্টাব্দে মীর ওয়াইয ইন্তেকাল করলে তাঁর ছেলে কান্দাহারের শাসনক্ষমতা গ্রহণ করেন। এদিকে কান্দাহারের তাকী গোত্রের মত হেরাতের আবদালীরাও সফবীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। ইরানী সৈন্যদেরকে পরাজিত করে তারা হেরাত রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮১৮ এবং ১৮১৯ খৃষ্টাব্দের দিকে আফগানিস্তানের বেশ কিছু এলাকায় বিদ্রোহ শুরু হয়ে যায়। এদিকে কান্দাহারের মাহমুদ দ্রুত ইরানের আসফহানের দিকে অগ্রসর হতে লাগলেন। ১৮২২ খৃস্টাব্দে মাহমুদ বাহিনী আসফহান অবরোধ করে ফেলেন। দীর্ঘ আট মাস অবরোধের পর সেখানকার সফবী বাদশা শাহ সুলতান হোসেনকে আত্মসমর্পণে বাধ্য করেন। এরপর মাহমুদ ক্ষমতায় বসলেন। এ সময় রাশিয়ার জার শাসক গোষ্ঠী আফগানিস্তানে আক্রমণের চেষ্টা করে। কিন্তু মাহমুদের প্রবল প্রতিরোধের ফলে তারা পিছু হটতে বাধ্য হয়। ১৭২৫ খৃস্টাব্দে মাহমুদের ইন্তেকালের পর তাঁর

চাচাতো ভাই আশরাফ ক্ষমতায় বসেন। এই সময় তুর্কী উসমানীরা ইরানের দক্ষিণ এলাকা দখল করে নেন। এদিকে রাশিয়ার জার সৈন্যরা আফগানিস্তানের দিকে অগ্রসর হতে লাগলো। আশরাফের সৈন্যরা দারবন্দর-এর নিকট তাদেরকে প্রতিরোধ করে।

নাদির শাহের শাসনামল

কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে, নাদির শাহ ইরানী ডাকাতদের সর্দার ছিলেন। তখন তার নাম ছিলো নাদির কুলি খান। তার সাহস ও রণকৌশল এক সময় তাকে নাদির শাহ হিসেবে ইরানের সিংহাসনে বসায়। এক সময় সে হেরাতের দিকে অগ্রসর হয়ে 'তুস' শহরে আক্রমণ করে। তুস বর্তমানে ইরানের একটি শহর। এই শহরে বিশ্ববিখ্যাত 'শাহনামা'র লেখক কবি ফেরদৌসীর জন্ম। নাদির শাহের আক্রমণ প্রতিরোধে আশরাফ ব্যর্থ হলেন। পরাজিত হয়ে আফগানিস্তানে যাওয়ার পথে জনৈক বেলুচী সরদার এর হাতে নিহত হন। যার ফলে ১৭৩০ খৃস্টাব্দে ইরানের মাটি থেকে আফগানী হুকুমতের সমাপ্তি ঘটে। এরপরই নাদির বাহিনী হিরো হিসেবে আত্মপ্রকাশ ঘটে। ১৭২৭ খৃস্টাব্দের মে মাসের দিকে নাদির বাহিনী মাশাদ থেকে হেরাতের দিকে যাত্রা শুরু করে। এদিকে হেরাতের আবদালীরা মোকাবেলার জন্য আল্লাহ ইয়ার খানের নেতৃত্বে হেরাতের বাইরে বেরিয়ে পড়ে এবং মাহমুদের ভাই মীর হোসেনের কাছে সাহায্যের আবেদন জানায়। এই সময় আফগান সীমান্তে লড়াইয়ে নাদির বাহিনী পরাজিত হয়ে পালিয়ে যায়। দ্বিতীয়বার আক্রমণেও নাদির বাহিনী পরাজিত হলে ১৭২৯ খৃস্টাব্দে আবদালীদের সাথে চুক্তি করেন। আল্লাহ ইয়ার খান নাদির শাহের নায়েব হিসেবে হেরাতের আমীর নিযুক্ত হন। কিন্তু জনসাধারণ এই চুক্তি মানতে অস্বীকৃতি জানায়। তারা স্পষ্ট জানিয়ে দেয়, নাদির শাহকে তাঁরা ট্যাক্স দেবে না। এই সময় আফগান আলিমগণ নাদির শাহ বিরোধী আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন ।

নাদির শাহ ধর্মবিশ্বাসে ছিলো শিয়া। আফগানিস্তানের জনসাধারণ বেশীরভাগ সুন্নী মুসলমান। আফগান জনগণের কাছে উলামায়ে কেরামের প্রভাব ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আলিমদের উপস্থিতির কারণে শেষ পর্যন্ত তাদের সাথে একাত্ম ঘোষণা করে বিভিন্ন গোত্রের নেতারা বিদ্রোহী হয়ে উঠে। আল্লাহ ইয়ার খান চুক্তি অনুযায়ী চলতে চাইলে জনগণ তাকে ক্ষমতাচ্যুত করে। এরপর জুলফিকার খান ক্ষমতায় বসে হেরাতকে স্বাধীন ঘোষণা করে মাশাদ শহর অবরোধ করেন। কিন্তু নাদির বাহিনীর কাছে তিনি শেষ পর্যন্ত পরাজিত হয়ে পালিয়ে যান। এরপর নাদির শাহ হেরাতের দিকে অগ্রসর হন। পথে পথে নাদির শাহ প্রচুর আফগানীকে হত্যা ও তাদের বাড়ি-ঘর ধ্বংস করে। হেরাতের নিকট এসে নাদির বাহিনী থামতে বাধ্য হলো। কারণ এদিকে হেরাতের সৈন্য বাহিনী অন্যদিকে কান্দাহার থেকে এক বিশাল বাহিনী হেরাতে এসে পৌঁছেছে সাহায্যের জন্য। যুদ্ধ চলতে থাকলো। ১৭৩১ খৃস্টাব্দের মে মাস থেকে ১৭৩২ খৃস্টাব্দের মার্চ মাস পর্যন্ত যুদ্ধ চলার পর নাদির শাহ ওয়াদা করলো, তাঁরা হেরাতের কোন ক্ষতি করবে না।

শেষ পর্যন্ত দুর্গের দরজা খুলে দেওয়া হলো। নাদির শাহ্ খোরাসানের মুহাম্মদ খানকে হেরাতের আমীর নিযুক্ত করলেন। হেরাতে আবদালীদের প্রভাব হ্রাসের উদ্দেশ্যে নাদির শাহ্ প্রচুর আবদালীকে খোরাসানে গিয়ে বসতি স্থাপনে বাধ্য করলেন।

২৫শে ফেব্রুয়ারী ১৭৩৬ খৃস্টাব্দে নাদির শাহ্ ইরানের শাহানশাহ্ হয়ে যান। শাহানশাহ্ হওয়ার পর নাদির শাহ্ হিন্দুস্তান দখলের জন্য আফগানিস্তানের কান্দাহার দখল করা জরুরী মনে করলেন। তাই ১৭৩৬ খৃস্টাব্দ থেকে ১৭৩৮ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত লাগাতার আক্রমণ চালিয়ে শেষ পর্যন্ত ২৩ মার্চ ১৭৩৮ খৃস্টাব্দে কান্দাহার দখল করেন। এরপর তিনি আফগানিস্তানের সামাজিক ও রাজনৈতিক ভিত্তিকে নড়বড়ে করে দিলেন। বিভিন্ন প্রকার জুলুমে দুর্বল করতে চাচ্ছিলেন জনসাধারণকে। যদিও হেরাত-কান্দাহার নাদির শাহের দখলে ছিলো, কিন্তু সাধারণ মানুষ তাদের স্বাধীনতা যুদ্ধ অব্যাহত রেখেছিল। ১৮৩৭ খৃস্টাব্দের মে মাসে গজনী, জুন মাসে কাবুল এবং নভেম্বর মাসে জালালাবাদ দখল করে নাদির শাহ্ ডিসেম্বর মাসে নদ সিন্ধু অতিক্রম করেন। ১০ জানুয়ারী ১৭৩৯ খৃস্টাব্দে নাদির শাহ্ লাহোর দখল করে হিন্দুস্তানের মাটিতে তাঁর বিজয় পতাকা উড্ডীন করেন। ৫ মে ১৭৩৯ পর্যন্ত তিনি হিন্দুস্তানে অবস্থান করেন। এসব ইতিহাসের আরেক অধ্যায়।

আহমদ শাহ্ আবদালীর শাসনামল

১৭৪৬ খৃস্টাব্দে আফগানিস্তানে নাদির শাহের দখলদারীর বিরুদ্ধে স্বাধীনতা আন্দোলন শুরু হয়ে যায়। ১৭৪৭ খৃস্টাব্দের ৯ জুন খাপুজানের ক্যাম্পে নাদির শাহের কিছু সৈন্য তাকে হত্যা করে। নাদির শাহের মৃত্যুর পর আফগানিস্তানে আফগানী শাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আহমদ শাহ্ আবদালী এক বৈঠকে ডাকেন। কান্দাহারের নিকটে "শোর সরখ"-এর মাজারে বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিদের বৈঠক শুরু হলো। উপস্থিত সকল গোত্রের নেতাগণ নিজেদেরকে বাদশা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইলেন। আটদিনের আলোচনার পরও যখন সিদ্ধান্ত নেয়া সম্ভব হচ্ছিলো না, তখন সাব্বির শাহ্ নামক জনৈক দরবেশের পরামর্শ চাওয়া হলো। এই দরবেশকে আফগানিস্তানের জনগণ খুব শ্রদ্ধা করতো। দরবেশ গমের দানা দিয়ে একটি মালা তৈরী করে আহমদ শাহ্ আবদালীর মাথায় রেখে বললেন, "আল্লাহর হুকুমে এটা তোমার তাজ হোক।" এরপর সবাই আহমদ শাহ্ আবদালীকে বাদশা হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। তিনি বাদশাহ্ নির্বাচিত হয়েছিলেন ১৭৪৭ খৃস্টাব্দের অক্টোবর মোতাবেক ১১৬০ হিজরীর শাওয়াল মাসে।

১৭৪৮ খৃস্টাব্দে তিনি আফগানীদের বিরাট বাহিনী নিয়ে কাবুলের দিকে যাত্রা করেন। কাবুলে তখন নাসির শাহের শাসন চলছিল। নাসির শাহ্ প্রথমে ছিলো মোগলদের নিয়োজিত হাকিম। পরে সে নাদির শাহের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করে নেয়। নাদির শাহের মৃত্যুর পর নাসির শাহ্ কাবুল, পেশওয়ার ও গজনীর স্বাধীন বাদশাহ্ বলে নিজেকে ঘোষণা করেন। নাসির শাহ্ গজনীতে আবদালীর সৈন্যদের কাছে

পরাজিত হয়ে কাবুলে সৈন্য সমবেত করতে চাইলে আফগানী সৈন্যরা জানিয়ে দেয় যে, আমরা দেশী বাদশাহ্ আহমদ শাহ্ আবদালীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবো না। এরপর নাসির শাহ্ পেশওয়ারে গিয়ে সৈন্য সমবেত করতে ব্যর্থ হয়ে শেষ পর্যন্ত পালিয়ে লাহোরে চলে যান। আবদালী পেশওয়ার আসলে পাঠানরা তাকে স্বাগত জানায়। তিনি পেশওয়ারকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন এলাকা জয় করে শেষ পর্যন্ত দিল্লির দিকে যাত্রা শুরু করেন। 'শেরহিন্দ'-এর নিকটস্থ সালোপুর এলকায় মোগল সৈন্যদের সাথে আহমদ শাহ্ আবদালীর মোকাবেলা হয়। শেষ পর্যন্ত উভয় দলের একটি চুক্তির মাধ্যমে যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটে।

মেহমান হিসেবে আহমদ শাহ্ আবদালী ১৭৫৭ খৃস্টাব্দে দিল্লির রাজদরবারে প্রবেশ করেন। রাজপরিবারের এক শাহ্জাদীর সাথে তাঁর ছেলে তৈমুর-এর বিবাহ হয়। তৈমুরকে পাঞ্জাব, মুলতান এবং সিন্ধের গভর্নর নিযুক্ত করে তিনি কান্দাহারে ফিরে আসেন। এর কিছুদিন পরই পাঞ্জাবে শিখরা বিশৃংখলা শুরু করে। মোগলদের অন্তর্দ্বন্দ্ব আর অসৎ চরিত্রের সুযোগে মিরাঠীরা ১৯শে জিলহজ্জ ১১৭৩ হিজরী দিল্লিতে প্রবেশ করে জুলুম, নির্যাতন আর লুটপাট শুরু করে দেয়। শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্ মোহাদ্দিসে দেহলভী (রঃ) সাহায্যের জন্য আহমদ শাহ্ আবদালীর নিকট পত্র লিখেন। এক, দুই করে ন'টা চিঠি দেওয়ার পর মাত্র সাত হাজার সৈন্য নিয়ে আহমদ শাহ্ আবদালী দিল্লির পথে যাত্রা করলেন। এদিকে মিরাঠীরা পানিপথের নিকটে প্রায় তিন লাখ সৈন্য জমা করলো । ২ জমাদিউস্‌সানী ১১৭৪ হিজরী মোতাবেক ১২ই জুলাই ১৭৬১ খৃস্টাব্দে উভয় পক্ষ সামনা- সামনি হলো পানিপথের ময়দানে। শেষ পর্যন্ত মিরাঠীরা পরাজিত হলো। ও যুদ্ধে প্রায় দু'লাখ মিরাঠী মারা যায়। বাইশ হাজার মিরাঠী মুসলমানদের হাতে বন্দী হয়। এই যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন দশ হাজার মুসলমান। এরপর আবদালী তাঁর বীর সৈন্যদের নিয়ে আসাম, এমনকি মিরাঠীদের শক্তিকেন্দ্র শ্রীলংকা পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিলেন। এই যুদ্ধের পর মিরাঠীদের প্রতাপ একেবারে ধ্বংস হয়ে যায়। পানিপথের যুদ্ধে আহমদ শাহ্ আবদালীর বাহিনী ফ্রন্ট লাইনে কমান্ডারের দায়িত্বে যিনি ছিলেন, ঐতিহাসিকদের মতে তাঁর নাম শাহ্ মোহাম্মদ মোয়াজ্জম আলী । তিনি একজন বাঙালী মুজাহিদ ছিলেন। নবাব সিরাজ-উদ্-দৌলা যখন ইংরেজদের হাতে পরাজিত এবং শহীদ হলেন, তখন শাহ্ মোয়াজ্জম আলীর পিতাও শহীদ হন। মীরজাফর ক্ষমতায় বসে শাহ্ মোয়াজ্জম আলীকে গ্রেফতার করে জেলে প্রেরণ করে। মীরজাফরের পর যখন মীর কাসেম ক্ষমতায় আসেন, তখন গোপনে শাহ্ মোয়াজ্জম আলীকে জেল থেকে মুক্তি দিলে তিনি দিল্লিতে চলে আসেন। পানিপথের যুদ্ধের পর যখন ১৭৬১ খৃস্টাব্দের ১২ই মার্চ আহমদ শাহ্ আবদালী আফগানিস্তানে ফিরে আসেন, তখন মোয়াজ্জম আলী তাঁর সাথে ছিলেন কি-না এ ব্যাপারে কোন তথ্য পাওয়া যায়নি। তবে তিনি যে শেষ পর্যন্ত মহীশুরে হায়দার আলীর সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন এবং আজীবন তাদের সাথে থেকে

বৃটিশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন, তা বিভিন্ন সূত্র থেকে স্বীকৃত। তিনি টিপু সুলতানের সাথেও ছিলেন।

১৭৬৬ খৃস্টাব্দে আহমদ শাহ আবদালীর সাথে পাঞ্জাবের শিখদের যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধে শিখরা পরাজিত হয়। ১৭৭০ খৃস্টাব্দে তিনি খোরাসানের শাসকদের সাথে যুদ্ধ জয় করে সেখানের শাসনপদ্ধতিতে পরিবর্তন আনেন। ১১৮৬ হিজরী মোতাবেক ১৭৭৩ খৃস্টাব্দে কান্দাহার থেকে ৪৫ মাইল দূর 'কুহতুবা' এলাকায় বীর মুজাহিদ আহমদ শাহ আবদালী ইন্তেকাল করেন। কান্দাহারে তাঁকে দাফন করা হয়। কান্দাহারেই তাঁর মাজার।

তৈমুর ও তাঁর ছেলেদের শাসনামল

আহমদ শাহ আবদালীর মৃত্যুর পর তাঁর ছেলে তৈমুর ক্ষমতায় বসেন। তিনি তাঁর শ্রদ্ধেয় পিতার মতোই সাদাসিধে শাসক ছিলেন। আহমদ শাহ আবদালী এতবড় সাম্রাজ্যের মালিক হয়েও কখনো বাদশাহী মুকুট মাথায় পরেননি, দামী কাপড় গায়ে দেননি, শান-শওকতে দস্তরখানে বসে উন্নতমানের খাদ্য গ্রহণ করেননি। তৈমুরও সেই আদর্শের অনুসারী ছিলেন। তৈমুর তাঁর শাসনামলে বোখারার আজবেকী, পাঞ্জাবের শিখ এবং কাশ্মীর ও পাঞ্জাবের বর্গীদেরকে যুদ্ধে পরাজিত করেন। তিনি অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে কান্দাহার থেকে রাজধানীকে কাবুলে স্থানান্তর করেন। ১৭৯৫ খৃস্টাব্দ মোতাবেক ১২০৭-৮ হিজরীতে তৈমুর ইন্তেকাল করেন। এরপর তাঁর ছেলে জামান শাহ, মাহমুদ শাহ ও শাহ সুজার মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব শুরু হয়ে যায়। এদিকে ইংরেজরা হিন্দুস্তানের বেশ কিছু এলাকা দখল করে নেয়। জামান শাহের শাসনামলে তিনি হিন্দুস্তানের ইংরেজ গভর্নরের কাছে এক পত্রে লিখেছিলেন, "আমি মিরাঠীদেরকে শাস্তি দিতে সৈন্য প্রেরণ করতে যাচ্ছি। আশা করি তোমরা এতে নাক গলাবে না।" (-তারিখে জিহাদে আফগানিস্তান, ড: এইচ. বি. খান, ১৯৯২ ইং)

এই চিঠি পেয়ে ইংরেজ গভর্নর জেনারেল কিছুটা আতংকিত হলেন। কারণ, ত্রিশ বছর পূর্বে জামান শাহের দাদা আহমদ শাহ আবদালীর হাতে মিরাঠীদের পরাজয়ের ইতিহাস তার জানা ছিলো। পানিপথের যুদ্ধে মিরাঠীদের সহযোগী ছিলো ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানী। এখন যদি আবার আফগানীদের হাতে মিরাঠীদের পরাজয় ঘটে, তবে ইংরেজদেরকে হিন্দুস্তান ছেড়ে চলে যেতে হবে। তাই ইংরেজ গভর্নর জেনারেল ফতেহ আলী খানের মাধ্যমে আফগানিস্তানে গৃহযুদ্ধ বাধিয়ে দিলেন। জামান শাহের ভাই মাহমুদ শাহ ফতেহ আলী খানের আশ্রয়ে ছিলো। শেষ পর্যন্ত ইরানের সহযোগিতায় মাহমুদ শাহ তার ভাই জামান শাহকে ক্ষমতাচ্যুত করে ক্ষমতায় বসে। ফতেহ আলী খানের ভাই আসাদ খান জামান শাহকে পেশওয়ার থেকে গ্রেফতার করে এবং তার চোখ অন্ধ করে দেয়।

মাহমুদ শাহ যেহেতু বিদেশীদের সহযোগিতায় ক্ষমতায় বসেছেন এবং চারিত্রিক অবস্থা তার খুব খারাপ, তাই আফগান জনগণ তাকে ক্ষমতাচ্যুত করে অন্ধ জামান শাহকে আবার ক্ষমতায় বসায়। অন্ধ অবস্থায় তাঁর পক্ষে রাজ্য পরিচালনায় যেহেতু অসুবিধার সৃষ্টি হয়। তাই, সবাই পরামর্শ করে জামান শাহের অন্য ভাই শাহ সুজাকে ক্ষমতায় বসায়। শাসক হিসেবে শাহ সুজা দুর্বল ছিলেন। তাই শেষ পর্যন্ত আবার ফতেহ খানের সহযোগিতায় মাহমুদ শাহ ক্ষমতা দখল করে নেয় এবং সে শাহ সুজাকে পেশওয়ারে বন্দী করে রাখে। কিন্তু ১৮১৩ খৃস্টাব্দে শাহ সুজা পেশওয়ার থেকে কোনভাবে মুক্ত হয়ে লাহোর চলে যান। সেখানের শিখ শাসক রাজা রণজিত সিংহের কাছে আশ্রয় কামনা করলে রাজা তাকে আশ্রয় না দিয়ে বরং তার মূল্যবান "কুহীনূর" অলংকারটি ছিনিয়ে নেন। এর পর শাহ সুজা ইংরেজদের আশ্রয়ে চলে যান। (আফগানিস্তান ঃ যাওয়াল ছে উরূজ তক)

আফগান রাজপরিবারের এই অন্তর্দ্বন্দ্বের সুযোগে ইরানীরা হেরাত দখলের উদ্দেশ্যে অগ্রসর হতে থাকে। হেরাতের গভর্নর হাজী ফিরোজ উদ্দিন তাঁর ভাই মাহমুদ শাহের কাছে সাহায্য চাইলে ফতেহ আলী খানকে সাহায্যের জন্য প্রেরণ করা হলো। কিন্তু ফতেহ আলী খান সাহায্যের পরিবর্তে ফিরোজ উদ্দিন খানকে গ্রেফতার করে তার ভাই দোস্ত মোহাম্মদ খানকে হেরাতের গভর্নর নিয়োগ করেন। এই সংবাদ পেয়ে মাহমুদ শাহের ছেলে কামরান এক বাহিনী নিয়ে এসে ফতেহ আলী খানকে গ্রেফতার এবং অন্ধ করে দেয়। ভয়ে ফতেহ আলী খানের ভাই দোস্ত মোহাম্মদ কাশ্মীরে পালিয়ে যান। পরে দোস্ত মোহাম্মদ শক্তি সঞ্চয় করে আফগানিস্তানের বেশ কিছু এলাকা দখল করে নেন। এই সময় শুরু হয়ে যায় কাবায়েলী তথা গোত্রীয় সংঘাত।

দোস্ত মোহাম্মদ ও রাশিয়া

১৮৩১ থেকে ৩৩ খৃস্টাব্দের মধ্যে ইংরেজ লেফটেনেন্ট কর্নেল বার্নিস আফগানিস্তান সফর এবং লাহোরে শিখ রাজা রণজিত সিং-এর সাথে দেখা করেন। এই সফর ছিলো পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণমূলক। এদিকে দোস্ত মোহাম্মদের সাথে রাশিয়ার জার শাসকদের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে উঠে। ইংরেজরা তা সহ্য করতে পারলো না। তাই তারা বৃটিশ পার্লামেন্টে এবং সংবাদপত্রে এর নিন্দাবাদ করে বিভিন্ন মিথ্যাচার করতে থাকে। রাশিয়ার প্রতিনিধি– যিনি কাবুলে এসেছিলেন– শেষ পর্যন্ত বৃটিশদের নিন্দাবাদ ও অপপ্রচারের কারণে ফিরে যেতে বাধ্য হলেন। রাশিয়া পিছিয়ে যেতেই ইংরেজরা আক্রমণের প্রস্তুতি শুরু করে দেয়।

আফগানিস্তানে ইংরেজদের প্রথম পর্ব

বৃটিশরা তৈমুর শাহের ছেলে শাহ সুজাকে সামনে রেখে ১৮৩৯ সালের ২৫শে এপ্রিল কান্দাহার দখল করে নেয় এবং শাহ সুজাকে ক্ষমতায় বসায়। আফগানীরা শাহ

সুজার অভিষেক অনুষ্ঠান সম্পূর্ণভাবে বর্জন করলেও ইংরেজরা বৃটেনে এর সফলতার বর্ণনা দিয়ে চিঠি লিখে। শাহ্ সুজার অন্তরালে মূলত কান্দাহারে ইংরেজদেরই শাসন চলছিলো। একটি চুক্তির ভিত্তিতে ইংরেজরা তাদের সকল কর্মতৎপরতাকে বৈধ করে নিয়েছিলো। ইংরেজরা গজনীর দিকে অগ্রসর হলে দোস্ত মোহাম্মদ প্রতিরোধের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। কিন্তু তার ভাতিজা আব্দুর রশিদ বিশ্বাসঘাতকতা করে সকল পরিকল্পনা ইংরেজদেরকে জানিয়ে দেয়। শেষ পর্যন্ত দোস্ত মোহাম্মদ পালিয়ে বোখারায় গিয়ে সেখানকার গভর্নর নাসিরুল্লাহ্ খানের কাছে রাজনৈতিক আশ্রয় গ্রহণ করেন। ইংরেজরা শাহ্ সুজাকে দিয়ে আরেকটি চুক্তিনামায় স্বাক্ষর করায়। যার প্রধান শর্ত ছিলো, কাবুল সরকারের উপদেষ্টা ইংরেজরা থাকবে। সাধারণ জনগণ যখন দেখল, শাহ্ সুজার হুকুমত মূলত বৃটিশদের শাসন, তখন তারা বিদ্রোহী হয়ে উঠে। বিভিন্ন স্থানে শুরু হয়ে যায় স্বাধীনতা যুদ্ধ। এই সুযোগে দোস্ত মোহাম্মদ এক বাহিনী নিয়ে উত্তর আফগানিস্তানের দিকে অগ্রসর হতে থাকেন। প্রচুর আফগানী এই বাহিনীতে অংশগ্রহণ করে। ১৮৪০ খৃস্টাব্দের ২রা নভেম্বর কাবুল থেকে প্রায় আশি মাইল দূরে দোস্ত মোহাম্মদের সাথে ইংরেজ সৈন্যদের যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে ইংরেজরা পরাজিত হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দোস্ত মোহাম্মদ আর অগ্রসর হতে না পেরে আত্মসমর্পণে বাধ্য হন। তাঁকে বন্দী করা হলো। কিন্তু আন্দোলন শান্ত কিংবা স্তব্ধ হলো না। দোস্ত মোহাম্মদের বড় ছেলে আকবর খান নেতৃত্ব দিয়ে এগিয়ে এলেন। গোত্রীয় সর্দারগণ নতুন নেতৃত্বের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করে নিলো। আফগান আলেমগণ (আফগানীদের ভাষায় "মোল্লা সাহেব") আকবর খানের পৃষ্ঠপোষকতা করতে লাগলেন। চারদিকে বৃটিশ-বিরোধী জিহাদ শুরু হয়ে গেলো। কাবুলে ইংরেজদের সাথে আফগানীদের এক বিরাট সংঘর্ষ হলো। এতে লেফটেনেন্ট কর্নেল বার্নিসসহ বেশ কিছু বৃটিশ অফিসার ও সৈন্য মারা গেলো। এরপর লাগাতর যুদ্ধ চলতে থাকল। প্রত্যেকটি যুদ্ধেই ইংরেজরা পরাজিত হলো। ইংরেজরা বার বার তাদের দালাল মোহনলালকে দিয়ে চেষ্টা করেছে পদ, পদবী, অর্থ দিয়ে কাবায়েলী সর্দারদেরকে খরিদ করে নিতে। কিন্তু আফগান সর্দারগণ ইংরেজদের চৌধুরী, তালুকদারী, জমিদারী, তফাদারী ইত্যাদি পদবীকে উপেক্ষা করে তাদের দেশ ও জাতির স্বাধীনতা আন্দোলনকে অব্যাহত রেখেছিলেন। তাই আফগানিস্তানে চৌধুরী, তালুকদার, জমিদার, তফাদার পদবীর কোন লোক নেই। ইংরেজরা যখন কোনভাবেই আফগানীদের কাবু করতে পারছিলো না, তখন, অর্থাৎ– ১৮৮২ খৃস্টাব্দের ১লা জানুয়ারী কাবুল ছাড়ার চুক্তিনামায় স্বাক্ষর করে। পরাজিত ইংরেজরা যখন কাবুল ছেড়ে জালালাবাদের রাস্তা দিয়ে হিন্দুস্তানের দিকে যাত্রা করে, তখন আফগানীরা তাদের রক্তের মূল্য লাভে-আসলে আদায় করে। অর্থাৎ– জালালাবাদের পথে প্রায় ১৫ হাজার ইংরেজ সৈন্যকে আফগানীরা হত্যা করে। (–আফগানিস্তান ঃ যাওয়াল ছে উরূজ তক এবং তারিখে জিহাদে আফগানিস্তান)

এ সময় শাহ সুজার শাসনেরও সমাপ্তি ঘটে। জালালাবাদ শহরে তখনও ইংরেজদের অবস্থান ছিলো। ওরা বিভিন্ন সুযোগে বিভিন্ন সময় কাবুলে আক্রমণের চেষ্টা করেছে। ইংরেজরা দোস্ত মোহাম্মদকে এই শর্তে মুক্তি দিলো যে, তিনি তার ছেলের কাছে পত্র লিখবেন যাতে ইংরেজগণ বিনা বাধায় কাবুলে প্রবেশ করতে পারে। দোস্ত মোহাম্মদ কাবুল পৌঁছে ১৮৪৩ খৃস্টাব্দে আবার ক্ষমতায় বসেন।

শের আলী খানের শাসনামল

দোস্ত মোহাম্মদ খানের ইন্তেকালের পর তার তৃতীয় ছেলে শের আলী খান ক্ষমতায় বসেন। ইংরেজরা তাঁর কাছে কাবুলে তাদের প্রতিনিধি রাখার অনুমতি চাইলো। তিনি অনুমতি দিতে অস্বীকার করলেন। এরপর ১৮৭৭ সালের ১লা জানুয়ারী দিল্লিতে যে অনুষ্ঠানে রাণী ভিক্টোরিয়া-কে 'হিন্দুস্তানের সম্রাজ্ঞী' বলে ঘোষণা দেওয়া হয়, সেই অনুষ্ঠানে ইংরেজরা শের আলী খানকে দাওয়াত করেছিলো। শের আলী খান ইংরেজদের এই দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করেন। কারণ তিনি জানতেন, এ অনুষ্ঠানে তিনি উপস্থিত হলে ইংরেজরা দুনিয়াকে জানিয়ে দেবে, আফগানিস্তানও রাণী ভিক্টোরিয়াকে স্বাগত জানাচ্ছে। ইংরেজরা এই ঘটনার পর অজুহাত খুঁজছিলো আফগানিস্তান আক্রমণের। ১৮৭৮ খৃস্টাব্দে যখন রাশিয়ার এক প্রতিনিধি দল কাবুলে পৌঁছে, তখন কাবুল সরকারের অনুমতি ছাড়াই জেনারেল আইন চেম্বারলিন-এর নেতৃত্বে এক বৃটিশ প্রতিনিধি দল কাবুলে প্রবেশের চেষ্টা করে। আনুমানিক ১৮ই আগস্ট সীমান্তবর্তী মুজাহিদগণ বৃটিশ প্রতিনিধি দলকে প্রতিরোধ করে। এই ঘটনার জন্য ইংরেজরা শের আলী খানকে ক্ষমা চাইতে বললো। সাথে সাথে কাবুলে ইংরেজ প্রতিনিধিত্বের অনুমতি চাইলো। কিন্তু শের আলী খানের কাছ থেকে উত্তর আসার পূর্বেই ১২ই নভেম্বর ইংরেজ সৈন্যগণ আফগানিস্তান আক্রমণ করে বসে। ফলে আবার যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। হঠাৎ আক্রমণ করে ইংরেজরা জালালাবাদ, কান্দাহার ইত্যাদি কয়েকটি এলাকা দখল করে নেয়। তবে ইংরেজরা কাবুলে প্রবেশ করতে ব্যর্থ হলো। শের আলী খান তার পিতা দোস্ত মোহাম্মদের মত উত্তর দিক থেকে আক্রমণের পরিকল্পনায় মাযার-ই-শরীফে চলে যান। কিন্তু সেখানে গিয়ে তিনি অসুস্থ হয়ে ১৮৭৯ ইংরেজীর ১২ই ফেব্রুয়ারী ইন্তেকাল করেন।

আফগানিস্তানে ইংরেজ শাসনের দ্বিতীয় পর্ব

শের আলী খানের মৃত্যুর পর তাঁর ছেলে ইয়াকুব খান ক্ষমতায় বসেন। ইয়াকুব খান হেরাতের গভর্নর থাকাকালে ইংরেজ এজেন্টদের সাথে তাঁর গভীর সম্পর্ক গড়ে উঠে। ক্ষমতায় বসেই ইয়াকুব খান ইংরেজদের সর্বপ্রকার সুযোগ দিতে শুরু করে। ফলে সাধারণ মানুষ ইয়াকুব খানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। ইয়াকুব খানের ভাই হেরাতের

গভর্নর আয়ুব খানও বিদ্রোহীদের সাথে ছিলেন। ১৮৭৯ ইংরেজীর সেপ্টেম্বর মাসে বিদ্রোহী জনতা কাবুলের ইংরেজ মিশনের কর্মকর্তা ও তাদের কিছু এজেন্টকে হত্যা করে। এই ঘটনার প্রতিশোধ নিতে ইংরেজরা বিরাট এক বাহিনী আফগানিস্তানে প্রেরণ করে। সেই বাহিনীকে প্রতিরোধ না করে বরং ২রা সেপ্টেম্বর ইয়াকুব খান আত্মসমর্পণ করে। কিন্তু আফগান জনতা ওদের প্রতিরোধের চেষ্টা করে। তবে অস্ত্র ও প্রশিক্ষণের অভাবে তারা এক সপ্তাহের বেশি যুদ্ধ চালাতে পারলো না। ১২ই অক্টোবর জেনারেল রবার্টস্- এর নেতৃত্বে ইংরেজরা কাবুলে প্রবেশ করে। সাধারণ জনতার সাথে অনেক আলেম ও আফগান জেনারেল সেই যুদ্ধে শহীদ হন। কিন্তু এরপরও আফগান জনতা ও আলেমগণ দমে গেলেন না। তারা 'বালাহিসাব' দুর্গে আক্রমণ করে ইংরেজদের বারুদের গুদাম উড়িয়ে দেয় এবং ১৪ ডিসেম্বর এক পাহাড়ী যুদ্ধে জেনারেল রবার্টসের সৈন্যদেরকে পরাজিত করে। আফগান মুজাহিদদের গেরিলা আক্রমণের ফলে ইংরেজদের খবর হয়ে যায় যে, আফগান জাতিকে বশীভূত করা সম্ভব নয়। তাই তারা আফগানিস্তানকে খণ্ড খণ্ড করার ষড়যন্ত্র পাকালো। তবে এ ব্যাপারে রাশিয়া প্রতিবাদ জানালে ইংরেজরা আর সামনে অগ্রসর হলো না।

(–আফগানিস্তান ঃ যাওয়াল ছে উরুজ তক)

১৮৮০ সালের মার্চ ও এপ্রিল মাসে বৃটেনে পার্লামেন্ট নির্বাচনের মাধ্যমে এক বিরাট পরিবর্তন আসে। আফগানিস্তানে বৃটিশরা সিদ্ধান্ত নিলো, ইয়াকুব খানের পরিবর্তে তার চাচাত ভাই আব্দুর রহমান খানকে ক্ষমতায় বসাবে। আব্দুর রহমান খান এক সময় উত্তর আফগানিস্তানের গভর্নর ছিলেন। আরেক আমীরের সাথে সংঘাতের কারণে তিনি রাশিয়ায় রাজনৈতিক আশ্রয় নিয়েছিলেন। ইংরেজরা কাবুল দখলের পর রাশিয়ার পরিকল্পনা অনুযায়ী আব্দুর রহমান খান আফগানিস্তানে এসে বৃটিশদের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তুলে। তখন ইংরেজরা বুঝতে পারে যে, তাদের যাওয়ার সময় হয়ে গেছে। তাই তারা ক্ষমতার মসনদে তাদের ওফাদার রেখে যেতে চাচ্ছিলো। কিন্তু এই সময় শের আলী খানের দ্বিতীয় ছেলে আয়ুব খানের সাথে এক যুদ্ধে ইংরেজরা কান্দাহারে পরাজিত হলে অবস্থার দ্রুত পরিবর্তন ঘটে। কান্দাহারের আশপাশে বেশ কয়েকটি যুদ্ধে আয়ুব খান ইংরেজদের পরাজিত করেন। এই সংবাদ মুহূর্তের মধ্যে চারিদিকে পৌঁছে গেলে বিভিন্ন এলাকায় বিদ্রোহ শুরু হয়ে যায়। এমনকি বোম্বাই পর্যন্ত এই সংবাদ বৃটিশবিরোধী আন্দোলনের প্রেরণার উৎস হয়ে দাঁড়ায়। হিন্দুস্তানের ইংরেজ সরকার তাদের এই অপমানজনক পরাজয় রোধকল্পে জেনারেল বরার্টসের নেতৃত্বে নতুন করে আবার সৈন্য প্রেরণ করে। জেনারেল রবার্টসের বাহিনী প্রথম দিকে বিজয়ী হলেও শেষ পর্যন্ত অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছিল যে, বৃটিশরা আফগানিস্তান ত্যাগ করতে পারলে বাঁচে। তারা যাওয়ার সময় আব্দুর রহমান খানকে সাথে নিয়ে যায়।

আব্দুর রহমান খানের শাসনামল

ইংরেজদের সর্বাত্মক সহযোগিতায় আব্দুর রহমান খান হেরাত দখল করে নেয়। শের খানের সুযোগ্য উত্তরসূরী আয়ুব খান শেষ পর্যন্ত পালিয়ে ইরানে আশ্রয় নেন। ১৮৮০ সাল থেকে ১৯০১ ইংরেজী পর্যন্ত হেরাতে আব্দুর রহমান খানের শাসন চলে।

হাবীবুল্লাহ খানের শাসনামল

আমীর আব্দুর রহমান খানের ইন্তেকালের পর তার ছেলে হাববিল্লাহ্ খান ক্ষমতায় বসেন। তিনি আমীর থেকে বাদশা উপাধি গ্রহণ করেন। প্রথম দিকে তিনি ইংরেজদের সহযোগিতা ছাড়াই চলতে চেয়েছেন। গোটা হিন্দুস্তান তখন ইংরেজদের শাসনাধীন। আফগানিস্তান যদিও স্বাধীন, তবুও তাদের পক্ষে ইংরেজদের সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা অসম্ভব ছিলো। তাই ১৯০৫ সালের ১২ই মার্চ হিন্দুস্তানের ইংরেজ ভাইসরয় বড় লর্ড কার্জনের প্রতিনিধির সাথে হাবীবুল্লাহ খান তার পিতার মতো একটি পারস্পরিক সহযোগিতা চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। ১৯১৪ সাল থেকে ১৯১৮ সাল পর্যন্ত সংঘটিত বিশ্বযুদ্ধে হাবীবুল্লাহ খান ইংরেজদের পক্ষে ছিলেন। এই পক্ষে থাকার কৃতজ্ঞতা জানাতে ১৯১৫ সালের ১৪ই ডিসেম্বর বৃটিশ সম্রাট পঞ্চম জর্জ স্বয়ং আফগানিস্তানের বাদশা হাবীবুল্লাহ খানের কাছে পত্র লিখেন। বৃটিশ সম্রাট পত্রের শুরুতেই বলেন, "আমার প্রিয় বন্ধু এবং সম্মানিত বাদশাহ! আমি তার বন্ধুত্বকে শ্রদ্ধা জানাই, যিনি আমার জাতিকে ঐক্যবদ্ধ রাখায় সহযোগিতা করেছেন" ইত্যাদি। (আফগানিস্তান ঃ যাওয়াল ছে উরূজ তক এবং তারিখে জিহাদে আফগানিস্তান)

ইংরেজরা কিন্তু আন্তর্জাতিক মহলে আফগানিস্তানের শত্রু হিসেবে বিবেচিত ছিলো। তারা চাইতো না, আফগানিস্তান আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সুসম্পর্ক গড়ে তুলুক। বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯১৯ সালে ফ্রান্সে যে শান্তি সম্মেলন হয়। ইংরেজরা সেখানে আফগানিস্তানের অংশগ্রহণের ব্যাপারে এই বলে প্রতিবাদ জানায় যে, "আমরা চাইনা শান্তি সম্মেলনে কোন অবাধ্য ছোট দেশ অংশগ্রহণ করুক।" অথচ এই ইংরেজদের স্বার্থ রক্ষার্থে আফগান আমীর হাবীবুল্লাহ্ শুধু প্রথম বিশ্বযুদ্ধেই অংশগ্রহণ করেননি, সাথে সাথে ১৯১৭ সালের নভেম্বর মাসে রাশিয়ায় যে কম্যুনিস্ট বিপ্লব হয়, এর বিরুদ্ধে তিনি ইংরেজদের পক্ষেই কাজ করেছিলেন। হাবিবুল্লাহ্ খান একজন অসৎ এবং বিলাসী বাদশা ছিলেন। সাধারণ জনগণ তাকে পছন্দ করতো না। অন্যদিকে তিনি যাদেরকে বন্ধু মনে করতেন, সেই ইংরেজরাও তাকে ভালো চোখে দেখতো না। ১৯১৮ সালের ১লা ডিসেম্বর আমীর তার ছেলে আমানুল্লাহ্‌কে কাবুলে রেখে আফগানিস্তানের শীতকালীন রাজধানী জালালাবাদে আসেন। সেখানে থেকে তিনি ১৯১৯ সালের ২রা ফেব্রুয়ারী এক রাতের জন্য 'দার্‌রা-এ-লোকমান' যান। এখানে কে বা কারা রাত তিনটায় তার ঘরে ঢুকে তাকে হত্যা করে। এই হত্যাকারীর সন্ধান আজও জানা যায়নি। (আফগানিস্তান ঃ যাওয়াল ছে উরূজ তক এবং আফগানিস্তান মে আগ)

ঐতিহাসিকদের মাঝে এই হত্যাকাণ্ড নিয়ে বিভিন্ন মত আছে। তবে এখানে যে বিদেশী সরকারের হাত আছে, সে ব্যাপারে সবাই একমত। বৃটিশদের হাত থাকার ব্যাপারেও অনেকে মত প্রকাশ করেছেন। কারণ হিসেবে তারা বলেছেন, যদিও হাবিবুল্লাহ্ খান বৃটিশদের সাথে বন্ধুত্ব রাখতেন, এরপরও তিনি বৃটিশবিরোধী আন্দোলনে হিন্দুস্তানের মুসলমানদেরকে প্রচুর সাহায্য করতেন। তার শাসনামলে প্রচুর হিন্দুস্তানী মুজাহিদ আফগানিস্তানে থেকে হিন্দুস্থানে বৃটিশবিরোধী আন্দোলনের প্রস্তুতি নিতেন। বিশেষ করে রেশমী রুমাল আন্দোলনের নায়ক শায়খুল হিন্দ মাহমুদুল হাসান দেওবন্দী (রহঃ) তাঁর শিষ্য মাওলানা ওবায়দুল্লাহ্ সিন্ধীকে প্রচুর শিষ্যসহ্ কাবুলে প্রেরণ করেছিলেন আন্দোলনকে শক্তিশালী করার জন্য। (–আফগানিস্তান ঃ যাওয়াল ছে উরূজ তক)

আমানুল্লাহ খানের শাসনামল

হাবীবুল্লাহ্ খানের ইন্তেকালের পর সাতদিনের জন্য ক্ষমতায় ছিলেন তার চাচা এবং নায়েবে সুলতান নাসিরুল্লাহ্ খান। জনগণ এবং আফগান আলিমগণ তাকে মানেননি। ফলে সাতদিনের মাথায় তিনি ক্ষমতাচ্যুত হন। ক্ষমতায় বসেন হাবিবুল্লাহ্ খানের ছেলে আমানুল্লাহ্ খান। ব্যক্তিগতভাবে তিনি অন্যান্য বাদশার তুলনায় ভালো চরিত্রের ছিলেন। ২৮শে ফেব্রুয়ারী ক্ষমতা গ্রহণ করেই তিনি ঘোষণা দিলেন, "আজ থেকে দেশী-বিদেশী সকল ব্যাপারেই আফগান সরকার স্বাধীন ও স্বয়ংসম্পূর্ণ।" সাথে সাথে তিনি রাশিয়া, বৃটেন, চীন, ইরান, তুরস্ক, ইটালি ইত্যাদি দেশের সরকারের কাছে বন্ধুত্বের আহ্বান জানিয়ে পত্র লিখেন। অতীতে তার বাপ-দাদার সকল চুক্তি তিনি বাতিল করে দেন। স্বাধীন রাষ্ট্রের রীতি অনুসারে যারা চুক্তি করতে আগ্রহী, তাদেরকেই তিনি আহ্বান জানান। প্রথমেই এগিয়ে আসে রাশিয়া। স্বয়ং লেনিন আমানুল্লাহ্র কাছে বন্ধুত্বের সাড়া দিয়ে পত্র লিখেন। ফলে ১৯২০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে রাশিয়ার সাথে আফগানিস্তানের মৈত্রীচুক্তি হয়। দোস্ত মোহাম্মদের পর রাশিয়ার সাথে আফগনিস্তানের বড় ধরনের মৈত্রী চুক্তি এটাই প্রথম।

এরপর ১৯২১ সালের ২৮শে এপ্রিল ফ্রান্সের সাথে, ৩রা জুন ইটালির সাথে এবং ২২ শে নভেম্বর বৃটেনের সাথে বিভিন্ন বিষয়ে মৈত্রীচুক্তি হয়। ১৯৬৩ সালে চীনের সাথে মৈত্রীচুক্তি হয়। আসলে আমানুল্লাহ্ খান একজন ইংরেজবিরোধী শাসক ছিলেন। ইংরেজদের সাথে শত্রুতাই তাকে সোভিয়েত ইউনিয়নের বন্ধুত্বের শৃঙ্খলে বন্দী করেছিলো। কিন্তু কমিউনিস্টগণ যখন মুসলমানদের উপর নির্যাতন শুরু করে, তখন আবার এই বন্ধুত্ব ভেঙ্গে যায়। তিনি মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষার্থে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলেন এবং রাশিয়ার মজলুম মুসলমানদেরকে আফগানিস্তানে আশ্রয় দেন। ১৯৬৫ সালে রাশিয়া আফগানিস্তান আক্রমণ করে এবং দরিয়া-এ-আমুর তীরবর্তী এলাকা দখল করে নেয়। এই দরিয়া-এ-আমু (River Oxus) ১৮৭২ সালে রুশ-আফগান সীমানা হিসেবে চিহ্নিত ছিলো। (Red Flag Over Afghanistan, p-12)

আমানুল্লাহ খান প্রথমদিকে খুব জনপ্রিয় রাষ্ট্রপ্রধান ছিলেন। কিন্তু শেষদিকে নিজের কিছু ব্যক্তিগত ভুল ও শত্রুদের অপপ্রচারে জনগণ বিদ্রোহী হয়ে উঠে। তিনি ইংরেজবিরোধী ছিলেন, তাই অপপ্রচারে বেশী মদদ দিয়েছে ইংরেজরা। তিনি যখন চিকিৎসার জন্য বার্লিন গেলেন, তখন ফেরার পথে ইংল্যান্ড, রাশিয়া ইত্যাদি দেশ সফর করেন। শত্রুদের অপপ্রচারের কারণে আফগান জনগণ তা ভালো চোখে দেখেনি। অথচ তার এই সফরে আফগানিস্তানের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অনেক উপকার হয়েছে। আমীর আমানুল্লাহ খানের বিরুদ্ধে জনগণ চূড়ান্ত বিদ্রোহ করে, যখন তিনি সফর থেকে এসে ২৮ আগস্ট ১৯২৮ খৃস্টাব্দে এক সম্মেলনের আয়োজন করেন। সেই সম্মেলনে নারী ও পুরুষ উভয়ের উপস্থিতির ফলে ধর্মপ্রাণ আফগানীরা তাকে সন্দেহ করে। উপরন্তু সেদিনের সম্মেলনে তিনি মহিলাদেরকে পর্দার ভেতর থেকে বেরিয়ে স্বাধীনভাবে চলাফেরার প্রতি আহ্বান জানান এবং পুরুষদের জন্য একের অধিক বিবাহ অবৈধ ঘোষণা করেন। (- আফগানিস্তান ঃ জায়াল ছে উরূজ তক)

নারী ও পুরুষদের অবাধ মেলামেশা, ইসলামের অত্যন্ত জরুরী বিধান পর্দাপ্রথার বিলোপ এবং কোরআন-হাদীস যেখানে চার বিবাহ বৈধ করেছে, সেখানে একাধিক বিয়ে নিষিদ্ধ ঘোষণা করায় জনগণ আমানুল্লাহ খানকে ঘৃণা করতে শুরু করে। বাচ্চা সাকা প্রমুখের নেতৃত্বে তা শেষ পর্যন্ত গণবিদ্রোহের রূপ নেয়। অবশেষে ১৮ জানুয়ারী ১৯২৯ সালে তার ভাই এনায়েতুল্লাহ খানের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করে তিনি কাবুল ত্যাগ করতে বাধ্য হন।

এনায়েতুল্লাহ থেকে নাদির খান

আমানুল্লাহ খানের কাছ থেকে ক্ষমতা পাওয়ার পর এনায়েতুল্লাহ খান চার দিনের বেশী ক্ষমতায় থাকতে পারেননি। আমানুল্লাহ খানের সময়ের বিদ্রোহী কাবায়েলী সর্দার বাচ্চা সাকা ১৮ই জানুয়ারী এনায়েতুল্লাহর কাছ থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে নেন। বাচ্চা সাকা আমীর বা বাদশা হওয়ার কোন যোগ্যতা রাখতেন না। তিনি নিজে তার স্বাক্ষরটা পর্যন্ত দিতে অক্ষম ছিলেন। কিন্তু বৃটিশদের সহযোগিতায় তিনি আব্দুর রহমান খানের পরিবারকে আফগানিস্তানের ক্ষমতার মসনদ থেকে উৎখাত করতে সক্ষম হন। কিন্তু তিনিও আবার পাঁচ মাসের মাথায় ক্ষমতার মসনদ থেকে বিদায় হন। ১৫ই অক্টোবর বাচ্চা সাকার সৈন্যদেরকে পরাজিত করে মোহাম্মদ নাদির খান কাবুলে প্রবেশ করেন। ১৬ই অক্টোবর তিনি নিজেকে বাদশা হিসেবে ঘোষণা দিয়ে ক্ষমতায় বসেন। ১৯৩৩ সালের ৮ই নভেম্বর আব্দুল খালেক নামে এক ছাত্র নাদির খানকে গুলি করে হত্যা করে। এরপর ক্ষমতায় বসেন তার ১৯ বছর বয়সী ছেলে মোহাম্মদ জহির খান।

জহির শাহ থেকে মোহাম্মদ দাউদ

মোহাম্মদ জহির খান যিনি ইতিহাসে জহির শাহ হিসেবে পরিচিত দীর্ঘ চল্লিশ বছর আফগানিস্তানের বাদশা ছিলেন। কিন্তু গোটা চল্লিশ বছরই তিনি ছিলেন নামমাত্র

বাদশা। প্রথমদিকে তার তিন চাচা–মোহাম্মদ হাশিম, সর্দার শাহ্ মাহমুদ ও সর্দার শাহ্ ওলী রাজ্য চালাতেন। তাদের পর বাদশা নির্ভরশীল হয়ে যান জেনারেল মোহাম্মদ দাউদের উপর। দাউদ ছিলেন বাদশার চাচাতো ভাই ও ভগ্নিপতি। ১৯৫৩ সালে জেনারেল দাউদ প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়ে আফগানিস্তানের সকল দরজা রাশিয়ার জন্য খুলে দেন। কয়েক হাজার সৈন্যকে প্রশিক্ষণের জন্য রাশিয়ায় প্রেরণ করেন। প্রচুর শিক্ষক সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে আফগানিস্তানে আমদানী করেন। বাদশা এসবের প্রতিবাদ করে ব্যর্থ হয়েছেন নিজের দুর্বলতার কারণে। এভাবে আস্তে আস্তে আফগানিস্তানে কম্যুনিস্ট দর্শনের প্রচার ও প্রসার ঘটতে থাকে। যারা সোভিয়েত রাশিয়ায় গিয়ে সামরিক প্রশিক্ষণ নিতো, তাদের বড় অংশটাই কমিউনিস্ট মানসিকতা নিয়ে দেশে ফিরতো। বাদশা ওদেরকে ভিন্ন চোখে দেখতেন। ফলে তারা বিদ্রোহী হয়ে উঠে। ওদেরকে নিয়েই ১৯৭৩ সালে জেনারেল দাউদ অভ্যুত্থানের মাধ্যমে জহির শাহকে ক্ষমতাচ্যুত করেন।

জহির শাহের শাসনামলে ১৯৬৫ ইংরেজীর অক্টোবর মাসে আফগানিস্তানে সর্বপ্রথম পার্লামেন্ট ব্যবস্থা চালু করা হয়। এই পার্লামেন্ট নির্বাচনকে সামনে নিয়েই ১৯৬৪ সালে গঠিত হয়, "পিপলস্ ডেমোক্রেটিক পার্টি অব আফগানিস্তান"। এ পার্টির প্রথম সেক্রেটারী জেনারেল ছিলেন নূর মোহাম্মদ তারাকী এবং প্রতিষ্ঠাতা সদস্যদের অন্যতম ছিলেন বারবাক কারমাল। ১৯৬৭ সালে আবার পিপলস্ ডেমোক্রেটিক পার্টি নেতৃত্বের দ্বন্দ্বে দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। নূর মোহাম্মদ তারাকীর নেতৃত্বে গঠিত হয় 'খালক্ পার্টি' এবং বারবাক কারমালের নেতৃত্বে 'পরচম পার্টি'। ভিন্ন নামে গঠিত হলেও প্রকৃতপক্ষে এগুলো ছিলো কম্যুনিস্ট পার্টি।

জেনারেল দাউদের অভ্যুত্থানে বারবাক কারমালের পরচম পার্টির প্রকাশ্য সহযোগিতা ছিলো। তাই সরকার গঠনের সময় জেনারেল দাউদ পরচম পার্টির অনেক নেতাকে মন্ত্রিত্বসহ বেশ কিছু পদ উপহার দেন। জেনারেল দাউদ রাজতন্ত্র ভেঙ্গে গণপ্রজাতন্ত্র অর্থাৎ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করেন। ক্ষমতা গ্রহণের দিন কাবুল রেডিওতে বক্তব্য দিতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন, "আজ রাজতন্ত্রকে খতম করে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করলাম। এই গণতন্ত্র সঠিক ইসলামী গণতন্ত্র হবে।"

তিনি নিজেকে রিপাবলিক অফ আফগানিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ঘোষণা করেন। জেনারেল দাউদের সঠিক গণতন্ত্র বাস্তবে পাকিস্তানের আইয়ুব খানের মৌলিক গণতন্ত্রের মতোই এক প্রকারের ধোঁকা ছিলো। প্রকৃতপক্ষে জহির শাহের রাজতন্ত্রের সাথে দাউদের গণতন্ত্রের কোন ব্যবধান ছিলো না। কারণ জহির শাহের সময়ও পার্লামেন্ট ব্যবস্থা ছিলো। প্রথমদিকে দাউদের কম্যুনিস্ট রাশিয়ার সাথে খুব সম্পর্ক ছিলো। কিন্তু এক সময় সে সম্পর্ক ভেঙ্গে যায়। ফলে জেনারেল দাউদ কম্যুনিস্ট মানসিকতার কিছু লোককে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দিলেন। রাশিয়ার ইঙ্গিতে তখন 'খালক্' ও 'পরচম' পার্টি আবার

এক হয়ে পিপলস্ ডেমোক্রেটিক পার্টি নাম ধারণ করে এবং দাউদের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে। এরপর শুরু হয়ে যায় হত্যা, বিশৃঙ্খলা। শেষ পর্যন্ত পিপলস্ পার্টির সহযোগিতায় ১৯৭৮ সালের ২৭শে এপ্রিল মোহাম্মদ দাউদের বিরুদ্ধে এক সামরিক অভ্যুত্থান ঘটে। এতে দাউদ সপরিবারে নিহত হন।

সরাসরি কম্যুনিস্টদের ক্ষমতা দখল

জেনারেল মোহাম্মদ দাউদের মৃত্যুর পরই ক্ষমতায় বসেন পিপল্স ডেমোক্রেটিক পার্টির নেতা নূর মোহাম্মদ তারাকী। কম্যুনিজমের নীতি অনুসারে তারাকী সরকার রাষ্ট্রীয় ও ধর্মীয় ব্যাপারে বিভিন্ন সংস্কারমূলক পদক্ষেপ নিলে বিদ্রোহ দেখা দেয়। শেষ পর্যন্ত ১৯৭৯ ইংরেজীর ১৪ই সেপ্টেম্বর এক অভ্যুত্থানে তিনি ক্ষমতাচ্যুত ও নিহত হন। এরপর ক্ষমতায় আসেন তার সময়ের প্রধানমন্ত্রী হাফিজুল্লাহ আমীন। ২৭শে ডিসেম্বর আবার সামরিক অভ্যুত্থান ঘটে। রাশিয়ার ইঙ্গিতে বারবাক কারমাল ক্ষমতায় বসে প্রধানমন্ত্রীর পদ গ্রহণ করেন। তারাকী সরকার কর্তৃক ১৯৭৯ সালের ৫ই ডিসেম্বর স্বাক্ষরিত মস্কো-কাবুল মৈত্রী ও সহযোগিতা চুক্তির শর্ত অনুসারে বারবাক কারমাল সোভিয়েত ইউনিয়নের কাছে রাজনৈতিক ও সামরিক সাহায্যের অনুরোধ জানায়।

সোভিয়েত রাশিয়ার শাসনামল

বারবাক কারমাল ১৯৭৯ ইংরেজীর ডিসেম্বর মাসে ক্ষমতা দখল করে রাশিয়ার কাছে যে সাহায্য প্রার্থনা করেছেন, তা রাশিয়ার মিডিয়া কর্তৃক স্বীকৃত। পর্যবেক্ষকদের মতে, যেদিন রাশিয়ান সৈন্যরা হাফিজুল্লাহ আমীনকে ক্ষমতাচ্যুত করে, সেদিন বারবাক কারমাল আফগানিস্তানেই ছিলেন না। কারো অনুমতি ছাড়াই প্রায় এক লাখ রুশ সৈন্য আফগানিস্তানে প্রবেশ করে। তাসখন্দ রেডিও থেকে ঘটনার দিন প্রচার করা হয়, "বারবাক কারমাল কর্তৃক হাফিজুল্লাহ আমীন ক্ষমতাচ্যুত হয়েছেন"।

অথচ এই ঘটনার ছয়দিন পর বারবাক কারমাল চেকোস্লোভিয়া থেকে আফগানিস্তানে ফিরেন। রাশিয়া ক্ষমতা গ্রহণ করলেও পুতুল হিসাবে ক্ষমতায় বসায় বারবাক কারমালকে।

আফগান এমন এক জাতি, যারা পরাধীনতার শৃঙ্খলকে কখনো গ্রহণ করেনি। নূর মোহাম্মদ তারাকীর সময় থেকেই বিভিন্ন মুজাহিদ গ্রুপ জিহাদ ঘোষণা করে সোভিয়েত সমর্থিত সরকার ও সোভিয়েত বাহিনীর বিরুদ্ধে। সরকার ও সোভিয়েত বাহিনী মুজাহিদদেরকে দমন করতে প্রতিশোধমূলক তৎপরতা শুরু করে। সরকার যতই দমননীতি গ্রহণ করুক মুজাহিদগণ কিন্তু তাদের কর্মসূচী থেকে পিছপা হলেন না; বরং ক্রমান্বয়ে সাধারণ মানুষ মুজাহিদদের সাথে মিলিত হতে লাগলো। পাকিস্তান ও চীন সর্বপ্রথম এই গেরিলা তৎপরতাকে সমর্থন জানায়। বিশ্বের অন্যান্য দেশ প্রথমে শুধু রাশিয়ার এই তৎপরতার নিন্দা জানায়। অনেকে মনে করে, আফগানিস্তানে জিহাদ

আমেরিকা শুরু করে দিয়েছে। বিশেষ করে পাশ্চাত্যের মিডিয়া বিভিন্ন কায়দায় একথাই বলেছে। বাস্তব কিন্তু তা নয়।

রুশ-মার্কিন সংঘাতের হিংসায় আমেরিকা শেষ পর্যন্ত সাহায্যের হাত নিয়ে এগিয়ে এলেও জিহাদ কিন্তু অনেক পূর্বেই শুরু হয়ে গিয়েছিলো। একটি স্বাধীন যুদ্ধবাজ জাতিকে অন্য একটি জাতি বা গোষ্ঠী পরাধীনতার শৃঙ্খলে বন্দী করতে চাইছে আর তারা তা নীরবে বসে দেখবে-একথা বিশ্বাসযোগ্য নয়। রাশিয়ার বিরুদ্ধে আফগান উলামা ও মুজাহিদগণ শুরুতেই সাধ্যমতো জিহাদ শুরু করে দিয়েছিলেন। আমেরিকা পরে এগিয়ে এসেছে নিজ স্বার্থে। ১৯৮০ সালে মুজাহিদ গ্রুপগুলো ঐক্যবদ্ধ হয়ে জিহাদ ঘোষণা করে। ১৯৮৫ সালে পাকিস্তানে আফগান ইসলামী সংগঠনগুলোর এক বৈঠকে নেতৃবৃন্দ "দ্য এলায়েন্স অব আফগান মুজাহিদীন" গঠন করেন। এর মধ্যে ছিলো ঃ

(১) হিজবে ইসলামী আফগানিস্তান, আমীর-ইঞ্জিনিয়ার গুলবুদ্দিন হেকমতিয়ার।

(২) হরকতে ইনকিলাবে ইসলামী, আমীর-মোহাম্মদ নবী মোহাম্মদী।

(৩) জমিয়তে ইসলামী আফগানিস্তান, আমীর-অধ্যাপক বুরহান উদ্দিন রব্বানী।

(৪) জব্‌হে নাজাতে মিল্লী আফগানিস্তান, আমীর-অধ্যাপক সিবগাতুল্লাহ্ মুজাদ্দেদী।

(৫) কাওমী ইসলামী মাহাজ, আমীর-সৈয়দ আহমদ গিলানী।

(৬) হিজবে ইসলামী (খালিস গ্রুপ), আমীর-মাওলানা মোহাম্মদ ইউনুস খালিস।

এরপর অবস্থা মারাত্মক আকার ধারণ করে। এদিকে এ বছরই সুপ্রীম সোভিয়েতের মসনদে ক্রেমলিনের কর্ণধার হিসাবে মিখাইল গরবাচেভ ক্ষমতায় এসে রাজনৈতিক সমাধানের নামে শুরু করেন নতুন চক্রান্ত। ১৯৮৬ সালে সোভিয়েত বরকন্দাজ বারবাক কারমালকে ক্ষমতার মসনদ থেকে সরিয়ে চিকিৎসার নামে মস্কোতে নিয়ে যায় এবং তার স্থলাভিষিক্ত করে নাস্তিক নজিবুল্লাহ্‌কে। গরবাচেভের কোন চক্রান্তই কাজে আসেনি। নজিবুল্লাহ্ অনেক নির্যাতন করেও আফগানিস্তানের স্বাধীনতা সংগ্রাম স্তব্ধ করতে পারেনি। ১৯৮৭ সালের এক রিপোর্টে প্রকাশ যে, ১৯৮৬ সালে রুশ বাহিনী আফগান মুজাহিদদের উপর মোট ৮,৩২১টি আক্রমণ করে। এতে মোট ২২,১৪৫ জন আফগান শহীদ হন। বোমা হামলায় প্রায় ২,৭২৯টি ভবন, বাড়ি, মসজিদ বিনষ্ট হয়। ১৭৬০ জন মুজাহিদ এবং ৩,৩৮১ জন সাধারণ মানুষ আহত হন। অন্যদিকে রুশ-আফগান সরকারী বাহিনীর ৮,৩২১টি আক্রমণের মুখে ১৬৭টি বিমান ও হেলিকপ্টার, ৪৪৭টি ট্যাংক, ৩৮৫টি সমরাস্ত্র যান এবং ২২২টি সেনা ট্রাক মুজাহিদদের আক্রমণে ধ্বংস হয়। মুজাহিদ বাহিনী বিভিন্ন অভিযান চালিয়ে ১৫,০০০টি ক্লাসিনকভ, ১৪৫টি মেশিনগান এবং ১৮৮টি বিমান বিধ্বংসী কামান উদ্ধার করে। ৩,৫৪১ জন সৈন্য মার্কস্‌বাদী সরকারের পক্ষ ছেড়ে মুজাহিদদের সাথে যোগ দেয়। শেষ পর্যন্ত বিশ্বের এককালের পরাশক্তি রাশিয়া আফগান মুজাহিদদের কাছে পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হয়। ১৯৮৮ সালে জেনেভায় জাতিসংঘের অফিসে সোভিয়েত ইউনিয়ন মুজাহিদদের কাছে

পরাজয়ের সনদে স্বাক্ষর করে। চুক্তির শর্তানুসারে পর্যায়ক্রমে সেভিয়েত সৈন্য আফগানিস্তান ত্যাগ করে। এরপরও নজিবুল্লাহ্ ক্ষমতায় থাকে। ১৯৯১ ইংরেজীর এপ্রিল মাসে নাজাতে মিল্লী পার্টির নেতা অধ্যাপক সিবাগতুল্লাহ্ মুজাদ্দীদির নেতৃত্বে একটি পরিষদ নজিবুল্লাহ্কে ক্ষমতাচ্যুত করে কাবুলের ক্ষমতা গ্রহণ করে।

মুজাহিদদের মধ্যে ক্ষমতার সংঘাত এবং তালেবান

সিবগাতুল্লাহ্ মুজাদ্দেদির নেতৃত্বে গঠিত পরিষদে হিজবে ইসলামীর গুলবুদ্দিন হেকমতিয়ার যোগ দিলেন না। ফলে শুরু হয়ে গেল অন্তর্দ্বন্দ্ব আর সংঘাত। পারস্পরিক সংঘাত বন্ধের জন্য আলোচনার মাধ্যমে একটি চুক্তি হলো। চুক্তি অনুসারে অধ্যাপক সিবগাতুল্লাহ্ মুজাদ্দেদি ক্ষমতা হস্তান্তর করলেন। অনেকেই আশা করেছিলেন, মুজাদ্দেদির পদত্যাগে আফগানিস্তানের সমস্যার সমাধান হবে। কিন্তু তাও হলো না। জমিয়তে ইসলামীর নেতা বুরহান উদ্দিন রব্বানীর নেতৃত্বে নতুন সরকার গঠিত হলো। নতুন সরকারের প্রেসিডেন্ট হলেন স্বয়ং বোরহান উদ্দিন রব্বানী এবং গুলবুদ্দিন হেকমতিয়ার হলেন প্রধানমন্ত্রী। তবুও সমস্যার সমাধান হলো না। শেষ পর্যন্ত সৌদি ও অন্যান্য মুসলিম রাষ্ট্রের প্রচেষ্টায় পবিত্র কা'বার হেরেমে আফগান নেতাদের বৈঠক বসলো। পবিত্র কোরআন সামনে নিয়ে পবিত্র হেরেমে বসে নেতৃবৃন্দ সমস্যার সমাধান মেনে নিলেও তা বেশিদিন স্থায়ী হলো না। এভাবে প্রায় সোয়া চার বছর কাটলো।

যে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে রাশিয়ার হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে আফগান উলামা, বুদ্ধিজীবী, ছাত্র, শিক্ষক, তথা সর্বস্তরের জনতা জিহাদের সূচনা করেছিলেন এবং যা দেখে পরবর্তীকালে গোটা বিশ্ব থেকে মুসলমানরা আফগান ভাইদের সাহায্যার্থে জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন, সেই দেশ বিজয় হলো, কিন্তু আশা পূর্ণ হলো না। শুরু হলো আবার সংঘাত-সংঘর্ষ। পূর্ণ দ্বীনি চেতনায় উজ্জীবিত নিখুঁত একটি জিহাদের মাধ্যমে ময়দানে অর্জিত বিজয়ের সুফল বিপর্যস্ত হলো পাশ্চাত্যের গণতন্ত্র, মুসলিম বিদ্বেষী জাতিসংঘের মুরুব্বিয়ানা, মুসলিম বিশ্বের আয়েশী সরকার, কম্যুনিষ্ট, সামরিক, আমলা, বুদ্ধিজীবী ও সমাজপতিদের মিশ্র নেতৃত্বে। ফলে আফগানিস্তানে সামাজিক সুবিচার, নিরাপত্তা, জাতীয় উন্নতির কিছুই সুসম্পন্ন হওয়ার সুযোগ পেলো না; বরং উল্টো শুরু হলো চৌদ্দ বছরের জিহাদে নেতৃত্বদানকারী মুজাহিদ নেতাদের মধ্যে মসনদ দখল নিয়ে গৃহযুদ্ধ। প্রায় সোয়া চার বছর চললো এই গৃহযুদ্ধ। বিশ্ব মুসলিম আফগানিস্তানের ব্যাপারে হতাশ হলেন। এমনি মুহূর্তে ১৯৯৪ ইংরেজীর নভেম্বর মাসে কান্দাহারের "মেওনদ"-এর নিকটস্থ বস্তি "ছংহেছার-এ" মোল্লা উমর, মোল্লা হাসান, মোল্লা আব্দুল জলিল, মোল্লা আকতার, মোল্লা উসমানী প্রমুখ পনেরোজন বিজ্ঞ আলিমের এক বৈঠক বসে এবং এই বৈঠকে মোল্লা উমরকে আমীর নিযুক্ত করে তালেবান মুভমেন্টের সূচনা করা হয়।

এরপর কান্দাহার থেকে শুরু হয় পরস্পরে সংঘর্ষে লিপ্ত ও ফাসাদী শক্তিগুলোর বিরুদ্ধে জিহাদ। সেদিন মোল্লা উমর তাঁর বক্তব্যে বলেছিলেন, "এই সংঘাতসমূহকে প্রতিরোধের জন্য জিহাদের সূচনা করা প্রয়োজন। জিহাদ শুরু হয়ে গেলে হিংস্র শক্তিগুলো ধ্বংস হয়ে যাবে এবং সত্য মিথ্যার উপরে বিজয়ী হবে। রাশিয়ার মতো পরাশক্তির বিরুদ্ধে যেভাবে প্রথম কিছু আলেম জিহাদ শুরু করেছিলেন, সেভাবে আমাদেরও জিহাদ শুরু করতে হবে। সে সময় যখন অস্ত্র ও শক্তি ছাড়া আল্লাহ্‌রই সাহায্যে বিজয় অর্জিত হয়েছে, আজও সেই আল্লাহ্ রয়েছেন। শুধু দুর্বলতা হচ্ছে আমাদের তাওয়াক্কুলের। আজও যদি কালিমাতুল্লাহ্‌র জন্য, শরীয়তের ন্যায়-নীতি প্রতিষ্ঠার জন্য, ফেৎনা প্রতিরোধের জন্য, মুসলমানদের জান-মাল-ইজ্জত রক্ষার জন্য পরিশুদ্ধ নিয়তে সুন্নতের আনুগত্যের মাধ্যমে জিহাদের সূচনা করি, তবে ইনশাআল্লাহ্ আল্লাহ্‌র সাহায্য আসবে।"

অল্পদিনের মধ্যে সত্যি সত্যিই আফগানিস্তানে তালেবানদের শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হলো। কাবুলের নিকটে সামান্য কিছু এলাকায়–বলতে গেলে একেবারে সীমান্তে কিছু কিছু সংঘাত এখনো অবশিষ্ট আছে। শত্রুপক্ষের সবাই নীরব হয়ে গেলেও ইরানপন্থী গ্রুপ এবং আহমদ শাহ মাসুদের দল এখনো (এই লেখা পর্যন্ত) তালেবান বিরোধিতায় লিপ্ত। তাদের পরিণতি ও যে শুভ হবে না, তা বলাই বাহুল্য।

কান্দাহারে কয়েকদিন

বিভিন্ন কারণে কান্দাহার আফগানিস্তানের একটি ঐতিহাসিক প্রদেশ। ইতোমধ্যে তা আলোচনায় এসেছে। বর্তমানে কান্দাহারের গুরুত্ব হচ্ছে, এই প্রদেশ থেকে তালেবান মুভমেন্টের সূচনা। বর্তমান আফগানিস্তানের আমীরুল মু'মিনীন মোল্লা ওমর কান্দাহারের বাসিন্দা এবং কান্দাহারেই তাঁর প্রধান কার্যালয়। মাওলানা মাযহার সাহেব আমার সম্পর্কে পত্র দিয়েছেন মোল্লা আব্দুল জলিলের নিকট। মোল্লা আব্দুল জলিল একদিকে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর নায়েব এবং অন্যদিকে স্বয়ং আমীরুল মু'মিনীনের নায়েবে আমীরও। তাঁর অবস্থান কান্দাহারে। তাঁর সাথে দেখা করতে আমাকে কয়েকদিন কান্দাহারে থাকতে হলো। পাকিস্তান থেকেই একজন রাহ্‌বার আমার সাথে দেয়া হয়েছে। কান্দাহারে আমাদেরকে একটি সরকারী গেস্ট হাউসে নিয়ে যাওয়া হলো। অনেক চেষ্টা করেও মোল্লা আব্দুল জলিল সাহেবকে পাওয়া যাচ্ছিলো না। অগত্যা কান্দাহারে প্রায় পাঁচদিন থাকতে হলো।

একজন সাবেক সামরিক অফিসারের সাথে কিছু সময়

আফগানিস্তানে যারা কম্যুনিস্ট সেনাবাহিনীতে ছিলেন, তালেবান ক্ষমতা লাভের পর এদের মধ্যে যারা আত্মসমর্পণ করেছেন, তাদেরকে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করা হয়েছে।

এদের অনেকেই বর্তমানে বিভিন্ন দায়িত্বে আছেন। তবে মূল দায়িত্বে নয়। একদিন আমাদের গেস্ট হাউসে এসে উপস্থিত হলেন সাবেক এক সামরিক অফিসার। তার সাথে দীর্ঘ আলাপ হয়। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া তিনি আমার সাথে কথা বলেছেন, তাই বারবার অনুরোধ করছেন, তার নাম না লিখতে। কম্যুনিস্ট সময়ের সেনা অফিসার বলে তাদেরকে ক্ষমা করলেও, তাদের সন্দেহের চোখে দেখা হয়। আলোচনার স্বার্থে তাকে আমরা সলিমুল্লাহ্ বলে সম্বোধন করবো। মেজর (অবঃ) সলিমুল্লাহ্র কাছে জানতে চাইলাম, তিনি কিভাবে তালেবানদের কাছে আত্মসমর্পণ করলেন?

উত্তরে তিনি বললেন, যেদিন তালেবানরা কান্দাহার সেনানিবাস দখল করে, সেদিনের ঘটনা ঃ আমি আমার গ্রুপকে তালেবানদের উপর আঘাত করতে নির্দেশ দিলাম। আমি নিজেও অস্ত্র নিয়ে অগ্রসর হই। গুলি চালাতে মাত্র প্রস্তুত হয়েছি, তখন গালে প্রচণ্ড একটি থাপ্পড় লাগলো। এভাবে তিনটি থাপ্পড় আমার গালে পড়ল। তারপর কে যেন বললো, সলিমুল্লাহ্! তুমি কি করছো? চারদিকে তাকালাম, কিন্তু কাউকেই দেখতে পেলাম না। আমি ভীষণভাবে ভয় পেয়ে গেলাম। শেষ পর্যন্ত অস্ত্র ছেড়ে আত্মসমর্পণ করলাম।

জানতে চাইলাম, আপনি তো সমাজতান্ত্রিক শাসন, রব্বানী-হেকমতিয়ারের শাসন দেখেছেন এবং বর্তমানে তালেবানদের শাসন দেখছেন। এই তিনটির মধ্যে আপনার দৃষ্টিতে কোন্টি ভাল?

উত্তরে তিনি বললেন, আমরা যারা সেনা অফিসার, অতীতে তাদের অনেক সুযোগ-সুবিধা ছিলো। প্রকৃতপক্ষে শাসকরা যখন সাধারণ মানুষের উপর আস্থা হারায়, তখনই সেনাবাহিনীর উপর নির্ভরশীল হয়। তালেবান সরকার সরকারী অফিসারদের বিলাসী সুযোগ-সুবিধা বন্ধ করে সাধারণ মানুষের জন্য সার্ভিস উন্নত করেছে।

সরকার মানুষের জান-মাল, ইজ্জত, শিক্ষা ও চিকিৎসার দায়িত্ব হাতে নিয়েছে। সরকারী নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে জিনিসপত্রের মূল্য বৃদ্ধি-হ্রাস করা হয়েছে। চুরি, ডাকাতি, ঘুষ, সুদ ইত্যাদি বন্ধ হয়ে গেছে। যদি কেউ অন্যায় করে, তবে তার প্রকাশ্য শাস্তির বিধান রয়েছে। এ কারণে দেশ থেকে অন্যায় ও অপরাধ দূর হয়ে গেছে। আমার বিশ্বাস, যদি দশ বছর দেশটি এমন করে চলে, তবে আফগানিস্তান এশিয়ার মধ্যে একটি উন্নত দেশ হয়ে যাবে। সবচাইতে বড় কথা হলো, তালেবান সরকারের কোন ঋণ নেই।

আরগান্ডাবে একদিন

আজ শুক্রবার। ইসলামী ইমারত আফগানিস্তানে সাপ্তাহিক সরকারী ছুটির দিন। বৃহস্পতিবারে অর্ধদিবস অফিস-আদালত চলে। মোল্লা আব্দুল জলিল সাহেবকে না

পাওয়ায় আমাকে শনিবার পর্যন্ত কান্দাহার থাকতে হবে। তাই শুক্রবারে চলে গেলাম কান্দাহার থেকে প্রায় বিশ-পঁচিশ মাইল দূরে আরগান্ডাব এলাকায়। অত্যন্ত সুন্দর পর্যটন এলাকা। দেখতে সিলেটের জাফলংয়ের মতো। এই এলাকার আকর্ষণ হচ্ছে 'আরগান্ডাব ড্যাম' অর্থাৎ বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র। এটা জহির শাহের শাসনামলে ১৯৫২ সালে প্রতিষ্ঠিত। এই বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র থেকে সমস্ত কান্দাহারে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়। আফগানিস্তানে বিভিন্ন গ্রামেও দেখেছি কৃত্রিম উপায়ে পানিতে স্রোত তৈরী করে কাঠের চরখী দিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হচ্ছে। গ্রামগুলো নিজেদের উৎপাদিত বিদ্যুৎ দিয়ে চলে। মনে মনে ভাবলাম, বাংলাদেশেও যদি এরূপ ব্যবস্থা হতো। নদীর তো অভাব নেই। আমরা অর্ধদিবস সেই এলাকায় অতিবাহিত করলাম। পাহাড়ের তলদেশে নদীর তীরে বন এলাকায় স্থানীয় লোকদের সাথে বনভোজনে অংশ নিলাম। জনগণের উল্লাস দেখে বোঝা-ই যায় না, এ জাতি চৌদ্দ বছরের একটি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ থেকে এইমাত্র অব্যাহতি পেয়েছে, উপরন্তু এখনো তাদের সীমান্ত এলাকায় যুদ্ধ চলছে। নদীতে প্রচুর মাছ। কেউ কেউ মাইন ফাটিয়ে মাছ শিকার করছে।

আহমদ শাহ আবদালীর মাজার

কান্দাহার শহরে গভর্নর হাউসের নিকটেই মুজাহিদে মিল্লাত শায়েখ আহমদ শাহ আবদালী (রহঃ)-এর মাজার। ইতোপূর্বে আমরা তাঁর সম্পর্কে আলোচনা করেছি। ছোটবেলা থেকেই আমি এই নামের সাথে পরিচিত। বিরাট এলাকা নিয়ে তাঁর এই মাজার। মাজারের পাশে শহরের প্রধান জামে মসজিদ। এই মসজিদে আমীরুল মু'মিনীন মোল্লা ওমর প্রায়ই জুমার নামায আদায় করেন। আমি এই মসজিদে আসরের নামায আদায় করলাম। নামায শেষে আহমদ শাহ আবদালীর মাজার যিয়ারতে গেলাম। আফগানিস্তানে যদিও ছবি তোলা নিষিদ্ধ, কিন্তু সাংবাদিকদের জন্য প্রাণীজাতি ছাড়া বাকী সবকিছুর ছবি তোলার অনুমতি রয়েছে। এই সুযোগে আমি সেখানে প্রচুর ছবি তুলেছি। আহমদ শাহ আবদালীর মাজারের সামনে দাঁড়িয়ে ঐতিহাসিক পানিপথের যুদ্ধের কথা বার বার আমার মনে পড়ছিলো। শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (রহঃ)-এর আহ্বানে হিন্দুস্তানের মুসলমানদের সাহায্যার্থে ১৭৬১ খৃষ্টাব্দে আহমদ শাহ আবদালী মাত্র সাত হাজার সৈন্য নিয়ে সাত লাখ মিরাঠী সৈন্যের বিরুদ্ধে পানিপথের ময়দানে মুখোমুখি হয়েছিলেন। প্রতাপশালী ইংরেজদের সহযোগিতার পরও সেদিন আফগানীদের কাছে মিরাঠীরা শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়েছিলো। এই পরাজয়ের স্মৃতিচারণে ইংরেজরা পরবর্তীতে প্রায়ই আফগানিস্তানের পথে অগ্রসর হওয়ার সময় আতংকিত হতো।
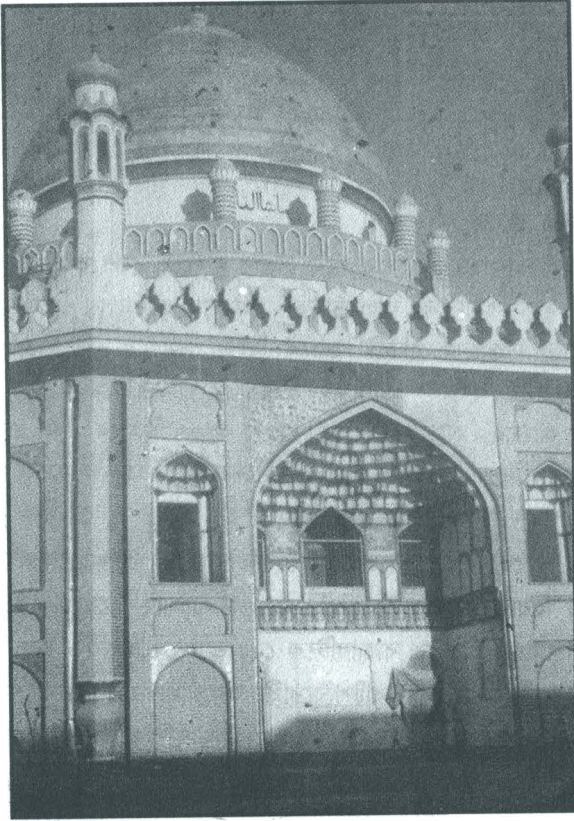
আহমদ শাহ আবদালীর মাজার

মোল্লা আব্দুল জলিলের সাথে দেখা হলো না

কর্মব্যস্ততার কারণে মোল্লা আব্দুল জলিলের আর দেখা পেলাম না। যে অফিসে তিনি সাধারণ মানুষের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করেন, সেখানে তিনি কয়েকদিন যাবত আসতে পারছেন না। আমেরিকা উসামা বিন লাদেনের খোঁজে এখন ঘোষণা করেছে, কান্দাহারে আক্রমণ করবে। তাই সবাই এ নিয়ে ব্যস্ত। দিন-রাত শলা-পরামর্শ চলছে, হামলা মোকাবেলার কৌশল নির্ধারিত হচ্ছে। তাঁর সাথে মুখাবেরা (অর্থাৎ টেলিফোনে আলাপ) হলো। তিনি দুঃখ প্রকাশ করে বললেন, পররাষ্ট্র সচিবের সাথে দেখা করতে। রাহবার আমাকে পররাষ্ট্র সচিবের অফিসে নিয়ে গেলেন। তার সাথে দেখা করে বিস্তারিত জানালাম। তিনি মোল্লা আব্দুল জলিলের সাথে মুখাবেরা করলেন। পশ্‌তু ভাষায় আলাপ-তাই কিছুই বুঝলাম না। টেলিফোন রেখে সচিব আমাকে একটি চিঠি লিখে দিলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোল্লা হাসানের বরাবরে এবং বললেন, তিনি পররাষ্ট্রমন্ত্রীর

সচিবের সাথে টেলিফোনে আলাপ করবেন। আমি বললাম, শুনেছি মোল্লা আব্দুল জলিল একজন বড় আলেম। তার সাথে দেখা করার ইচ্ছে ছিলো। তিনি জানালেন, পূর্ণ মন্ত্রী ছাড়া নায়েব বা প্রতিমন্ত্রীর কাছে আপনি কোন তথ্য পাবেন না। তাই কাবুলে পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে এই চিঠি দিলে ব্যবস্থা হয়ে যাবে। তাছাড়া মোল্লা সাহেব খুব ব্যস্ত আছেন।

শহীদদের কবর

চমন থেকে কান্দাহারে আসার পথে রাস্তার দু'পাশে বেশ ক'টি কবর রয়েছে, যা বৃটিশ-বিরোধী যুদ্ধে শহীদদের বলে ড্রাইভার আমাকে জানালেন। তাছাড়া চমন থেকে শুরু করে আফগানিস্তানের প্রতিটি অঞ্চলে বিভিন্ন সময়ের শত শত শহীদের কবর রয়েছে। আফগানীরা হযরত সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ)-এর সময় থেকেই শাহাদাতের নজরানা দিয়ে আসছে। আমার মনে হয়, গোটা আফগানিস্তানে এমন একটি পরিবারও পাওয়া যাবে না, যাদের অন্তত দু'চারজন শহীদের স্মৃতি বহন করতে হচ্ছে না। প্রবাদ আছে, 'অতি শোকে পাথর।' আজ গোটা আফগান জাতির অবস্থা ঠিক তা-ই।

কান্দাহার শহরের মূল বাজারের নাম হিরাত বাজার। কান্দাহারে আবদালী পরিবার এসেছে মূলত হিরাত থেকে, ইতোমধ্যে তা আলোচনায় এসেছে। হয়ত সেই স্মৃতি অনুসারেই কান্দাহারের হিরাত বাজারটিকে হেরাত নামে অবহিত করা হচ্ছে। হেরাত বাজারের চৌমুহনীতে রয়েছে বৃটিশবিরোধী আন্দোলনের ছয়জন শহীদের কবর। তাছাড়া কান্দাহারে তালেবান শহীদগাহে প্রচুর শহীদ ঘুমিয়ে আছেন। মোটকথা, গোটা আফগানিস্তান সফর করে কেউ যদি বলেন, এটা তো আফগানিস্তান নয়; বরং শোহাদাস্তান, তবে ভুল হবে না।

কাবুলের পথে

সাতই মার্চ সকাল আটটায় কাবুলের পথে যাত্রা শুরু করি। ড্রাইভারসহ আমরা মোট চারজন। ফার্সী আর পশ্‌তু ছাড়া ড্রাইভার অন্য ভাষা জানে না। মাদ্রাসা জীবনের শুরুতে শেখ সা'দীর গুলিস্তাঁ কয়দিন পড়ার সৌভাগ্য হয়েছিলো। তখন কিছু ফার্সী শিখেছিলাম। বর্তমানে তেমন স্মরণ নেই। উর্দুর সাথে মিশিয়ে চালিয়ে দিলাম। ড্রাইভার জাতে ফার্সিয়ান। শিয়া হলেও হতে পারে। গান-বাজনার প্রতি আকর্ষণ আছে। ধূমপানের নেশাও রয়েছে। কেলায়াত বাজারে এক হোটেলে খাওয়া-দাওয়া এবং জোহরের নামায পড়ে যখন আমরা যাত্রা শুরু করি, তখন সে (ড্রাইভার) বাজনা লাগিয়ে দিল। আসলে সে আমি আর মাওলানা এহসান উদ্দিনের মতো আমাদের রাহবার সাদুল্লাহকেও বিদেশী মনে করেছে। কিন্তু রাহবার যখন তাকে ধমক দিয়ে বললেন বাজনা বন্ধ করতে, তখন ভয়ে তার মুখের হাসি মিলিয়ে যায়!

কাবুল শহরের আবাসিক এলাকা

কাবুল- খোস্‌ত রাজপথ

আফগানিস্তানের রাস্তা

দীর্ঘ চৌদ্দ বছর যুদ্ধের পর আফগানিস্তানের রাস্তা যত খারাপ থাকার কথা ছিলো, বাস্তবে সে রকম নয়। প্রকৃতপক্ষে যুদ্ধে বেশী আক্রান্ত হয়ে থাকে রাস্তা এবং ব্রীজ। কিন্তু আফগানিস্তানের বিভিন্ন রাস্তা দিয়ে চললে দেখা যায় ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা এবং বৃদ্ধরা স্বেচ্ছায় রাস্তা মেরামত করে যাচ্ছে। তাদেরকে কেউ বেতন দিয়ে এটা করাচ্ছে না। স্বেচ্ছায় তারা তাদের দেশ গড়ে যাচ্ছে। যাত্রীরা সাধ্যানুসারে উপহার দিয়ে যায়। উপহার পাওয়ার কারণে অসহায় মানুষেরা স্বেচ্ছায় রাস্তা মেরামতের কাজ করতে উৎসাহিত হচ্ছে।

ভিক্ষা নয় শ্রমই ইসলামের আদর্শ

দীর্ঘ যুদ্ধের পর একটি জাতির অর্থনৈতিক অবস্থা কতটুকু খারাপ হতে পারে, তা আশা করি কাউকে ব্যাখ্যা করে বোঝাতে হবে না। এক-দুই মাস নয়, দীর্ঘ চৌদ্দটি বছর ধারাবাহিক যুদ্ধের পর আফগানিস্তানে ভিক্ষুকের মিছিল আশংকা করেছিলাম। কিন্তু সে পরিমাণে ভিক্ষুক আফগানিস্তানে দেখা যায়নি। বাংলাদেশের এক একটি মাজারে যে পরিমাণ ভিক্ষুক দেখা যায়, সেই হিসেবে আফগানিস্তানে ভিক্ষুক নেই বলতে হবে। বাস্তবে আফগানীরা খুব পরিশ্রমী। আমার ধারণা মতে, স্বেচ্ছায় রাস্তা মেরামতের কর্মতৎপরতা অসহায় মানুষগুলোকে ভিক্ষাবৃত্তি থেকে রক্ষা করছে। ইসলাম মানুষকে ভিক্ষা নয়, কর্মের শিক্ষা দিয়েছে।

চাষাবাদ

আফগানিস্তানের বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন রকমের ফল-ফসল চাষ করা হয়। শাক-সবজির জন্য প্রাচীনকাল থেকেই কান্দাহার প্রসিদ্ধ, ইতোপূর্বে তা আলোচনা করেছি। আফগানিস্তানের প্রথম বাজার কান্দাহারের পত্তন হয়েছিল কৃষকদের হাতে। খোস্ত এলাকায় প্রচুর গম হয়। তাছাড়া প্রত্যেক এলাকায়ই কমলা, আপেল, আঙ্গুর, আলুচা, পেস্তা, গম, বিভিন্ন জাতের বাদাম, আলু, শাক-সবজি, আবার কোন কোন এলাকায় খেজুর, ধান, তীন (অর্থাৎ– ডুমুর) প্রচুর উৎপাদিত হয়। বাজারে এসব প্রচুর পাওয়া যায়, মূল্যও বেশী তেমন নয়।

কাবুল আজ এক বিধ্বস্ত জনপদের নাম

দরিয়া-এ-কাবুলের দুই তীরে ঐতিহাসিক কাবুল শহর। মাওলানা আবুল হাসান আলী নদভীর "দরিয়ায়েকাবুল ছে দরিয়ায়েইয়ারমুক তক" বইখানা পড়ে কৌতূহল জেগেছিলো কাবুল দরিয়া সম্পর্কে। আমাদের কাছে দরিয়া অর্থ সমুদ্র। ব্যক্তিগতভাবে সমুদ্রের প্রতি আমার অনেক দুর্বলতা সেই বাল্যকাল থেকে। সমুদ্র থেকে শেখার অনেক কিছু আছে। বিশেষ করে হৃদয় প্রশান্ত হয়। যা-ই হোক, দীর্ঘ ২৪ ঘন্টার পথ অতিক্রম
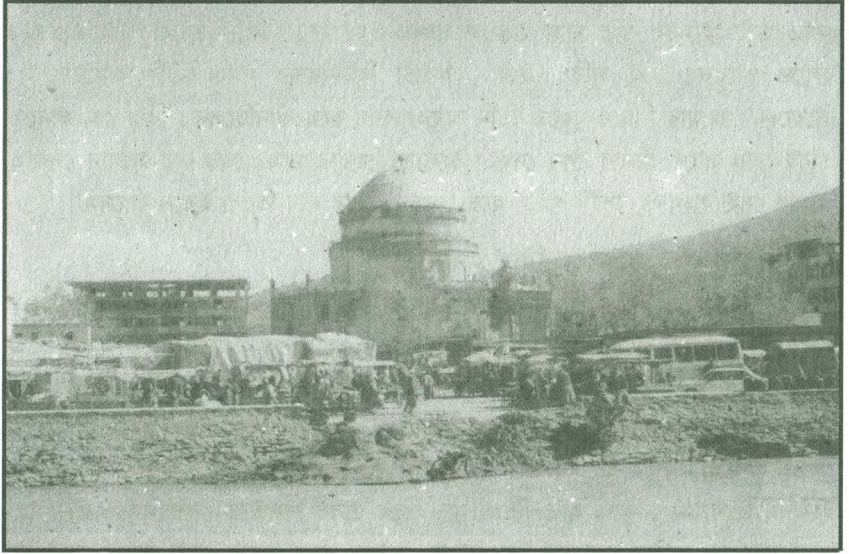
দরিয়া-এ কাবুল তীরে কাবুল বাজার

করে সকাল ন'টায় কাবুল এসে পৌঁছি। আহমদ শাহ আবদালীর ছেলে তৈমুর কান্দাহার থেকে রাজধানী কাবুলে স্থানান্তর করেছিলেন। এর পরেও আফগানিস্তানে অনেক যুদ্ধ-বিগ্রহ হয়েছে। কিন্তু কাবুল ছিলো সর্বদাই অক্ষত। আজ বিধ্বস্ত কাবুল নগরী দেখে সত্যিই দুঃখ হলো। কারণ এসব হচ্ছে হেকমতিয়ার, রব্বানী, মাসুদের সোয়া চার বছরের অন্তর্দ্বন্দ্বের পরিণতি।

গেস্ট হাউসে এক লৌহমানবের সাথে পরিচয়

আমাদের থাকার ব্যবস্থা করা হয় গেস্ট হাউসে। একটা টেক্সি নিয়ে আমরা গেস্ট হাউসে পৌঁছলাম। ক্লান্তি ধুয়ে ফেলার জন্য বাথরুমে গেলাম। বাহ্! কি মডার্ন ডিজাইনের বাথ, সাওয়ার, টয়লেট, সিং ইত্যাদি। গরম ও ঠাণ্ডা পানির পৃথক ব্যবস্থা। দেখেই বোঝা যাচ্ছে, এটা কোন সাবেক মন্ত্রী কিংবা রাষ্ট্রের গুরত্বপূর্ণ কোন কর্তার বাড়ি হবে। গোসল করে এসে যখন চা-নাস্তা করতে যাব, তখনই প্রবেশ করেন কালো পাগড়ীওয়ালা এক ভদ্রলোক। তার গায়ে ঘিয়া রংয়ের সালওয়ার-কোর্তা, বুক পর্যন্ত দাঁড়ি। সালাম করে মুসাফাহা করতে করতে বললেন, 'ছাংগে, জুরে, তাগরে, তবিয়ত খেদে, পা খেয়ের দে, ইত্যাদি (এই শব্দগুলোর অর্থ ইতোপূর্বে বলা হয়েছে)। দীর্ঘ সময় মুসাফাহার পর ভাবলাম আর বুক মিলাতে হবে না। কিন্তু ভাবনা সত্য হলো না। বুক মিলাতে হলো। ওরে বাবা-রে বাবা! এ তো মানুষ নয়, বরং রোবট। উর্দু-আরবী মিশ্রিত ভাষায় কথা বলছেন।

বোঝার উপায় নেই তিনি যে আসলে বাঙ্গালী! দীর্ঘদিন থেকে তিনি কাবুলের অধিবাসী। জাতি ভাই হিসেবে তার সঙ্গে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক হয়ে যায়। তিনি ভালো বাংলায়ও কথা বলতে পারেন। তাই সুবিধা হলো। করাচী বিমানবন্দর পর্যন্ত তিনি আমাকে সঙ্গ দিয়েছেন। আমার বিদায় মুহূর্তে তিনি আবেগপ্রবণ হয়ে কাঁদছিলেন। কিন্তু কে জানতো এটাই তার সাথে আমার শেষ দেখা। ইংল্যান্ড ফেরার মাসখানেক পর সংবাদ পেলাম, আমার সেই বাংগালী বন্ধুটি শহীদ হয়ে গেছেন। তার নাম ছিলো ইবনে কাসেম।

সাহাবীদের মাজারে কিছু সময়

হযরত লাইছ ইবনে কয়েস হলেন মহানবী (সঃ)-এর চাচা হযরত আব্বাস (রাঃ)-এর নাতি। কাবুল শহরের ভেতরই তাঁর মাজার। জোহরের নামাজের পর একটি গাড়ি নিয়ে তাঁর মাজারে গেলাম। মাজারটি অত্যন্ত সুরক্ষিত । লাল গেলাফ দিয়ে ঢাকা, তার উপর রয়েছে গ্লাসের তৈরী ঘরের মতো দেয়াল। একজনকে প্রশ্ন করলে বললেন, আগের মতো আফগানিস্তানে মাজারসমূহ জমজমাট নয়। গোটা দেশ নিয়ন্ত্রণে না আসায় ইসলামী প্রশাসন এদিকে হাত দিচ্ছে না। তবে এসব বিদআত বেশীদিন থাকবে না। মাজারকেন্দ্রিক ফকির এখানেও কিছু আছে। কাবুল শহর থেকে একটু দূরে বিশাল এক পাহাড়ী গোরস্তান রয়েছে। সেখানে বেশ কয়েকজন সাহাবীর মাজার। আসরের নামায পড়ে ইবনে কাসেমসহ সেই গোরস্তানে গেলাম।

গাড়ি রেখে পায়ে হেঁটে প্রথমে যাই হযরত আবু তামীম আনসারী (রাঃ)-এর মাজারে। ঐতিহাসিকদের মতে, ৪৪ হিজরী সনে তাঁরা ইসলামের দাওয়াত নিয়ে কাবুলে আসেন। মর্মর পাথরের বাঁধাই করা মাজার দু'টির মধ্যে ব্যবধান মাত্র একহাত হবে। আয়তন দেখে বোঝা যাচ্ছে, দু'জনই লম্বা প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। এই দুই আনসারী সাহাবীর কবর থেকে কিছু দূরে এক পাহাড়ের উপর আরো সত্তরজনের মতো সাহাবীর কবর রয়েছে। যাঁদেরকে তৎকালীন বাদশা শহীদ করে এক গর্তে মাটি চাপা দিয়েছিলো। এই শহীদদের মধ্য থেকে বিশিষ্ট সাহাবীদের নাম কবরের গায়ে পাথরের মধ্যে লেখা রয়েছে। আমি এই লেখা থেকে যাঁদের নাম আবিষ্কার করতে পেরেছি-তাঁরা হলেন ঃ হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আনফ বিন কায়েস ইবনে আব্বাস (রাঃ), হযরত কাসেম বিন আব্দুল্লাহ্ বিন আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ), হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আকিল (রাঃ), হযরত আব্দুর রহমান বিন আমর আস (রাঃ), হযরত জাফর বিন সাঈদ (রাঃ), হযরত সা'য়াদ বিন আমর (রাঃ), হযরত ইবনে মালেক (রাঃ), হযরত মালেক আনসারী (রাঃ), হযরত ওয়ালিদ (রাঃ), হযরত উকবা (রাঃ), হযরত খালেদ বিন উবায়দা (রাঃ), হযরত জানিক (রাঃ), হযরত কয়েস বিন বরাহ (রাঃ), হযরত ইবনে মুয়াবিয়াহ (রাঃ), হযরত আব্দুর রহমান বিন আকিল (রাঃ), হযরত আবু বকর বিন মায়াজ আনসারী (রাঃ), হযরত ইবনে মায়াজ (রাঃ), হযরত আমর আনসারী (রাঃ), হযরত কয়েস আনসারী (রাঃ) প্রমুখ।
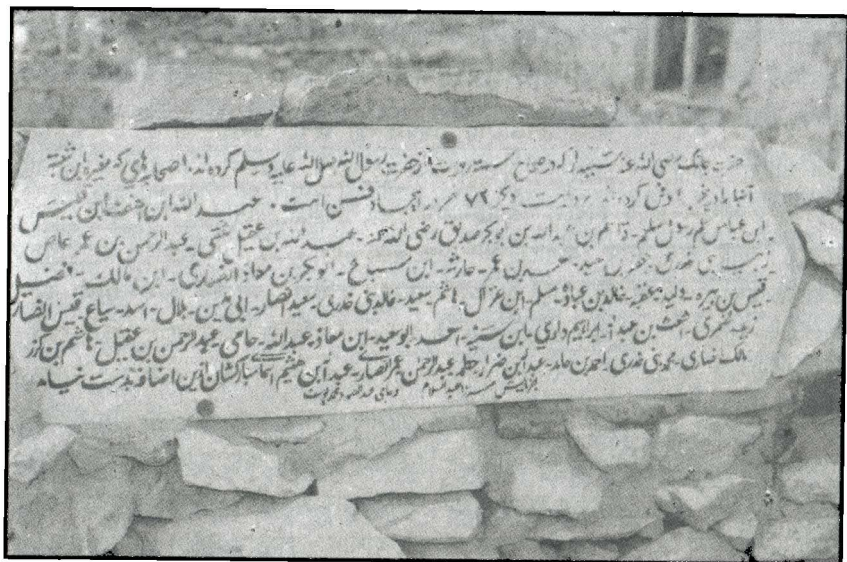
কাবুলে ৭০ জন সাহাবীর কবর

নহরে খিজির এবং সোলেমানী দুর্গ

হযরত আবু তামীম ও জাবের (রাঃ)-এর মাজারের পাশে পাহাড়ের চূড়ায় একটা সুড়ঙ্গপথ রয়েছে। জমকালো অন্ধকার এই পথ দিয়ে একটু ভেতরে গেলাম। সেখানে দেখতে পেলাম এক বিশাল পানির কূপ। খুব পরিষ্কার এবং সুস্বাদু পানি। আমরা টর্চলাইট নিয়ে ভেতরে চলে যাই। সেখানে কাঠ দিয়ে ঘাট বাধা রয়েছে। চার-পাঁচ ফুট পাহাড়ের উপর মাটির গর্ভে এই পানির নহর সত্যিই আশ্চর্যজনক। আফগানীদের মতে, এই কূপে হযরত খাজা খিজির (আঃ) ওযু করেছেন। কূপের পাশেই একটি বিধ্বস্ত দুর্গ। দেখেই মনে হয়েছে অতি প্রাচীন। লোকমুখে শোনা যায়, এটা হযরত সোলেমান (আঃ)-এর সময়ের তৈরী এবং এখানে না-কি তিনি এসেও ছিলেন । অবশ্য কোন ইতিহাস গ্রন্থে এমনটি পাইনি।

আফগান পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সাক্ষাৎকার

ইসলামী ইমারাত আফগানিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব মোল্লা হাসান। মধ্যবয়সী এক আলেম-এ-দ্বীন। তালেবান মুভমেন্টের সূচকদের একজন। কান্দাহারে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর অফিস থেকে কাবুলে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সদর দফতরে আমার সম্পর্কে চিঠি দেওয়া হয়েছে। তাই তাঁর সাথে যোগাযোগটা দ্রুত হয়ে গেল। ১১ মার্চ সকালে রাহবারসহ উপস্থিত হলাম পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোল্লা হাসান সাহেবের অফিসে। সাবেক অফিসগুলো নতুন পদ্ধতিতে পরিচালিত হচ্ছে। আধুনিক সমর-সরঞ্জামে সজ্জিত কোন গার্ড বাহিনী নেই। অবস্থা দেখেই বোঝা যায়, সাধারণ লোকও তাদের সমস্যা সংশ্লিষ্ট অফিসের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার সাথে দেখা করে সমাধান করতে পারেন। আমি যখন পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সচিবের সাথে দেখা করলাম, তিনি তখন আমাকে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে অনুরোধ করলেন। প্রায় বিশ মিনিট পর ভিক্ষুকের মতো একটি ছেলে বেরিয়ে গেল। আমাকে ভেতরে নেয়া হলো। তাসবীহ্ হাতে বসে আছেন মোল্লা হাসান। সালাম দিয়ে মোসাফাহা ও মোয়ানাকা করলাম। সামনা-সামনি বসে হাল-অবস্থা জিজ্ঞাসার পর তাঁকে কয়েকটি প্রশ্ন করালাম ঃ

ঃ আজকের বিশ্বের অবস্থা আমাদের সামনে স্পষ্ট। মুসলমানরা গোটা বিশ্বে মজলুমের মতো জীবন অতিবাহিত করছে। আপনার দৃষ্টিতে এর কারণ কি?

মোল্লা সাহেব হামদ ও নাত পাঠ করে বললেন ঃ আমার মতে, এর প্রধান কারণ মুসলমানরা আজ কাফের-ফাসেকদের আনুগত্য করছে। তাদের কর্তৃত্ব ও নেতৃত্বে কাজ করছে। কাফেরদের প্রদর্শিত পথকে নিজেদের পথ হিসাবে গ্রহণ করে নিয়েছে।

দ্বিতীয় কারণ হলো, মুসলমানরা আল্লাহ্ তা'আলার বিধান ও মহানবী (সাঃ)-এর সুন্নত ছেড়ে দিয়েছে। তাই আজ অমুসলিম রাষ্ট্রসমূহে এবং মুসলিম রাষ্ট্রসমূহেও অমুসলিমরা মুসলমানদের উপর নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব চালাচ্ছে। যদি মুসলমানরা সত্যিকার অর্থে আবার আল্লাহ্র নির্দেশ মেনে আল্লাহ্র বিধান গ্রহণ করে নেয় এবং কাফেরদের আইন-আনুগত্য ত্যাগ করে, তবে একশত ভাগ বিশ্বাস নিয়ে বলতে পারি, মুসলমানরা যেভাবে প্রথমে দুনিয়াতে ইসলামের বিজয় এনেছিল এবং বিশ্বব্যাপী ইসলামকে পৌঁছে দিয়েছিল, সেভাবে আবার তারা বিশ্বকে শাসন করবে, বিজয়ী হিসাবে দাঁড়াতে পারবে।

ঃ অনেক আলেমে দ্বীন-এর মতে, একবিংশ শতাব্দীতে ইসলাম, অর্থাৎ-মুসলমানরা বিশ্বকে নেতৃত্ব দেবে। এ ব্যাপারে আপনার মতামত কি?

মোল্লা হাসান ঃ এটা তো বাস্তব সত্য কথা যে, মুসলমানরা যদি এক আমীরের আনুগত্য স্বীকার করে এক প্লাটফর্মে এসে দাঁড়াতে পারে, অথবা কোন রাষ্ট্রে ইসলামী

শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় এবং মুসলমানরা তা গ্রহণ করে সেই অনুযায়ী কাজ করে, তবে ইনশাআল্লাহ্ কাফের-মুনাফেকদের শাসন ও নেতৃত্বের অবসান হয়ে মুসলমানদের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে। বর্তমানে তো আল-হামদু লিল্লাহ্ মুসলমানদের জন্য, উলামায়ে কেরামদের জন্য কাজ সহজ হয়ে গেছে, সুযোগ এসেছে। ময়দান তৈরী হয়ে গেছে। যদি ইচ্ছে করে আল্লাহ্ তা'আলার দ্বীনের খেদমত করার এবং আল্লাহ্ তা'আলার পবিত্র কিতাব কুরআন মজীদের শাসন প্রতিষ্ঠিত করার, তবে ইনশাআল্লাহ্ আমাদের আমীর আছেন। তিনি বাস্তবে এই দায়িত্ব আদায় করতে পারবেন। মোটকথা, উলামা ও তালাবার যে শাসন আফগানিস্তানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, এর সাথে মুসলিম উম্মাহর সহযোগিতা করা প্রয়োজন, এদের সাহায্য করা প্রয়োজন। তাহলে দেখা যাবে, আল্লাহ্ পাকের বিধান অন্যান্য দেশেও আস্তে আস্তে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাচ্ছে। আমি একথা বলছি না যে, আমরা অন্য দেশের ভেতরেও কাজ করবো। তবে আমি অবশ্যই বলছি যে, এই ভূমি আল্লাহ্ তা'আলার। তাই গোটা বিশ্ব ও মানবজাতির জন্য জীবন বিধান হবে যা মহান আল্লাহ্ আকাশ থেকে প্রেরণ করেছেন। প্রত্যেক মানুষ ও মুসলমানের উপর ফরয হলো, আল্লাহ্র জমিনে আল্লাহ্র খেলাফত প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা এবং মানুষের তৈরী মতবাদগুলোকে প্রতিহত করা।

ঃ আজকের বিশ্ব প্রেক্ষাপটে শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে তালেবান শাসকদের অভিমত কি?

মোল্লা হাসান ঃ ইসলামের নিজস্ব কিছু নীতিমালা রয়েছে। ইসলামী রাষ্ট্রে আমীর বা খলিফা নির্বাচনের বিষয়টিও অন্য সব রাষ্ট্রব্যবস্থা থেকে ভিন্ন। ইসলামী শরিয়তের মুফতীদের (ইসলামী আইনজ্ঞ) মতে, ইসলামী রাষ্ট্রের আমীর বা খলীফার কোন নির্দিষ্ট মেয়াদ থাকে না। যতক্ষণ পর্যন্ত আমীর কিংবা খলীফার মধ্যে শরীয়তের পরিপন্থী কর্মতৎপরতা এবং ইসলামের জন্য ক্ষতিকর কিছু পাওয়া যাবে না, ততক্ষণ পর্যন্ত তাঁর বিরুদ্ধে কথা বলার অনুমতি নেই। যখন তাঁর মধ্যে ইসলামের জন্য ক্ষতিকর তৎপরতা লক্ষ্য করা যাবে, তখন সবার অধিকার রয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে কথা বলার। গণতন্ত্রের নীতি ভিন্ন। সরকার প্রধান হিসেবে ভালো-মন্দ যে-ই নির্বাচিত হোক নির্দিষ্ট মেয়াদ উত্তীর্ণ না হওয়া পর্যন্ত তাকে ক্ষমতা থেকে অপসারণ করা যাবে না। তাদের নির্দিষ্ট মেয়াদ থাকে। উপরন্তু গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় গণভোটের মাধ্যমে খারাপ লোকেরও জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত হওয়ার সুযোগ রয়েছে। ভোটের মাধ্যমে খারাপ লোকও ক্ষমতায় যেতে পারে। ইসলামী নির্বাচন পদ্ধতিতে এ ধরনের কোন সুযোগ নেই।

ঃ ইসলামী রাষ্ট্র আফগানিস্তানের পররাষ্ট্রনীতি কি? বহির্বিশ্ব এবং জাতিসংঘের সাথে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার কোন উদ্যোগ নেয়া হয়েছে কি?

মোল্লা হাসান ঃ ইসলামী রাষ্ট্র আফগানিস্তানের পরিচালকগণ এ জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করে যাচ্ছেন যে, পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রসমূহের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপিত হোক এবং

জাতিসংঘে অন্যান্য দেশের যে অধিকার রয়েছে অথবা জাতিসংঘ অন্যান্য দেশকে যে অধিকার দিয়েছে, তা ইসলামী ইমারাত আফগানিস্তানকেও দেয়া হোক। আফগানিস্তান জাতিসংঘে যোগ দিয়েছে। আমরা চেষ্টা করে যাচ্ছি- জাতিসংঘ এবং অন্যান্য দেশ আফগানিস্তান ও আফগানিস্তানের জনগণের উপর যে জুলুম করছে, তা বন্ধ হয়ে যাক। আমাদের যা অধিকার, তা যেন পেয়ে যাই। আমরা আগ বাড়িয়ে নিজে কারো সাথে সংঘাত করছি না। কেউ কেউ আমাদের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করছে। আমরা চাই না কোন দেশের সাথে আমাদের সংঘাত হোক। আমরা প্রতিবেশীদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক চাই। কিন্তু যেহেতু আফগানিস্তানে ইসলামী শাসন চলছে, তাই শত্রুরা এর বিরুদ্ধে চক্রান্ত করে যাচ্ছে। তারা ইসলামী শাসন এবং ইসলামী আফগানিস্তানকে ধ্বংসের জন্য চারদিক থেকে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন নামে আক্রমণ করছে। তাছাড়া দুনিয়াতে এমন কোন দেশ কিংবা নেযাম নেই, যেখানে সবাই ঐক্যবদ্ধ। হোক তা জাতিসংঘ কিংবা আমেরিকার মতো কুফরী কোন রাষ্ট্র, যেখানে সরকার গঠিত হয় অধিকাংশের রায় অনুসারে। অথবা এই পদ্ধতিতে পরিচালিত যে কোন রাষ্ট্র। কিন্তু আফগানিস্তানে নিরানব্বই ভাগ লোক ইসলামী শরিয়তের পক্ষে থাকার পরও দুনিয়া আফগানিস্তানের অধিকাংশ জনগণের মতামতকে উপেক্ষা করছে; বরং ভাব দেখে বোঝা যাচ্ছে, যতক্ষণ পর্যন্ত আফগানিস্তানে একজনও সরকার বিরোধী লোক থাকবে না, ততক্ষণ পর্যন্ত তারা স্বীকৃতি দেবে না! সম্ভব হলে তারা এই একজনকে কেন্দ্র করে গোটা আফগানিস্তানে ইসলামী শাসন পদ্ধতি পরিবর্তন করে কুফরী পদ্ধতির শাসন প্রতিষ্ঠিত করবে। তাদের ধারণা-এর মাধ্যমে ইসলাম ধ্বংস ও শেষ হয়ে যাবে।

ঃ আফগানিস্তানকে স্বীকৃতিদানকারী দেশ পাকিস্তান, সৌদি আরব এবং আরব আমিরাতের সাথে আফগানিস্তানের সম্পর্ক কেমন যাচ্ছে?

মোল্লা হাসান ঃ তাদের সাথে আমাদের সম্পর্ক কূটনৈতিক দৃষ্টিতে বন্ধুত্বপূর্ণ। কোন অসুবিধা কিংবা অসন্তুষ্টি আমাদের মাঝে নেই। শুধু একটি অসুবিধা যা সৌদির এক ব্যক্তির (উসামা বিন লাদেন) সাথে সম্পর্কিত। ইনশাল্লাহ্ এই সমস্যারও অতি দ্রুত সমাধান হয়ে যাবে এবং আমাদের মধ্যে পূর্বেকার মতো গভীর সম্পর্ক গড়ে উঠবে। আসলে এটা কোন সমস্যাই নয়।

ঃ দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য তালেবান কতটুকু কাজ করছে?

মোল্লা হাসান ঃ হ্যাঁ, আমরা এ ব্যাপারে কাজ করে যাচ্ছি। এ বিষয়ে অনেক সাফল্য আমরা দেখতে পাচ্ছি। যদি কোন ব্যক্তি আফগানিস্তানের অবস্থা সোভিয়েত দখলদারী সময় কিংবা তার পরবর্তী তিন-চার বছর দেখে থাকেন এবং বর্তমান অবস্থা দেখেন, তবে তালেবান যে অর্থনৈতিকভাবে সাফল্য অর্জন করছে এবং জনসাধারণের যথার্থ খেদমত করছে, তা স্বীকার করতে বাধ্য হবেন।

আল-হামদু লিল্লাহ্! ইসলামী ইমারাতের পক্ষ থেকে কৃষি, খনিজ, ব্যবসা এবং চিকিৎসার ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জনে সাধ্যানুসারে চেষ্টা ও মেহনত চলছে। আগামীতে ইনশাআল্লাহ্ আফগানিস্তান দ্রুত উন্নয়নের পথে অগ্রসর হতে পারবে। আমাদের খুব মেহনত করতে হবে অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য। কারণ দীর্ঘ বিশটি বছর এই দেশ যুদ্ধের মধ্যে নিপতিত ছিলো। বিশ বছরের ক্ষতিপূরণ করা অল্পদিনে কিংবা সামান্য মেহনতে মোটেও সম্ভব নয়।

ঃ গোটা বিশ্বের ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে এবং মজলুম মুসলমানদের রক্ষার্থে আপনাদের কোন চেষ্টা আছে কি?

মোল্লা হাসান ঃ এ বিষয়ে আমি প্রথম প্রশ্নের উত্তরে কিছুটা আলোকপাত করেছি। আমরাও চেষ্টা করছি মুসলমানদের জন্য এমন রাস্তা বের হয়ে যাক, যা দ্বারা এই মজলুমীর অবসান ঘটে। যদি কোন মুসলিম রাষ্ট্র কাফের-ফাসেকদের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হতে চায় এবং যদি তারা আপন প্রভু আল্লাহ্‌র সামনে সাহায্য প্রার্থনা করে, তবে আল্লাহ্ তা'আলা অবশ্য তাদের বিজয়ী হওয়ার শক্তি দান করবেন। ফলে তারা কাফেরদের কব্জা থেকে মুক্তি লাভ করবে। এটা মৌলিক কথা। মুসলমান যদি আল্লাহ্ পাকের নির্দেশানুসারে কাজ করে, তবে যত শক্তিশালী লবিই তার বিরুদ্ধে কাজ করুক, এরপরও মুসলমানের বিজয় হবে এবং তাদের ইজ্জত বৃদ্ধি পেতে থাকবে।

ঃ আন্তর্জাতিকভাবে ইসলামী ইমারাত আফগানিস্তানের কোন প্রচারমাধ্যম কাজ করছে কি?

মোল্লা হাসান ঃ সকল মুসলিম রাষ্ট্রের দায়িত্ব রেডিও ও পত্র-পত্রিকা ইত্যাদির মাধ্যমে ইসলামী ইমারাত আফগানিস্তানের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য প্রচার করা। যাতে বিশ্ব-মুসলিম আফগানিস্তানের ইসলামী শাসনের দৃঢ়তা লাভের জন্য সাহায্য-সহযোগিতা করে।

আমি মোল্লা হাসানকে তাঁর মূল্যবান সময় দেয়ার জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ প্রশ্ন করলাম ঃ মুসলিম উম্মাহ, বিশেষ করে বাংলাভাষী মুসলমানদের জন্য কোন নসীহত করবেন কি?

মোল্লা হাসান ঃ নসিহত নয়, কিছু আরজ করবো। যদি মুসলমানরা আল্লাহ্‌র দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত দেখতে চায়, তবে যে যেখানে যেভাবে আছেন ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। সকলে একমত হয়ে মিলেমিশে কাজ করতে হবে। দলাদলি থেকে মুক্ত হতে হবে। মুসলমানদের পরাজিত হওয়ার প্রধান কারণ হলো, দলীয় কোন্দল, মতানৈক্য ও পারস্পরিক সংঘাত। এক এক পার্টি এক এক লিডারের লেজুড়ে বাঁধা। দলীয় ইসলাম আর নেতাগিরির ফলাফল আমরা অতীতে আফগানিস্তানে দেখেছি। আফগানিস্তানে

অনেক উন্নত একটা জিহাদ হয়েছিল। লোকেরা বড় ত্যাগ স্বীকার করেছে সেই জিহাদে। আফগানিস্তানের জনতা অনেক বড় শত্রুকে যাকে গোটা বিশ্ব ভয় করতো আল্লাহ্‌র সাহায্যে পরাজিত করেছে। আর যখন আফগানিস্তানে বিভিন্ন দল এবং গ্রুপের জন্ম হলো, তখন গোটা আফগানিস্তান আগুনে জ্বলে কাবাব হয়ে গিয়েছিল। তাই প্রথম কথা হচ্ছে, মুসলমানদেরকে এক প্লাটফর্মে দাঁড়াতে হবে। এক রাস্তায় চলতে হবে। তবেই মুসলমানরা অর্জন করতে পারবে সৌভাগ্য ও সাফল্য।

দ্বিতীয় কথা হলো, মুসলমানদের উচিত দুনিয়াবী সকল উদ্দেশ্য পেছনে ফেলে নিজের ঘরে, নিজের দেশে, নিজ জাতির মধ্যে আল্লাহ্‌ পাকের আইন প্রতিষ্ঠিত করার জন্য চেষ্টা করা। আমার বিশ্বাস, তা হলে এই জমিনে, এই জমিনের বাসিন্দাদের উপর আল্লাহ্‌ পাক ফজল, করম, রহমত ও ফয়েজাত বর্ষণ করবেন। আল্লাহ্‌ পাক আমাদের সবাইকে নিজেদের মধ্যে এবং নিজেদের রাষ্ট্রসমূহে কুরআন পাকের শাসন প্রতিষ্ঠিত করার তৌফিক দান করুন। আমরা যদি এই পথ ত্যাগ করি, তবে ধ্বংস এবং বেইজ্জতি আমাদেরকে গ্রাস করবে অবশ্যই।

ইসলামী ইমারাত আফগানিস্তানের প্রতিরক্ষা প্রতিমন্ত্রীর সাক্ষাৎকার

যুদ্ধ চলাকালীন একটা দেশের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ অফিস হলো প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়। আফগানিস্তানের প্রতিরক্ষামন্ত্রী অন্য প্রদেশে থাকায় আমাকে প্রতিমন্ত্রীর সাথে দেখা করতে নিয়ে যাওয়া হলো। প্রতিরক্ষা প্রতিমন্ত্রী মোল্লা আব্দুর রাজ্জাকের অফিস লোকে লোকারণ্য। তিনি খুব ব্যস্ত। আমাকে অপেক্ষা করতে বলা হলো। প্রায় ত্রিশ মিনিট পর ভেতরে ডেকে নিয়ে যাওয়া হলো। মোল্লা সাহেব বসে আছেন মাটির উপরে বিছানায়। সামনে কয়েক সেট টেলিফোন, মোবাইল এবং ওয়্যার্লেস। তিনি এবং আরো দু'জন এগুলো রিসিভ করেই যাচ্ছেন। এর ফাঁকে ফাঁকে তাঁকে উপস্থিত লোকদের সাথেও কথা বলতে হচ্ছে। এত ব্যস্ততার মধ্যেও মেহমানদারীর কথা ভুললেন না। চা-নাস্তার ব্যবস্থা করা হলো। সেক্রেটারীকে বললেন দরজা কিছুক্ষণের জন্য বন্ধ রাখতে। বন্ধ করতে করতেও দু'চারজন প্রবেশ করলেন। এর মধ্যে একজন হলেন যুদ্ধের কমাণ্ডার। তাকে ময়দান থেকে ডেকে আনা হয়েছে শাসাতে। অপরাধ, যুদ্ধের আইন হলো কাউকে যদি বন্দী করা হয়, তবে সাথে সাথে তাকে কেন্দ্রে প্রেরণ করা। কেন্দ্র আদালতের মাধ্যমে ফয়সালা করবে এই বন্দী কতটুকু অপরাধী? এরপর শাস্তি। কিন্তু এই কামাণ্ডার একজন বন্দীকে একরাত ক্যাম্পে হাত বেঁধে রেখেছেন। মোল্লা সাহেব ক্ষুব্ধ হয়ে বার বার বলছেন, এই ব্যক্তি যদি তার সাথে অন্যায় আচরণ করার জন্য আল্লাহ্র কাছে ফরিয়াদ করে, তবে জবাব কি দেবো? যুদ্ধবন্দী হলেও তার সাথে বে-ইনসাফী করবে কেন? কামাণ্ডার সাহেব প্রত্যুত্তরে বলছেন, গাড়ি ছিলো না বলে পাঠাতে পারিনি। এরপর আরো অনেক কথা তাদের মধ্যে হয়েছে। কমাণ্ডার বের হয়ে গেলেন। ভাবলাম, সাক্ষাৎকার গ্রহণের এ-ই সুযোগ। হাল-হাকিকত জিজ্ঞেস করে সরাসরি মূল প্রশ্নে চলে আসি।

ঃ গোটা বিশ্বের অবস্থা আমাদের সামনে আছে। মুসলমানরা মজলুম জীবন অতিবাহিত করছে। আপনার দৃষ্টিতে এর প্রধান কারণ কি?

মোল্লা আব্দুর রাজ্জাক ঃ বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। মুসলমানরা আল্লাহ্ পাকের নির্দেশসমূহ এবং মহানবী (সাঃ)-এর আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়ে যাওয়ায় প্রত্যেক ক্ষেত্রে কাফেরদের নিকট পরাজিত হচ্ছে এবং একই কারণে তারা পরস্পর সংঘাতে লিপ্ত হয়েছে। জুলুম, নির্যাতন, কষ্ট এবং বহু সমস্যায় তারা জর্জরিত। মুসলমানরা যদি সত্যিই আল্লাহ্ পাকের বিধান এবং রাসূল (সাঃ)-এর নিয়ে আসা দ্বীনের আলোকে

নিজেদের মধ্যে যেখানে ঘাটতি দেখা দিয়েছে, তা পূরণ করে ফেলে এবং আল্লাহ্ তা'আলার কাছে মাফ চায়, তবে ইনশাল্লাহ্ মুসলমানেরা কাফের-ফাসেকদের জুলুম-বর্বরতা থেকে রক্ষা পেয়ে যাবে এবং আগামীতে কোন কাফের মুসলমানদের উপর হাত উঠানোর সাহস দেখাবে না।

ঃ অনেক ইসলামী চিন্তাবিদের মতে একবিংশ শতাব্দিতে ইসলাম ও মুসলমান গোটা বিশ্বের নেতৃত্ব দেবে। এ সম্পর্কে আপনার মতামত কি?

মোল্লা আব্দুর রাজ্জাক, আমি নিজেও এ কথা বলি। ইনশাআল্লাহ্ বর্তমানে অবস্থার পরিবর্তন ঘটছে। এখন আর আগের মত নয় যে, যদি একবার ইসলামের নাম উচ্চারণ করা হয়, তবে চারদিক থেকে কুফরী শক্তিসমূহ বর্বর জুলুম এবং আতংকের অবস্থা সৃষ্টি করে ফেলে। বর্তমানে আল্লাহ্র হুকুমে জাহেলিয়াতের অন্ধকার হ্রাস পাচ্ছে। মুসলমানরা উন্নতির দিকে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করছে। যেসব কাফের নেতৃত্ব দখল করে আছে, তারা অতিসত্বর পরাজিত হবে। যেভাবে আমাদের উলামা ও তালাবার হাতে ওদের পরাজয় ঘটেছে।

ঃ বিশ্বে আবারো খেলাফতে ইসলামিয়া ফিরিয়ে আনার জন্য মুসলমানদের কি করতে হবে এবং কি ধরনের কর্ম-কৌশলের প্রয়োজন?

মোল্লা আব্দুর রাজ্জাক ঃ আমি দৃঢ়তার সাথে বলছি, মুসলমানদের পরাজিত হওয়ার কারণ, আমলে সালেহ্ এর অভাব ও নিজেদের অনৈক্য। যদি মুসলমান আমলে সালেহের ব্যাপারে আন্তরিক হয়, পূর্ণাঙ্গভাবে ইসলামের উপর চলে এবং "ওয়া'তাসিমূ বি-হাবলিল্লাহি জামিআউ' ওয়ালা তাফাররাকূ"-এর উপর ভিত্তি করে সংঘবদ্ধ হয়, তবে ইনশাল্লাহ্ আগামীতে কোন সমস্যাই থাকবে না। এখন কথা হলো, কর্ম-দক্ষতা, কৌশল এবং উপকরণ এসব তো দুনিয়াতে সংগ্রহ করতে হয়। এসব গ্রহণের ব্যাপারে আল্লাহ্ কিংবা রাসূল (রাঃ)-এর পক্ষ থেকে কোন নিষেধাজ্ঞা নেই; বরং স্বয়ং মহানবী (সাঃ) কর্ম-দক্ষতা অর্জন করে উপকরণ সংগ্রহ করেছেন। শুধু মুসলমানদের মধ্যেই বর্তমানে দক্ষতা ও কৌশলের কমতি দেখা যায়। মুসলমানরা আল্লাহ্র বিধান ভুলে কাফেরদের প্রতি ঝুঁকে গেছে। মানুষের তৈরী সবকিছুর প্রতি আমাদের আকর্ষণ আছে, শুধু নেই আল্লাহ্ পাকের নির্দেশাবলীর প্রতি। আমি তো চাই যে, যত উপকরণ আছে, সেগুলোকে ইসলামী বিধানমতো ব্যবহার করা হোক। মুসলমানরা তা ক্রয়-বিক্রয় এবং ব্যবহার করা শিখুক।

ঃ তালেবান মুভমেন্টের এত দ্রুত বিজয়ের কারণ কি?

মোল্লা আব্দুর রাজ্জাক ঃ প্রকৃত কারণ হলো, আমরা যা মুখে বলি, তা বাস্তবেও কার্যকর করি। এ জন্যই যেখানেই গিয়েছি, জনতা তালেবানদের কথা ও কাজে মিল

দেখে নিজ থেকে তাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে। তারা বুঝেছে, এরা সাচ্ছা লোক, যা বলে তার উপর আমল করে। অথচ বর্তমান বিশ্বের নেতাদের অবস্থা হলো, মুখে বলে এক কথা , বাস্তবে করে অন্য কাজ। এ জন্যেই মানুষ তাদের কথা গ্রহণ করে না। ফলে তারা দিন দিন আস্থাহীন হয়ে পড়ছে। আমরা বলি, ইসলাম প্রকৃতপক্ষে আমাদের কাছে আছে। অন্যদের জন্যও সত্যিকার বাস্তব ইসলাম আমরা চাই। মুখ দিয়ে আমরা যা বলেছি, বাস্তবে এ থেকে বেশি করতে চেষ্টা করেছি। তাছাড়া আফগানিস্তানের মুসলমানরা ত্যাগী মুজাহিদ, তারা ইসলামের প্রতি আনুগত্যশীল এবং কোরবানী দানে সর্বদা প্রস্তুত।

ঃ আমি শুনেছি তালেবান মুভমেন্ট যাদের চিন্তা-চেতনায় শুরু হয়েছে, আপনি তাদের একজন। বর্তমানে তালেবান বিপ্লবের সফলতা দেখে আপনার অনুভূতি কি?

মোল্লা আব্দুর রাজ্জাক ঃ আমি শুরু থেকে আজ পর্যন্ত কামনা করেছি, জুলুমের সমাপ্তি হোক এবং প্রকৃত ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হোক। এই সাফল্যের জন্য নতশীরে আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া জানাচ্ছি।

ঃ কুফরী ও মুনাফেকী শক্তিসমূহ আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে হামলার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। তারা অজুহাত খুঁজছে। তা প্রতিরোধ করার জন্য তালেবান কতটুকু প্রস্তুত? তাদের সাথে মোকাবেলা ও লড়াই করার মতো শক্তি কি তালেবানের আছে?

মোল্লা আব্দুর রাজ্জাক ঃ অবশ্যই আমরা লড়াই চাই না, সংঘাত কামনা করি না। আম্বিয়া (আঃ)-দের উপর এর চেয়েও কঠিন সমস্যাবলী এসেছে। তেমনিভাবে খোলাফায়ে রাশেদীন ও অন্যান্য আদর্শ ব্যক্তিদের উপর এ থেকে বেশি পরীক্ষা এসেছে। পরীক্ষা তো অবশ্যই দিতে হবে। এ ব্যাপারে কোন চিন্তা বা ভয় নেই। আমরা তো কখনো চিন্তা করি না যে, হায়! আমাদের কি হবে? আমরা শুধু এতটুকু বলবো যে, আমাদের যদি কোন সমস্যা কিংবা পরাজয় দেখা দেয়, তবে তা শুধু আমলে সালেহ'র অভাবেই দেখা দেবে।

ঃ বিশ্ব মুসলিম বিশেষ করে বাংলাভাষী মুসলমানদের প্রতি আপনার কোন বিশেষ পয়গাম আছে কি?

মোল্লা আব্দুর রাজ্জাক ঃ গোটা বিশ্বের মুসলমানদের প্রতি আমার আহ্বান যে, নিজের লেবাস, সুরত, সীরাত ও আমলসহ সর্বক্ষেত্রে কুফরীর আনুগত্য ও অনুসরণ পরিত্যাগ করুন।

কাফেরদের প্রতি দুর্বল হবেন না। ঐ ইসলামের উপর চলুন, যা আল্লাহ্ তা'আলা মনোনীত করেছেন। মোটকথা, বিশ্ব মুসলিম, বিশেষ করে, বাংলাভাষী মুসলমানদের প্রতি এই অনুরোধ, তাঁরা যেন আফগানিস্তানের অবস্থা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেন, যাতে

আগামীতে ভুল না হয়। নেতৃত্বের ভুল সিদ্ধান্তের ফলে আফগানিস্তানের অবস্থা এমন করুণ অবস্থায় দাঁড়িয়েছিল যে, পনেরো লক্ষ মানুষ যারা জুলুম, নির্যাতন, শোষণ এবং কুফরীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে ইসলাম প্রতিষ্ঠার আশায় নিজেদের মূল্যবান প্রাণ উৎসর্গ করেছিল, ক্ষমতা মুজাহিদদের হাতে এসেছিল, কিন্তু তার পরও সুফল পাওয়া যাচ্ছিল না।

মহানবী (সাঃ) সমস্ত মুসলমানদের উদাহরণ এক শরীরের সাথে দিয়েছেন। যেখানেই কোন মুসলমানের সমস্যা হয়, তা নিয়ে বিশ্বমুসলমানের ভাবতে হবে যে, এই সমস্যা মুসলমানদের উপর কেন এলো? আফগানিস্তানে পনেরো লাখ মুসলিমের শাহাদতবরণের পরও তার সুফল এ জন্যই পাওয়া যাচ্ছিল না যে, আমাদের নেতারা দলীয় ইসলামের নিগড়ে আটকে নেতৃত্বের লোভ পরিত্যাগ করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। বর্তমান অবস্থা আপনি দেখছেন। আমাদের আমীর একজন। এদেশে পূর্ণাঙ্গ ইসলাম প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফলে দেশ থেকে জুলুম বিতাড়িত হয়েছে। এ জন্যেই বিশ্বমুসলিম এবং বিশেষ করে আমার প্রিয় বাংগালী মুসলমান ভাইদের কাছে অনুরোধ করবো যে, দলীয় সংকীর্ণতা আর নেতৃত্বের লোভ পরিত্যাগ করুন। আমরা আপনাদের কাছে দোয়ার দরখাস্ত করছি যে, আল্লাহ্ পাক যেন আমাদেরকে অনৈক্য থেকে রক্ষা করেন। আমরা আপনাদের জন্য দোয়া করছি, মহান আল্লাহ্ যেন আপনাদের সবাইকে দলীয় ইসলাম থেকে রক্ষা করে এক আমীরের নেতৃত্বে কাজ করে দ্বীন প্রতিষ্ঠার তাওফীক দান করেন।

আফগানিস্তানের আইনমন্ত্রী মাওলানা হাসান তুরাবীর সাক্ষাৎকার

প্রতিরক্ষা প্রতিমন্ত্রীর অফিস থেকে বের হয়ে সোজা চলে যাই আইনমন্ত্রীর অফিসে। পুরাতন একটা স্যাকুলার সমাজ ভেঙ্গে ইসলামী সমাজ গড়তে আইনমন্ত্রীর দায়িত্ব গুরুত্বপূর্ণ; এক্ষেত্রে ঘাত-প্রতিঘাত ছাড়াও বিচক্ষণতার প্রয়োজন আছে। মাওলানা হাসান তুরাবী রুশবিরোধী জিহাদে নিজের এক পা, এক হাত ও এক চোখ শহীদ করেছেন। তাঁর বুকে অদম্য সাহস। আইনের শাসনে তিনি আপোষহীন। স্বয়ং আমীরুল মু'মিনীন মোল্লা ওমরও এই মানুষটিকে দারুণ সমীহ্ করেন। তবে আলাপে বোঝা গেল তিনি বেশ রসিক। চা বিস্কুট খেয়ে যখন সাক্ষাৎকারের কথা বললাম, হাসলেন, বললেন, লিখে দিয়ে যাও প্রশ্নগুলো। নিজের হাতে লিখে উত্তর দেব। তবে সাবধান! আমেরিকাকে উত্তর দেখাবে না। ওরা দেখলে ওদের পেট পাতলা হয়ে যাবে। জানতে চাইলেন, উত্তর শক্ত দেব, না নরম। বললাম, হযরতের ইচ্ছে। প্রশ্নগুলো আমি উর্দুতে লিখে দিলেও তিনি পশতুতে উত্তর দিয়েছেন। এবার দেখা যাক তাঁর নরম-গরম উত্তরগুলো কি।

ঃ জনাব! আজ গোটা বিশ্বের অবস্থা আমাদের সামনে। মুসলমানরা চারদিকে মজলুমের জীবন অতিবাহিত করছে। আপনি এর কারণ কি মনে করেন?

ঃ প্রকৃত কারণ এটাই যে, মুসলমানরা ইসলামী নীতি ছেড়ে দিয়েছে। 'জিহাদ এবং আমর বিল মারূফ নাহি আনিল মুনকার' (সৎ কাজের আদেশ-অসৎ কাজের নিষেধ) ছেড়ে দিয়েছে। পোশাক-আশাক ও আচরণসহ জীবনের অন্যান্য আমলে কাফের-মুনাফেকদের অনুকরণ করছে। যে কারণে আল্লাহ্ পাকের পক্ষ থেকে তাদের উপর অপমানের জীবন আপতিত করে দেয়া হয়েছে।

ঃ ইসলামী বুদ্ধিজীবী ও আলেমদের ধারণা একুশ শতাব্দীতে ইসলাম ও মুসলমানরা বিশ্বকে নেতৃত্ব দেবে। এ সম্পর্কে আপনার মতামত কি?

ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ভালো জানেন। আমি মুসলিম বিশ্বের যে অবস্থা দেখছি, তাতে এ বিষয়ে আশাবাদী নই। তবে আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছে হলে সব কিছুই সম্ভব।

ঃ গণতন্ত্রের ব্যাপারে তালেবান সরকারের ধারণা কি?

ঃ হারাম। হারাম এ জন্য যে, জনগণ গণতান্ত্রিক পদ্ধতির নির্বাচনের মাধ্যমে ফাসেক ও মুনাফেকদের হাতে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে নেতৃত্ব তুলে দিচ্ছে। তাই নেতা

নির্বাচনের ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক পদ্ধতির ভোটাভোটি হারাম। আমরা বর্তমান বিশ্বের মুসলিম দেশগুলোর অবস্থা দেখলে এর বাস্তবতা বুঝতে পারবো।

ঃ আফগান জনতা ইসলামী আইন কিভাবে কবুল করছে?

ঃ শুধু নামে নয়, ইসলামী আইন যদি বাস্তবেই ইসলামী আইন হয় এবং আইন প্রয়োগকারীদের এর উপর আমল থাকে, তবে সাধারণ মুসলিম জনতা কেন তা কবুল করবে না? আমি মনে করি, প্রকৃত ইসলামী আইন কাফেরদের উপর প্রয়োগ করলেও তারা তা গ্রহণ করে নেবে এবং আনন্দিত হবে। কারণ সুখ, শান্তি, মুক্তি এবং মানবতাবোধ যতটুকু ইসলামী আইনে আছে, তা বিশ্বের আর কোন আইনে নেই।

ঃ ইসলামী সরকার কয়েদীদের সাথে কি রকম ব্যবহার করে থাকে?

ঃ আমরা কয়েদীদের সাথে সেই রকম ব্যবহার করি, যে রকম মহানবী (সাঃ) নির্দেশ করেছেন। তাদেরকে থাকার ব্যবস্থাসহ ন্যায্য ও প্রয়োজন মত খাদ্য সরবরাহ করে থাকি। তাদের সুবিধা-অসুবিধার খবর নিয়মিত নেয়া হয়। ওজারতে আদলিয়া (বিচার বিভাগীয় মন্ত্রণালয়) থেকে দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের পাঠিয়ে খবরা-খবর নেয়া হয়। যারা আদালতে নির্দোষ প্রমাণিত হন, তাদেরকে সাথে সাথে মুক্তি দেয়া হয়।

ঃ যে লোকদের উপর ইসলামী সরকার হাত কাটা, কিসাস এবং তা'যিরাত ইত্যাদি প্রয়োগ করেন, তাদের অসহায় পরিবারকে 'বায়তুল মাল আল-ইসলামী' থেকে কোন সাহায্য করা হয় কি?

ঃ আমরা আমাদের দেশে 'ওজারতে মুহাজিরীন ও শোহাদা' নামে একটি মন্ত্রণালয় গঠন করেছি। যার দায়িত্বসমূহের মধ্যে একটি হলো এতিমদের রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থা করা। আমাদের দেশের আয়ের এক-দশমাংশ এই বিষয়ক সমস্যার সমাধানে ব্যয় করে থাকি।

ঃ অধিকাংশ মুসলিম দেশে আজ গণতান্ত্রিক সরকার পদ্ধতি চলছে। ঐ সকল দেশে ইসলামী শাসন কোন্ পদ্ধতিতে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে?

ঃ হারাম জিনিসের চর্চা করা হারাম। গণতন্ত্র একটি নাজায়েয পদ্ধতি। তাই চেষ্টা করতে হবে দেশকে গণতন্ত্রের কালো হাত থেকে রক্ষা করার। এরপর দেশে ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠার জন্য আমার মতে ঐদিকে অগ্রসর হতে হবে, যে পথে খোলাফায়ে রাশেদীন পা রেখেছিলেন। এ কাজে অত্যন্ত সাধনা করতে হবে, সাবধান হতে হবে, যাতে এর ভিত্তি সঠিক ও সুদৃঢ় হয়।

ঃ যে সকল স্থানে মুসলমানদের উপর জুলুম-নির্যাতন হচ্ছে, সে ব্যাপারে আপনার বক্তব্য কি?

ঃ এটা একটা বিতর্কিত প্রশ্ন। তারপরও এ সম্পর্কে আমার মতামত হলো,

মুসলমানরা দ্বীনের রাস্তা, বিশেষ করে জিহাদ ছেড়ে দিয়েছে। ফলে মৃত্যুর পূর্বেই মুসলমানরা শাস্তি পেয়ে যাচ্ছে। যেমন ইসলাম আমাদের ধর্ম হওয়া সত্ত্বেও বেশির ভাগ মুসলমান কাফেরদের নির্দেশ মান্য করছে। মুসলমানদের জীবনে আল্লাহ্‌র আদেশ-নিষেধ উপেক্ষিত।

ঃ 'আমর বিল মা'রূফ নাহি আনিল মুনকার' গ্রুপ কোন্ নীতির ভিত্তিতে পরিচালিত হচ্ছে?

ঃ 'আমর বিল মা'রূফ নাহি আনিল মুনকার' আফগানিস্তানের পূর্ণাঙ্গ একটি মন্ত্রণালয়। নেক কর্মসমূহ প্রতিষ্ঠিত করা এবং খারাপ কর্মগুলোকে প্রতিরোধ করা এদের কাজ। আমাদের ইসলামী রাষ্ট্রের মূল কর্মসূচী হচ্ছে এই মন্ত্রণালয়কে শক্তিশালী করা। সমাজের প্রত্যেক শ্রেণীর মধ্যে তা বাস্তবায়ন করা। রাষ্ট্রের প্রধান ব্যক্তি থেকে একজন সাধারণ নাগরিকের প্রতি দৃষ্টি রাখা এই বিভাগের দায়িত্ব।

আস-সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ্।

কাবুল বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর মোল্লা পীর মোহাম্মদ রূহানীর সাক্ষাৎকার

১১ মার্চ আনুমানিক বিকাল ৩টায় শিক্ষামন্ত্রী মোল্লা মাসুমের সন্ধানে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে যাই। তিনি তখন ইংল্যান্ড সফরে থাকায় তাঁর সাথে দেখা করা সম্ভব হলো না। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পাশেই কাবুল বিশ্ববিদ্যালয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর মোল্লা পীর মোহাম্মদ রূহানী শিক্ষামন্ত্রীর অনুপস্থিতিতে দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর অফিসে সংবাদ নিয়ে জানা গেলো তিনি বাইরে আছেন। কিছুটা আশাহতভাবে বিশ্ববিদ্যালয় ঘুরে দেখে পিছনের প্রধান সড়কটিতে যেতেই দেখা গেলো তিনি হেঁটে আসছেন। আমার গাইড রাস্তায়ই তাঁর সাথে আমাকে পরিচয় করিয়ে দিলেন। বুকে জড়িয়ে নিলেন। আফগানী স্টাইলে ছাংগে, জুড়ে, তাগরে, তবিয়েত খেদে, বাচ্চা-মাচ্চা খেদে, হান্ডি ওয়ালা খেদে? ইত্যাদি বলে গেলেন। ইতোমধ্যে এসব শব্দ নিজেরও আয়ত্ত্বে চলে আসায় এক নিঃশ্বাসে জবাব দিলাম। হাসলেন। তিনি কিছু উর্দূ বলতে পারেন। আমন্ত্রণ জানালেন তাঁর অফিসে। সাক্ষাৎকারের কথা বলতেই বললেন এই মুহূর্তে তাঁর জরুরী মিটিং আছে শিক্ষা কমিশনারদের সাথে। বললাম, প্রয়োজনে মিটিং শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবো। প্রত্যুত্তরে জানালেন, না, না এত কষ্ট করবেন কেন। আচ্ছা 'দাঁড়ান— আমি মিটিংটা শুরু করে দিয়ে আসি। কিছুক্ষণের মধ্যে তিনি ফিরে এলেন। একজনকে ডেকে চা-বিস্কুট দিতে বললেন। চা-বিস্কুট খেতে খেতেই উর্দূতে আমি তাঁর কাছে জানতে চাইলাম, আপনার সাথে এমন এক মুহূর্তে বসে কথা বলছি, যখন গোটা বিশ্বে মুসলমানরা মজলুমের জীবন অতিবাহিত করছে। আপনার মতে এর প্রধান কারণ কি?

ঃ নাহ্‌মাদুহু ওয়া নুসাল্লী আলা রাসূলিহিল করীম। আম্মা বাদ— আমি উর্দুতে কাঁচা। আপনি জানেন, আমার মাতৃভাষা পশতু। এরপরও আমি চেষ্টা করব আপনার সাথে উর্দুতে কথা বলতে। যেহেতু আপনি পশতু জানেন না।

প্রিয়নবী (সাঃ)-এর হাদীসে উল্লেখিত হয়েছে প্রথমে ইসলামের ভিত্তি গরীবদের মাধ্যমেই তৈরী হয়েছিল। নবী করিম (সাঃ)-এর সাথে প্রথমে গরীব লোকেরা এসেছিলেন। আর এই গরীবরাই গোটা বিশ্বের কাছে ইসলামের নিয়ামত উপস্থাপন করেছেন। আলহামদু লিল্লাহ্‌, আপনার এবং আমার ইসলাম প্রাপ্তি ঐ মুসলমানদের গরীবত্বের বিনিময়ে হয়েছে। ঐ সময়ের মুসলমানদের অবস্থার উপর দৃষ্টি রেখে বর্তমান অবস্থাকে তুলনা করুন। মহানবী (সাঃ) ও সাহাবায়ে কেরামের সময়ে কত সমস্যা, কত কষ্ট, কত দরিদ্রতা ছিলো। অন্যদিকে অল্প কিছুদিনের ভেতর খায়বর ও শাম বিজয়ের মাধ্যমে আল্লাহ্‌ তা'আলা তাঁদের বিপুল গনীমত দান করলেন। ফলে আখেরাতের মুক্তির

সাথে সাথে মুসলমানেরা দুনিয়াতেও সম্পদ লাভ করলো। নবী করিম (সাঃ) বলেন ঃ 'আসরের সাথে 'উসর এবং 'উসরের সাথে 'আসর থাকে।'

পবিত্র কোরআন মজিদে ইরশাদ হয়েছে ঃ

'নিশ্চয় কষ্টের সাথে স্বস্তি রয়েছে।' (সূরা আল-ইনশিরাহ-৫)

অন্য এক হাদীসে মহানবী (সাঃ) বলেছেন ঃ 'মুসিবত মুসলমানদের জন্য পরীক্ষা।' কোন ব্যক্তি নিজেকে মুসলমান দাবী করলেই সে নাজাত পেয়ে যাবে না। তাকে কষ্ট দিয়ে পরীক্ষা নেয়া হবে। এই পরীক্ষার বিনিময়ে তার অবস্থানের উন্নতি করা হবে। এ কারণেই সর্বদা মুসলমানরা মজলুম অবস্থায় থাকে। এরপরও আপনার প্রশ্নের উত্তরে বলবো, নিজেদের দুর্বলতাই আজকের অবস্থার জন্য অনেকটা দায়ী। আজ মুসলমানরা বিলাসিতা ও দুনিয়ার মোহে উন্মাদ হয়ে আছে; তারা ইসলামী জীবন ব্যবস্থা—কোরআন-হাদীস-ফেকাহ ছেড়ে দিয়েছে। কাফের আর কুফরীর দিকে আকৃষ্ট হয়ে আছে। কাফেরদের ডাকে সাড়া দিয়ে আজ মুসলমানরা নির্লজ্জতা, অশ্লীলতা, অনৈসলামিক কাজে লিপ্ত হয়েছে। এই সব কারণে মুসলমানদের উপর পরীক্ষাগুলো ক্ষেত্রবিশেষে গজব হয়েও আসছে। তবে আমার বিশ্বাস, অতিসত্বর মুসলমানদের এই মজলুমানা জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটবে। গোটা বিশ্বে এক শক্তিশালী ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠিত হবে। তবে এই লক্ষ্যে আমাদের কাজ করে যেতে হবে।

ঃ আপনার বক্তব্য থেকে বোঝা গেলো, অতিসত্বর গোটা বিশ্বে এক শক্তিশালী ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠিত হতে যাচ্ছে বলে আপনি আশাবাদী। আমরা অনেক বিজ্ঞ আলেমকে বলতে শুনেছি একবিংশ শতাব্দিতে মুসলমানরা বিশ্বের নেতৃত্ব দেবে। এখন প্রশ্ন হলো, নেতৃত্ব প্রাপ্তির জন্য মুসলমানদের কি করতে হবে?

ঃ আমাদের প্রথমে বুঝতে হবে, মুসলমানরা কেন তাদের নেতৃত্ব হারিয়েছে। আমি মনে করি, মুসলমানরা কোরআন-হাদীসের আনুগত্য ছেড়ে দিয়েছে বলে তারা নেতৃত্ব তথা খেলাফত হারিয়েছিল। সেই নেতৃত্ব ফিরে পেতে হলে আবার ফিরে আসতে হবে কোরআন-হাদীসের দিকে। যদি মুসলমানরা ইসলামী বিধান মেনে চলে এবং ঈমান ও আকিদার প্রতি দৃঢ় হয়, তবে ইনশাআল্লাহ্ গোটা বিশ্বে আবার ইসলামী নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে। উদাহরণ স্বরূপ আমি বলতে পারি আফগানিস্তানের কথা। আফগানীরা রাশিয়ার মতো পরাশক্তির সাথে মোকাবেলা করলো। চৌদ্দ বছর আমরা জিহাদ করলাম। পনেরো লাখ মুজাহিদ শহীদ হলেন। অসংখ্য মানুষ উদ্বাস্তু হলো। এখানে মুসলমানরা সর্বপ্রকার কষ্ট স্বীকার করেছে। কাবুল ঘুরে আপনি দেখুন ওখানের এমারতগুলো মাটির সাথে মিশে গেছে। আফগানিস্তানের অন্যান্য এলাকায় গিয়ে দেখুন শত্রুরা কেমন ধ্বংসাত্মক কাজ করেছে, কিন্তু এর পরও আফগানীরা ইসলাম ছেড়ে দেয়নি। ফলে নবী করিম (সাঃ)-এর প্রকৃত উত্তরসূরী 'আল-উলামাউ-ওয়ারাসাতুল আম্বিয়া'দের হাতে ক্ষমতা এসেছে। তালাবা ও উলামার মাধ্যমে এখানে কোরআন-হাদীসের শাসন প্রতিষ্ঠা

পেয়েছে। আম্বিয়া (আঃ)-গণ কোন ধন-সম্পদ রেখে যাননি। তাঁরা রেখে গেছেন আল্লাহ্র কালাম, কোরআন ও হাদীস। তালেবান সামরিক দৃষ্টিতে অত্যন্ত দুর্বল ছিলো, কিন্তু আল্লাহ্র সাহায্যে তাদের হাতেই ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাই মুসলমানদের হতাশ হওয়ার কিছু নেই। দুনিয়ার সাজ-সজ্জা আর সরঞ্জাম দেখে ভয়ের কিছু নেই। আল্লাহ্র সাহায্যে মুসলমানদের হাতেই ওরা পরাজিত হয়ে যাবে। 'ইনতানসুরুল্লাহা ইয়ানসুরকুম' আল্লাহ্ পাক ঈমানদারদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন– 'তোমরা যদি আল্লাহ্র দ্বীনের সাহায্যকারী হয়ে যাও, তবে আমি (আল্লাহ্) তোমাদের সাহায্যকারী হয়ে যাব'। 'ওয়া মাকারু ওয়া মাকারাল্লাহু ওয়াল্লাহু খায়রুল মাকিরীন'। কাফেরগণ সর্বদা চেষ্টা করে মুসলমানদেরকে ধ্বংস করে দিতে। অথচ আল্লাহ্ তা'আলা শ্রেষ্ঠ হেফাজতকারী। আল্লাহ্ তা'আলার সাহায্যই উত্তম সাহায্য। তাই ভয়ের কিছু নেই।

ঃ তালেবান বিপ্লবের এত দ্রুত সফলতার কারণ কি?

ঃ আল-হামদু লিল্লাহ, আফগানী জনসাধারণ বড় মুজাহিদ। তালেবানরা নতুন কোন মুজাহিদ নয়। তারা পুরাতন মুজাহিদদেরই একটা অংশ। তারা অনেকেই আফগান জিহাদের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ছিলো। মোল্লা মোহাম্মদ ওমর, বর্তমান পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোল্লা মোহাম্মদ হাসান, বর্তমান প্রেসিডেন্ট মোল্লা মোহাম্মদ রব্বানী সবাই পুরাতন মুজাহিদ। তাঁরা আফগান জিহাদে শুরু থেকেই ছিলেন। কিন্তু আফগান বিজয়ের পর কিছু সংখ্যক ফাসাদী মুজাহিদদের লেবাসে, দাড়িমুখে পাগড়ী মাথায় দিয়ে মুজাহিদদের ভেতর প্রবেশ করে। তারা বাস্তবে কিন্তু মুজাহিদ ছিলো না। ফলে তাদের কলংকের ছাপ এসে গোটা আফগান মুজাহিদের উপর লাগে। তারা ক্ষমতার দ্বন্দ্বে আফগান ও আফগান জিহাদের মৌলদর্শন ধ্বংস করে দিয়েছিলো। তারা নিজেদের স্বার্থে মুজাহিদদেরকে বিক্রি করে বসেছিলো। ওরা ইসলামী নীতি ছেড়ে কাফের-ফাসেকদের নীতি গ্রহণ করে পনেরো লাখ শহীদের রক্তের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলো। মহান আল্লাহ পাক পনেরো লাখ মুজাহিদের রক্ত ও প্রাণের ইজ্জত রক্ষার্থে একদল মুজাহিদের ভেতরে নতুন প্রেরণা সৃষ্টি করে দিলেন। আর তারাই তালেবান নামে ময়দানে ফিরে আসলো। সত্যকথা হলো, একমাত্র আল্লাহ্র সাহায্যে তালেবান বিপ্লব এতদ্রুত বিজয়ী হয়েছে। তা ছাড়া ফাসাদী ও এখতেলাফী গ্রুপদের ধ্বংসলীলা দেখে এখানের জনসাধারণ বড়ই আতংকিত ছিলো বিগত দিনে তাদের জিহাদ, শাহাদত, রক্ত দানের বিফলতার কথা ভেবে। তালেবানদের কর্মতৎপরতা তাদেরকে আবার আশার আলো দেখায়। ফলে জনসাধারণ স্বেচ্ছায় তালেবানদের সাহায্য-সহযোগিতা করে। এটাও তালেবান বিপ্লব দ্রুত সাফল্য অর্জনের একটা কারণ। তা ছাড়া তালেবানরা কোন বিশেষ দল বা গ্রুপের লোক নয়। তারা বিগত চৌদ্দ বছরের যুদ্ধে বিভিন্ন গ্রুপের সাথে কাজ করেছে। আমরা দেখেছি, বিভিন্ন গ্রুপের মুখলিস মুজাহিদরা স্বেচ্ছায় তালেবানে যোগ দিয়ে দীর্ঘ ত্যাগের

অর্জনকে সফলতার চূড়ায় প্রতিষ্ঠিত করতে সর্বাগ্রে রক্ত ও প্রাণ দিতে ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। এসব কারণে তালেবানরা দ্রুত সফলতার দিকে অগ্রসর হয়েছে। এখনো (১৯৯৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাস) দু'টি এলাকা আহমদ শাহ মাসুদের দখলে রয়েছে। ইনশাআল্লাহ্ অতি দ্রুত শুনতে পাবেন ঐ এলাকাগুলোও তালেবানদের কব্জায় এসে গেছে।

ঃ ইসলামী আফগানিস্তানের বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার বাস্তবায়ন কোন্ পর্যায়ে?

ঃ আল-হামদু লিল্লাহ্। আমাদের প্রচুর স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসা-বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। আপনি হয়তো কিছুটা দেখে এসেছেন। এ বিশ্ববিদ্যালয়টিও দেখছেন। আমাদের বর্তমান শিক্ষানীতির মূল কথা হচ্ছে ইসলাম ও আধুনিক বিজ্ঞানের সমন্বয়। আমাদের ইসলামী সরকার দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নে অত্যন্ত গুরুত্ব দিচ্ছে। আগামী কিছু দিনের মধ্যেই আপনারা দেখতে পাবেন, আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ থেকে এমন সকল ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী, পদার্থ বিজ্ঞানী, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক বের হবেন- যারা সাথে সাথে আলেমে দ্বীনও হবেন। আমরা সে চেষ্টাই চালিয়ে যাচ্ছি। বিজ্ঞানের সাথে যেহেতু ইসলামের সংঘাত নেই, তাই আমাদেরও বিজ্ঞানের সাথে শত্রুতা থাকার কথা নয়। আমাদের সংঘাত কুফরী ও নাস্তিক্যবাদী আকিদাসমূহের সাথে। বর্তমান ইসলামী সরকার প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে তিন হাজার ছাত্রকে এবং সকল মাদ্রাসা ছাত্রদের জন্য ফ্রি শিক্ষার ব্যবস্থা করে দিয়েছে। তাদের থাকা-খাওয়া-বই-খাতা সবই বায়তুল মাল আল-ইসলামীর পক্ষ থেকে ব্যবস্থা করা হচ্ছে। আপনারা যে বিশ্ববিদ্যালয়ে বসে আছেন, এতে সাড়ে চার হাজার ছাত্রকে সব কিছু ফ্রি দেওয়া হয়ে থাকে।

ঃ আফগানিস্তানে স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় এবং মাদ্রাসার সংখ্যা কত?

ঃ কাবুল, জালালাবাদ, কান্দাহার, হেরাত, কুন্দুজ, মাজার-ই শরীফ ইত্যাদি শহরে বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। এই সকল বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত হয় কাবুল বিশ্ববিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানে। তাছাড়া প্রায় শহরেই কলেজ রয়েছে। কয়েক হাজার মাদ্রাসা আছে। প্রায় সকল মসজিদেই মক্তব রয়েছে। ইসলামী সরকার নতুন নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও গড়ে তুলছে।

ঃ মাদ্রাসা ও স্কুল-কলেজের সিলেবাসের মধ্যে কোন ব্যবধান আছে কি?

ঃ আগে ছিলো। বর্তমানে অভিন্ন সিলেবাস। তাই এখন মাদ্রাসা অর্থই স্কুল এবং স্কুল অর্থই মাদ্রাসা। আমরা যখন ইংরেজীতে বলি, তখন বলবো স্কুল-কলেজ, আর যখন আরবীতে বলি তখন বলবো মাদ্রাসা। স্মরণ রাখতে হবে, ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। জীবনের প্রয়োজনে যত শিক্ষা আছে সবই ইসলামী শিক্ষা। নামায-রোযা-শরিয়ত শিক্ষা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরজ। বাকী শিক্ষাগুলো সকলের শিখা জরুরী নয়। এক একজন এক এক বিষয়ে দক্ষ হলেই কাজ চলে। দায়িত্ব আদায় হয়ে যায়। তাই কোন শিক্ষাই ইসলাম থেকে আলাদা নয়।

ঃ বর্তমানে আফগানিস্তানে শিক্ষিতের হার কত?

ঃ চৌদ্দ বছর যুদ্ধকালীন সময়ে আফগানিস্তানের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গিয়েছিলো। সোভিয়েত ইউনিয়নের শাসনামলে এখানকার সাবেক সিলেবাস বাতিল করে সমাজতান্ত্রিক শিক্ষা চালু করা হয়েছিলো। কিন্তু এরপরও ইসলামী জ্ঞানার্জনের ধারাবাহিকতা সম্পূর্ণ বন্ধ ছিল না। মুহাজিরগণ হিজরতের পর সাধ্যমতো তাদের ছেলে-মেয়েদেরকে পড়িয়েছেন। যারা দেশে ছিলেন, তারা যুদ্ধের মধ্যেও সাধ্যমতো ছেলে-মেয়েদেরকে লেখাপড়া করিয়েছেন। বিগত চৌদ্দ বছরে আফগানিস্তানে ইসলামী ও সমাজতান্ত্রিক এই দুই ধারায় শিক্ষিতের হার বৃদ্ধি পেয়েছে। সব মিলিয়ে বর্তমানে প্রায় সত্তর ভাগ লোক শিক্ষিত। আমরা চেষ্টা করছি অশিক্ষিতের হার আরো কমিয়ে আনতে।
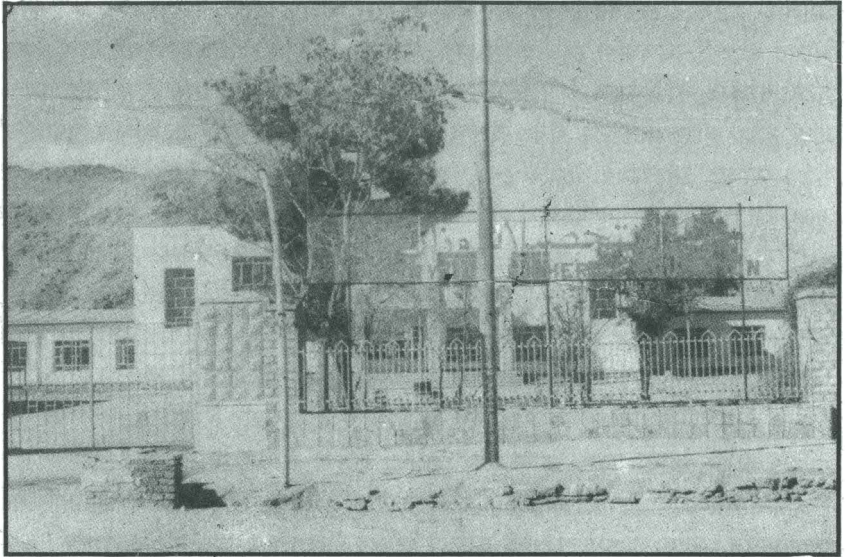
কাবুলে শিক্ষামন্ত্রীর অফিস

ঃ মহিলাদের শিক্ষার ব্যাপারে ইসলামী আফগানিস্তানের নীতি কি?

ঃ আল-হামদু লিল্লাহ। আমরা মহানবী (সাঃ)-এর আদর্শ অনুসরণে মহিলাদেরকেও শিক্ষিত করে গড়ে তুলতে চেষ্টা করছি। প্রত্যেক এলাকায় মসজিদকেন্দ্রিক মহিলাদের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত করা হচ্ছে। দুনিয়া অবশ্য এ সম্পর্কে আফগান নীতি ভিন্ন মনে করে। কারণ তারা চায় তাদের মতো আফগানী মহিলারাও উলঙ্গ হয়ে যাক। ওদের প্রকৃত উদ্দেশ্য মহিলাদের শিক্ষা কিংবা শান্তি নয়। তারা চায় বেহায়াপনা, নির্লজ্জতা, নাপাকী। আসলে তারা নারী লোভী। তাই তারা ইসলামের হিজাব আইনের বিরুদ্ধে কথা বলে।

আফগানিস্তানে হিজাব বাধ্যতামূলক করে দেয়া হয়েছে প্রত্যেক নারীর জন্য। এটাই বিরুদ্ধবাদীদের মাথা ব্যথার কারণ। তাই তারা ইসলামী আফগানিস্তানের উপর অপবাদ দিচ্ছে যে, আফগানিস্তানে মহিলাদেরকে শিক্ষা থেকে বঞ্চিত রাখা হচ্ছে। এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা। আমাদের মহিলারা হিজাবের সাথে প্রয়োজনীয় শিক্ষা গ্রহণ করছে। আমরা মহিলাদের জন্য দ্বীনি শিক্ষা ও ডাক্তারী শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব দিচ্ছি। আফগান চিকিৎসালয়সমূহে প্রচুর মহিলা পর্দার সাথে চাকরিও করছে। সরকার মহিলাদের জন্য পৃথক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও কর্মক্ষেত্র প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করছে। কাজ শুরু হয়ে গেছে। আমরা নারী-পুরুষের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও চাকরির ক্ষেত্র পৃথক করে মানুষকে চোখ, মন ও শারীরিক যেনা থেকে রক্ষার চেষ্টা করছি। হোয়াইট হাউসের মতো জায়গায় একজন মহিলা চাকরিজীবী যখন তার ইজ্জত বাঁচাতে ব্যর্থ হলো, তখন নারীদের পৃথক কর্মক্ষেত্র ছাড়া তাদের ইজ্জতের নিরাপত্তার বিকল্প ব্যবস্থা কি হতে পারে? আমরা আফগান মহিলাদের জন্য পৃথক ব্যবস্থা করেছি। মহিলাদের জন্য আলাদা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয়েছে। তবে মহিলাদের পাইলট, ইঞ্জিনিয়ার, আর্মি, পুলিশ হওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। চৌদ্দ বছরের যুদ্ধের পর এসব ক্ষেত্রে আমাদের দক্ষ পুরুষের কোন অভাব নেই।

ঃ আফগানিস্তানে রুশবিরোধী জিহাদে শহীদ হয়েছিলেন বাংলার এক কৃতি সন্তান মাওলানা আব্দুর রহমান ফারুকী (রহঃ)। ছোটবেলায় আমি তাঁর স্নেহ ও সংস্পর্শ পেয়েছিলাম। আফগানিস্তানে এসে সংবাদ পেলাম দীর্ঘদিন শহীদ কামান্ডার আব্দুর রহমান ফারুকী (রহঃ) আপনার সাথে ছিলেন জিহাদের ময়দানে। তাঁর একজন স্নেহভাজন হিসেবে আমি আপনার কাছ থেকে তাঁর সম্পর্কে কিছু জানতে চাই?

ঃ (চোখে অশ্রু টলমল করছে) শহীদ কামান্ডার মাওলানা আব্দুর রহমান ফারুকী (রহঃ) একজন উঁচু স্তরের বীর মুজাহিদ কামান্ডার, মুত্তাকী এবং বিজ্ঞ আলেম-এ-দ্বীন ছিলেন। বীর বিক্রমে শত্রুর উপর তার হামলা সাথীদেরকে কিংকর্তব্যবিমূঢ় এবং আমার চিন্তাশক্তিকে স্তব্ধ করে দিতো। বাস্তবে তিনি এত উঁচু স্তরের ব্যক্তিত্ব ছিলেন যে, আমি তাঁর প্রশংসা করারও যোগ্য নই। আমি আজ তাঁর যতই গুণকীর্তন করবো, বাস্তবিক অর্থে তা কম হবে। একটি ঘটনা বলি। তা থেকেই অনুমান করতে পারবেন তার সাহসের কথা। একবার শহীদ কমান্ডার খালেদ যুবায়ের (রহঃ) লিজা থেকে মারায় আক্রমণের উদ্দেশ্যে চলে যাওয়ার পর অন্য একটি আক্রমণ আমাদের সামনে জরুরী হয়ে দাঁড়ালো। দুই স্থানে এক সাথে আক্রমণ আমি যুক্তিসম্মত মনে করলাম না। তাই মাওলানা আব্দুর রহমান ফারুকী (রহঃ)-কে পাঠিয়ে দিলাম খালেদ যুবায়ের (রহঃ)-কে আক্রমণ থেকে বিরত রাখতে। আব্দুর রহমান ফারুকী (রহঃ) খালেদ যুবায়ের (রহঃ) কাছে গিয়ে একথা বললে তখনও তিনি দৃঢ় থাকলেন আক্রমণ করতে। আব্দুর রহমান যখন খালেদ যুবায়েরকে বোঝাতে চেষ্টা করলেন, তখন তিনি রেগে ধমক দিয়ে বললেন,

আব্দুর রহমান! তুমি আমার নায়েব, অথচ আমার উপর কর্তৃত্ব খাটাতে চাচ্ছো! শেষ পর্যন্ত খালেদ যুবায়ের আক্রমণ করে বসলেন। অনেকে শহীদ হলেন। প্রচুর আহত হলেন। স্বয়ং আব্দুর রহমান ও খালেদ যুবায়ের দু'জনই আহত হলেন। আমি ওয়ারল্যাসের মাধ্যমে আব্দুর রহমানকে দ্রুত ফিরে আসতে বললাম। তিনি ফিরে আসলেন। রাস্তায় আমার সাথে দেখা হতেই তিনি দরদের সাথে বলতে লাগলেন, হায়, অমুক শহীদ হয়ে যাবে, অমুক মারাত্মক আঘাত পেয়েছে; ওদের জন্য দ্রুত ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। আমি আশ্চর্য হলাম। স্বয়ং আব্দুর রহমানের শরীর থেকে রক্ত ঝরছে। অথচ একটিবারও নিজের কথা বললেন না। এমনকি আমার সামনে উহ্ শব্দটি পর্যন্ত করেননি। আরো আশ্চর্য হবেন শুনলে, পরদিন সকালে জারমনকাইর উঁচু পাহাড়ে আক্রমণের জন্য আমি যখন ক্যাম্পের আটটি গ্রুপকে বললাম, তখন একমাত্র আব্দুর রহমান ছাড়া বাকী সাতটি গ্রুপ এই বলে পিছুটান দিল যে, ঐ পাহাড়ে এই মুহূর্তে আক্রমণ করা আত্মহত্যার শামিল হবে।

আমি আব্দুর রহমানকে বললাম, আমার আফগানী সাত গ্রুপই পিছু হটে গেছে। তুমিও বাদ দাও। তাছাড়া তুমি আহত। প্রতি উত্তরে আব্দুর রহমান আমাকে বললো, আমরা জিহাদে শহীদ হতে এসেছি। আপনি অনুমতি দিন। আমার ইচ্ছা না থাকা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত তাকে অনুমতি দিলাম। তিনি তার ১৭ জন সাথী নিয়ে আক্রমণ করলেন। আল্লাহ্‌র সাহায্য আর আব্দুর রহমানের যুদ্ধ কৌশলে এই ১৭ জনই সেই উঁচু পাহাড় দখল করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এই পাহাড় দখল করা খোস্ত বিজয়ের লক্ষ্যে মুজাহিদদের জন্য ছিলো অত্যন্ত জরুরী। খোস্ত দখলে রাখতে রুশদেরও ঐ পাহাড়টি কব্জায় রাখা ছিলো জরুরী। কত বলবো আব্দুর রহমানের কথা। শেষ পর্যন্ত ক্যাম্পের পাশে নহরে লিজার তীরে শত্রুর মাইনে আটকা পড়ে আব্দুর রহমান শহীদ হয়ে গেলেন। নহরের তীরেই তাঁর মাজার রয়েছে। ইনশাআল্লাহ্ কিছুদিনের ভেতর তাঁর মাজারকে সংরক্ষণের জন্য চারদিকে দেওয়াল করা হবে। ফলে আফগান জাতি চিরদিন স্মরণ রাখবে, আব্দুর রহমান ফারুকী আফগান জাতির ঈমান-আকিদা এবং দেশকে রক্ষার জন্য বাংলাদেশ থেকে এসে শাহাদতবরণ করেছেন।

ঃ বাংলাদেশের মুসলমানদের প্রতি আপনার কোন পয়গাম আছে কি?

ঃ আমি সকল মুসলমান ভাইদের নিকট একটি অনুরোধ রাখবো, দয়া করে দ্বীনকে নিজেদের নফসানিয়াতের উপর দৃঢ় রাখতে চেষ্টা করুন। এখতেলাফ এড়িয়ে চলুন। সবাই এক প্লাটফরমে এসে কাজ করুন। রুশবিরোধী জিহাদে অনেক বাংলাদেশী ভাই আমার সাথে ছিলেন। তাদের অনেকেই শহীদ হয়ে গেছেন। আমি তাদেরকে অনেক নিকট থেকে দেখেছি। তাদের স্বভাব-চরিত্র ও মন-মানসিকতা দেখে আমার দৃঢ় ধারণা জন্মেছে, বাংলাদেশীরা সাহসী, দৃঢ়চেতা, ঈমানদার ও মুজাহিদ প্রকৃতির লোক, তাদের এই দুর্লভ গুণগুলোর সাথে যদি ঐক্য, ইসলামী ভ্রাতৃত্ব ও পারস্পরিক মহব্বত সৃষ্টি হয়ে

যায়, তবে আমার বিশ্বাস আপনারাও বিশ্বের বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারবেন।

ঃ বিশ্বমানবের প্রতি কোন আহ্বান আছে কি?

ঃ বিশ্বমানবের কাছে আমার হৃদ্যতাপূর্ণ অনুরোধ হলো, সকলে নিজেদের মধ্যে ঐক্য, প্রেম, ইসলামী ভ্রাতৃত্ববোধ প্রতিষ্ঠিত করুন। একে অন্যকে সাহায্যের মানসিকতা সৃষ্টি করুন। যারা এখনো উন্নত জীবন ব্যবস্থা থেকে মাহরুম, তারা দ্বীনের পথে ফিরে আসুন। ইসলাম অবশ্যই একটি উন্নত জীবন ব্যবস্থা। স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা সর্বদা ইসলাম ও মুসলমানদের সাথে আছেন।

ঃ গণতন্ত্রকে বলা হচ্ছে উন্নত ব্যবস্থা। এ সম্পর্কে তালেবানদের ধারণা কি?

ঃ গণতন্ত্র মোটেও উন্নত ব্যবস্থা নয়। তালেবানদের ধারণা স্পষ্ট–যা ইসলামে নেই তা তালেবানেও নেই। গণতন্ত্রের কোন গ্রহণযোগ্যতা ইসলামে নেই। বর্তমান বিশ্বে গণতন্ত্রের যে ব্যাখ্যা রয়েছে, তা সম্পূর্ণ ইসলাম পরিপন্থী। গণতন্ত্রের সুযোগে আজ বিশ্বে লম্পটের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত রয়েছে এবং মদ্যপান, জ্বেনা ও কুফরী সবই বৈধ হয়ে যাচ্ছে। কারণ, বেশির ভাগের রায়ই গণতন্ত্রের আদর্শ। ইসলামে প্রত্যেক মানুষের মতামতের গুরুত্ব আছে তবে খারাপ কাজ প্রতিরোধে কারো মতামতের প্রয়োজন হয় না। গণতন্ত্রে বেশির ভাগের রায় খারাপ দিকে হলেও মেনে নিতে হয়। ফলে দিন দিন দুনিয়ায় খারাপ কাজ বৃদ্ধি পাচ্ছে। গণতন্ত্রের গোটা ইতিহাসের দিকে তাকালে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, বিশ্বব্যাপী ইসলাম ধ্বংসের ষড়যন্ত্র বাস্তবায়নের একটি হাতিয়ার হিসাবে বর্তমানে গণতন্ত্রকে ব্যবহার করা হচ্ছে। তাই তালেবান নাস্তিক্যবাদ ও সমাজতন্ত্রের মতো গণতন্ত্রকেও ঘৃণা করে।

ধন্যবাদ আপনাকে। আপনার মূল্যবান সময় থেকে আমাকে কিছু অংশ দেয়ার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ।

আফগানিস্তানের প্রেসিডেন্ট মোল্লা মোহাম্মদ রব্বানীর সাক্ষাৎকার

আফগানিস্তানের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রখ্যাত মুজাহিদ তালেবান আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম ব্যক্তিত্ব মোল্লা মোহাম্মদ রব্বানী বর্তমানে (১৯৯৯ ইং) আফগানিস্তানের প্রেসিডেন্ট। ১৩ মার্চ দুপুরে আমাকে সময় দেওয়া হলো তাঁর সাথে সাক্ষাতের জন্য। প্রেসিডেন্ট ভবনে যাওয়ার পথে এক গাছের নীচে দেখা হয়ে গেলো অর্থমন্ত্রীর সাথে। দুঃখের বিষয়, তাঁর নামটা স্মরণ নেই। তিনি বুকে জড়িয়ে এক নিঃশ্বাসে বললেন- ছাংগে, জুরে, তাগড়ে, তবিয়ত খেদে, পা খায়ের দে ইত্যাদি। প্রতি উত্তরে আমিও তা বলে বিদায় নিলাম। প্রেসিডেন্ট ভবনের গেইটে প্রচুর মানুষের ভিড়। গেইট ম্যানের কাছে একটা চিরকুট দিতেই গেইট খুলে দেয়া হলো। ভেতরে গিয়ে প্রেসিডেন্টের ব্যক্তিগত সচিবের সাথে প্রথমে দেখা করলাম। তিনি আমাকে নিয়ে গেলেন প্রেসিডেন্ট কক্ষে। সালাম-মুসাফাহা শেষে বিনীতভাবে তাঁকে জানালাম, আপনার কাছে আমার কিছু প্রশ্ন আছে। যদি অনুমতি দেন বলতে পারি। অনুমতি পাওয়া গেলো। প্রশ্ন শুরু করে দিলাম।

ঃ গোটা বিশ্বের মুসলমানরা আজ জালিমদের কবলে নিষ্পিষ্ট, নির্যাতিত। আপনার মতে এর কারণ কি?

ঃ বিশ্বের অধিকাংশ মুসলমান বাস্তবে তাদের নিজস্ব পথ ও নীতি ছেড়ে দিয়েছে। তারা কাফের-ফাসেক ও মুনাফিকদের পথ ও নীতি গ্রহণ করেছে। ইসলামী নীতির উপর যেভাবে চলার কথা ছিলো, সেভাবে চলছে না। ফলে বেইজ্জতী এবং অমঙ্গল তাদের উপর অন্ধকারের মত ছেয়ে আছে।

ঃ উলামায়ে কেরাম এবং ইসলামী চিন্তাবিদদের অনেকেই মনে করেন, দুই হাজার সালে ইসলাম ও মুসলমান গোটা বিশ্বের নেতৃত্ব দেবে। এ ব্যাপারে আপনার বক্তব্য কি?

ঃ বিশ্ব মুসলিমের আজ প্রথমে নিজেদের নক্সা ও পদ্ধতির সাথে পরিচিত হওয়া প্রয়োজন। নিজেদের উপর, নিজেদের পরিবার-পরিজনের উপর, নিজেদের সমাজের উপর ইসলামী তাহজীব ও তামাদ্দুন প্রতিষ্ঠিত করতে পারলে ইনশাআল্লাহ্ মুসলমান যে দিকে যাবে সফল হবে এবং অপমান ও অমঙ্গল থেকে রক্ষা পাবে।

ঃ গণতন্ত্রের ব্যাপারে তালেবান সরকারের অভিমত কি?

ঃ গণতান্ত্রিক পদ্ধতি ইসলামসম্মত নয়। কারণ গণতন্ত্র অমুসলিমদের তৈরী এক রাষ্ট্রপদ্ধতি। মুসলমানদের কাছে এমারত ও খেলাফত প্রতিষ্ঠা এবং পরিচালনার নিজস্ব পদ্ধতি রয়েছে। আমি প্রথমেই বলেছি, আজ মুসলমানরা নিজেদের পদ্ধতি ও নীতি ছেড়ে

দিয়েছে বলেই এই রকম অনৈসলামিক পদ্ধতি গ্রহণ করছে, যার মধ্যে শুধু ধ্বংস আর অপমানই রয়েছে তাদের জন্যে।

ঃ দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য তালেবান সরকার কী কর্মসূচী হাতে নিয়েছে?

ঃ আফগানিস্তানের ইসলামিক সরকার দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। যে সমস্ত কৌশল, পথ, পদ্ধতি ও নীতির মাধ্যমে একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব, তালেবান সরকার ইসলামী সীমার ভেতর থেকে সেসব দিকে কাজ করছে এবং ইতোমধ্যে অনেকটা সফলও হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, বন্ধ থাকা কিছু কল-কারখানা চালু করা হয়েছে এবং বাকীগুলো চালু করানোর চেষ্টা অব্যাহত আছে। কৃষি ও খনিজ সম্পদের উন্নয়নেও পরিকল্পিতভাবে কাজ চলছে। যা থেকে আশা করা যাচ্ছে, ইনশাআল্লাহ্, কিছু দিনের মধ্যে আফগানিস্তানে অর্থনৈতিক দিকে এমন স্বচ্ছলতা দেখা যাবে, যা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে।

ঃ গোটা বিশ্বের ব্যাংকিং পদ্ধতি সুদভিত্তিক। ইসলামিক ইমারাত আফগানিস্তানে সুদমুক্ত ইসলামিক ব্যাংকিং পদ্ধতি চালু করা হয়েছে কি?

ঃ আমরা আমাদের ব্যাংকসমূহের জন্য যে নিয়ম-পদ্ধতি চালু করেছি, তা সম্পূর্ণ ইসলামিক। ইসলাম আমাদের জন্য যে অর্থনীতি দান করেছে, আমরা গোটা আফগানিস্তানের ব্যাংকসমূহে সেই নীতি অনুসরণ করে চলছি। আমাদের রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি সর্বপ্রকার সুদমুক্ত। দুনিয়ায় বর্তমানে অনেক ইসলামিক ব্যাংক রয়েছে, সেগুলোও সুদমুক্ত এবং ইসলামী নীতি অনুযায়ী চলছে।

ঃ ইসলামী অর্থনীতি অনুসরণে আন্তর্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্যে তালেবান সরকারের কোন প্রকারের অসুবিধা হচ্ছে কি?

ঃ এ বিষয়েও ইসলাম আমাদের জন্য ব্যবস্থা এবং নীতি বলে দিয়েছে। ইসলামিক দেশসমূহের সাথে আমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য ইসলামী নীতি অনুসারে হয়ে থাকে। অমুসলিম রাষ্ট্রসমূহের সাথে বাণিজ্য ক্ষেত্রে ইসলামী শরিয়ত যে নীতি নির্ধারণ করেছে, আমরা তা অনুসরণ করে থাকি।

ঃ আমরা শুনেছি, আফগানিস্তানে প্রচুর খনিজ সম্পদ রয়েছে। এগুলো উত্তোলনের কোন চেষ্টা চলছে কি?

ঃ আমরা আফগানিস্তনের খনিজ সম্পদ উত্তোলনের ব্যাপারে নিজস্ব প্রযুক্তি, শক্তি ও কৌশল কাজে লাগিয়েছি। যার কারণে অল্পদিনের মধ্যে আমাদের অর্থনীতি অনেকটা উন্নত এবং স্বচ্ছল হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। দুনিয়ার অন্যান্য মুসলিম এবং অমুসলিম রাষ্ট্রও আমাদের খনিজসম্পদ উত্তোলনে সাহায্যের হাত এগিয়ে দিতে ইচ্ছুক। তবে প্রথমে আমরা নিজেরা সর্বপ্রকার চেষ্টা চালিয়ে যাব।

ঃ এক দু'বছর পূর্বে আমীরুল মুমিনীন মোল্লা মোহাম্মদ ওমর মুজাহিদ গোটা বিশ্ববাসীর কাছে আবেদন করেছিলেন, আফগানিস্তানে কল-কারখানা নতুন করে তৈরী

ও বিধ্বস্ত পুরাতনগুলো চালুর জন্য এগিয়ে আসতে। আমরা জানতে চাচ্ছি, কোন মুসলিম রাষ্ট্র কিংবা মুসলিম ব্যক্তি কি এ ব্যাপারে সাহায্যের হাত নিয়ে এগিয়ে এসেছেন?

ঃ অনেক ইসলামী দেশ এ ব্যাপারে এগিয়ে এসেছে। তাদের সাথে চুক্তি এবং আলোচনাও হয়েছে। অনেকে সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছে। আমরা তাদের কাছে আরো ব্যাপক সহযোগিতার আশা করছি।

ঃ সাবেক সরকারসমূহের সময়ে বন্ধ হয়ে যাওয়া কল-কারখানার মধ্যে বর্তমানে কতটি চালু হয়েছে?

ঃ আনুমানিক সত্তরটি ধ্বংসপ্রাপ্ত কারখানা ইতোমধ্যে চালু হয়েছে এবং তাতে নিয়মিত কাজ চলছে। বাকীগুলো চালু করার চেষ্টা চলছে।

ঃ বাংগালী ইসলামী সংগঠনগুলোর প্রতি কোন বিশেষ উপদেশ আছে কি?

ঃ শুধু বাংগালী নয় বরং গোটা বিশ্বের মুসলমানদের জন্য আমার পয়গাম হলো, আপনারা ঐক্যবদ্ধ হয়ে যান। ইসলামী নীতি-আদর্শ প্রথমে নিজের উপর এবং পরে নিজেদের অধীনদের উপর প্রতিষ্ঠিত করুন। ইনশাল্লাহ্ সকল সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে এবং সফলতা আমাদের পায়ে লুটিয়ে পড়বে।

আফগানিস্তানের কেন্দ্রীয় ব্যাংক

নহরে লিজার তীরে বাংলার দামাল ছেলে

কাবুল থেকে আনুমানিক দু'-আড়াই শ' মাইল দূরে সীমান্তবর্তী এলাকা খোস্ত। ছোটবেলা থেকে খোস্ত নামের সাথে পরিচিত বিভিন্ন কারণে। সোভিয়েত বাহিনীর

শহীদ আব্দুর রহমান ফারুকীর কবর

বিরুদ্ধে আফগানীদের প্রথম স্বশস্ত্র প্রতিরোধ শুরু করার স্থান, সোভিয়েতের দালাল আফগানিস্তানের কম্যুনিস্ট প্রেসিডেন্ট নজিবুল্লাহর জন্মভূমি, আফগান জিহাদের প্রাণপুরুষদের অন্যতম আল্লামা জালাল উদ্দিন হক্কানীর বাড়ি, আফগান জিহাদের বিজয়ের সূচনা ইত্যাদি কারণে এ অঞ্চল সবিশেষ প্রসিদ্ধ। খোস্ত শহর থেকে তিন-চার মাইল দূরে একটি পাহাড়ী গ্রাম লিজা। গ্রামটি নহরে লিজার তীরে অবস্থিত। গ্রামের নামে নদীর নাম না নদীর নামে গ্রামের নাম, তা আমার জানা হয়নি।

১২ মার্চ সকালে লিজার দিকে আমরা যাত্রা শুরু করি। গেস্ট হাউসের দেয়ালে যে ইসলামী ঐতিহ্যের মডেলে তৈরী ঘড়ি, তাতে তখন ভোর পাঁচটা। আমাদেরকে নিয়ে জমকালো অন্ধকারের শরীর গাড়ির হেডলাইট দিয়ে কেটে কেটে ড্রাইভার সামনে অগ্রসর হচ্ছেন। পাহাড়ের পর পাহাড় ডিঙ্গিয়ে বাইফর জিপ এক সময় এসে থামলো নহরে লিজার তীরে। এখানে এক পাহাড়ের তলদেশে সবুজ গাছের ছায়ায় ঘুমিয়ে আছেন বাংলার সিংহপুরুষ শহীদ কমাণ্ডার মুফতী আব্দুর রহমান ফারুকী (রহঃ)। তাঁর সাথে দেখা করতেই আজ এখানে আসা। তিনি আমার ছোটবেলার শিক্ষক। আফগানিস্তানের মাটিতে পা দিয়েই অনেক আফগানীর কাছে শুনেছি তাঁর প্রশংসা। বড় বড় নেতা থেকে শুরু করে মন্ত্রীরা পর্যন্ত তাঁর বীরত্বের কাছে কৃতজ্ঞ। তিনি সবার কাছে প্রশংসিত। আফগান জাতির জন্য নিজের প্রাণ দিয়েছেন তিনি।

খোস্ত বিজয়ের পথকে প্রশস্ত করার পেছনে এই বীর বাঙ্গালীর অবদান

সর্বজনস্বীকৃত। নহরে লিজায় অযু করে আমরা তাঁর মাজারের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। পাশাপাশি আরো দু'জনের মাজার রয়েছে। তাঁরা হলেন শহীদ নুরুল করিম এবং শহীদ মতিউর রহমান। তিনজনই শত্রুর মাইনে আক্রান্ত হয়ে শহীদ হয়েছেন। আমরা তাঁদের মাজারের সামনে দাঁড়িয়ে তপ্ত অশ্রুভেজা নয়নে মহান আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করলাম, তিনি যেন নিজের ওয়াদা মতো শহীদদেরকে পুরস্কৃত করেন।

মো'আসকার-এ- শহীদ কমাণ্ডার আব্দুর রহমান ফারুকী

নহরে লিজার তীরে বিশাল এলাকা নিয়ে একটি মুজাহিদ ক্যাম্প আছে, যার নাম 'মো'আকার-এ-শহীদ কামাণ্ডার আব্দুর রহমান ফারুকী"। ক্যাম্পের প্রধান গেটে বিশাল সাইনবোর্ডে এ কথাটি লেখা দেখে আনন্দে চোখের পানি প্রবাহিত হলো। বাংলাদেশ থেকে অনেক দূরে আফগানিস্তানের খোস্‌ত প্রদেশে একজন বাংলাদেশীর নামে বিশাল এলাকা নিয়ে একটি সামরিক ক্যাম্প রয়েছে দেখে একজন বাংলাদেশী হিসেবে অহংকারে বুকটা উঁচু হয়ে উঠলো। বারবার স্মরণ হলো, "ওয়া তুইজ্জু মান তাশা-উ ওয়া তুজিল্লু মানতাশা...."।

নহরে লিজা থেকে দরিয়া-এ-কাবুল পর্যন্ত

শহীদ কমাণ্ডার মুফতী আব্দুর রহমান ফারুকী (রহঃ)-এর মাজার এবং তাঁর স্মৃতিবিজড়িত ক্যাম্প দেখে, নহরে লিজায় তপ্ত অশ্রু ফেলে চলে আসি খোস্‌ত শহরে।

খোস্‌ত আফগানিস্তানের কৃষি উন্নত একটি এলাকা। আমার সফরকালীন সময় (১৩.৩.৯৯) এ এলাকার গভর্নর ছিলেন আল্লামা জালাল উদ্দিন হক্কানী। রুশবিরোধী জিহাদে যেমন তাঁর রণকৌশলের সুখ্যাতি রয়েছে, তেমনি প্রদেশের উন্নয়নে তিনি দক্ষতার খ্যাতি অর্জন করেছেন। খোসতের রাস্তা-ঘাট, মসজিদ, মাদ্রাসা, কৃষি ইত্যাদি যে দ্রুতগতিতে উন্নত হচ্ছে, তা দেখেই অনুমান করা যায়, দীর্ঘ চৌদ্দ বছর ধারাবাহিক যুদ্ধ, চার বছর অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং বর্তমানে বিশ্বের মুসলিম-অমুসলিম রাষ্ট্রসমূহের অসহযোগিতার পরও যে অবস্থায় আফগানিস্তান দাঁড়িয়ে আছে, তা সত্যিই আশ্চর্যজনক। পাশ্চাত্যের মিডিয়া ও বুদ্ধিজীবীরা এবং তাদের ভাবধারায় পরিচালিত অন্যান্যরা মোল্লা-মৌলভী বলে যাদেরকে হেয় করতো বা করছে, তারাই আজ প্রমাণ করে দিচ্ছে, নিজের দেশ রক্ষার জন্য, দেশের উন্নয়নের জন্য, দেশের শান্তির জন্য বিশ্বব্যাংক, আমেরিকা কিংবা অন্য কোন পরাশক্তির গোলামীর প্রয়োজন নেই। সৎ ও দৃঢ় নেতৃত্বে একটি জাতিকে উন্নয়নের প্রতীকে পরিণত করতে পারে। আফগান শাসকগণ যতোদিন তাদের সৎ ও দৃঢ় নেতৃত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবেন, ততোদিন তাদের কারো সামনে মাথা নত করতে হবে না। এটা আমার বিশ্বাস।

বিকেল পাঁচটায় খাওয়া-দাওয়া সেরে আমরা কাবুলের পথে যাত্রা শুরু করি। কিছু পথ চলার পর দেখা গেল আট-দশ বছরের একটা মেয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে।

আমাদের বাইফোর এসে থামলো মেয়েটির পাশে। মেয়েটি হাত এগিয়ে আমাদেরকে একটা তান্দুরী রুটি দিয়ে চলে গেল তার পথে। জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম, আফগানীরা প্রতি ওয়াক্তের প্রথম রুটিটি মুসাফিরদের জন্য রেখে দেয়। এত মুসাফির বা ভিক্ষুক পাবে কোথায়, তাই রাস্তায় রুটি নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। আমরা সবাই রুটি ভাগ করে খেলাম। কাবুল-খোসতের রাস্তাটি পাহাড়ী। গরদেশের যে পাহাড়ের উপর দিয়ে রাস্তা গেছে, তা সমতলভূমি থেকে প্রায় চার হাজার ফুট উচ্চে। ফেব্রুয়ারী-মার্চে ইউরোপে সাধারণত এতো শীত পড়ে না, অথচ এ সময় আফগানিস্তানের পাহাড়গুলো তুষারে ঢাকা। গরদেশের পাহাড়ের চূড়ায় অন্তর্দ্বন্দ্বকালীন আফগানিস্তানের প্রধানমন্ত্রী গুলবুদ্দিন হেকমতিয়ারের একটি জংগী মটর সাইকেল অবহেলিতভাবে পড়ে আছে, যা পাহাড় কিংবা তুষারের উপর দিয়ে হালকা সরঞ্জাম নিয়ে চলতে পারে। গরদেশে আমরা যখন পৌঁছলাম, তখন রাত ১০টা। রাতে এক হোটেলে থাকার ব্যবস্থা করা হলো। সিরিজ উপন্যাসে সরাইখানার কথা অনেক পড়েছি। আফগানিস্তানে সরাইখানায় থাকার সৌভাগ্য হলো। আফগানিস্তানের এসব সরাইখানাগুলোকে জাতীয় হোটেল বলা চলে, থাকার জন্য কোন পয়সা দিতে হয় না। রাত চারটায় আমরা আবার যাত্রা শুরু করলাম। সকাল আটটায় আমাদের বাইফোর দরিয়া-এ-কাবুলের তীরে এসে পৌঁছলো।

হেকমতিয়ার ব্যবহৃত পরিত্যক্ত একটি অত্যাধুনিক মটরসাইকেল

উজবেকিস্তানের নেতা আল্লামা কারী উস্তাদ তাহের জান-এর সাক্ষাৎকার

১৯১৭ সালের ১৪ই মার্চ জার স্বৈরশাসনের পতন ঘটিয়ে কম্যুনিস্টরা রাশিয়ার ক্ষমতা দখলের পর আশপাশের দুর্বল রাষ্ট্রসমূহ দখল করতে শুরু করে। বিশ্বব্যাপী তাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্নে সোভিয়েত ইউনিয়ন গঠনের মাধ্যমে তারা সামনের দিকে অগ্রসর হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বিজয়ের সুফল হিসাবে তারা মাত্রাতিরিক্ত সুযোগ-সুবিধা লাভের মাধ্যমে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রভাব বিস্তার করতে থাকে। অনুসন্ধান করলে দেখা যায়, কম্যুনিস্টরা বিশ্বব্যাপী তাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য বিভিন্ন অঞ্চলে যে অকথ্য নির্যাতন চালিয়েছে, তার বেশির ভাগই মুসলিম রাষ্ট্র বা মুসলিম অধ্যুষিত এলাকা। তারা শেষ আঘাত করেছিল আফগানিস্তানে। কিন্তু বীর আফগানীরা কম্যুনিস্টদেরকে দাঁতভাঙ্গা জবাব দিয়ে গোটা বিশ্বে কম্যুনিস্টদের অস্তিত্ব ধ্বংস করে দিয়েছে। কম্যুনিস্ট কর্তৃক নির্যাতনের শিকার মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের একটি হচ্ছে উজবেকিস্তান, যার রাজধানী তাশকান্দ। উজবেকিস্তানসহ সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্তর্গত বিভিন্ন মুসলিম রাষ্ট্র তাদের সাধ্যানুসারে বার বার মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেছে। তবে সোভিয়েত প্রভাবের সামনে তারা বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে সক্ষম হয়নি। আফগানিস্তানে সোভিয়েত ইউনিয়নের পরাজয় তার ভেতরের মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের নাগরিকদেরকে দারুণভাবে অনুপ্রাণিত করেছে। ফলে তারা মৃত্যুকে জয় করে স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠায় পা পা করে সামনে এগোয়।

চেচনিয়া, দাগেস্তান, উজবেকিস্তানের ঘটনাসমূহ আমাদের সামনেই রয়েছে। কম্যুনিস্ট শাসনের পতনের পর উজবেকিস্তান সাংবিধানিকভাবে স্বাধীনতা অর্জন করলেও বাস্তবে বর্তমান শাসক ইসলাম করিমভ মস্কোর প্রতি অনুগত এবং সে ইয়াহুদী ধর্মে বিশ্বাসী। ফলে দেশের সরকারী নীতিমালা সম্পূর্ণ পূর্বের মতই রয়ে গেছে এবং সরকার সম্পূর্ণরূপে মস্কোর তাবেদারী করছে। উজবেকী উলামা ও দ্বীনদার জনসাধারণ কম্যুনিস্ট সরকারকে পরিবর্তন করে ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠার জন্য দীর্ঘদিন থেকে আন্দোলন করছেন। হরকাতুল ইসলামের নেতৃত্বে দীর্ঘ পঁচিশ বছর ধরে এই আন্দোলন চলছে। বর্তমানে এই সংগঠনের আমীর হচ্ছেন আল্লামা উস্তাদ কারী তাহের জান। ১২ই মার্চ ১৯৯৯-এর এক বিকেলে রাহবারের মাধ্যমে তাঁর সাথে পরিচয় হয় গেস্ট হাউসে। সালাম-মুসাফাহা-মু'আনাকার পর জানতে চাইলাম উজবেকিস্তানের বর্তমান অবস্থা কি?

তাহের জান ঃ উজবেকিস্তানে বিশেষ করে মাঅরাউন্নাহার এলাকার একটা ইতিহাস আছে। এই এলাকায় কম্যুনিস্ট শাসনের পূর্বে ইসলাম ও মুসলিমরা কত অগ্রসর ছিল, তা আপনারা অবগত আছেন। কম্যুনিস্ট শাসনামলের ঘটনাসমূহ দুঃখজনক। ইনশাআল্লাহ্, পূর্বের ইসলামী অবস্থা ফিরিয়ে আনার জন্য ইমাম বোখারী ও তিরমিযির সন্তানরা আবার জাগ্রত হচ্ছে। কম্যুনিস্ট শাসনামলের ভেতর দীর্ঘ সত্তুর বছর অতিবাহিত

হয়েছে। সেই সময় মুসলমানদের উপর অনেক অমানুষিক নির্যাতন চালানো হয়েছে। কম্যুনিস্ট নির্যাতনের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে গিয়ে মুসলমানরা অনেক কোরবানীও দিয়েছেন। প্রায় ৪০ মিলিয়ন মুসলমান সেই সময় শহীদ হয়েছেন। মুসলমানদেরকে ইসলামবিমুখ করতে কম্যুনিস্টরা অনেক চেষ্টা ও নির্যাতন করেছে। তাদের সীমাহীন নির্যাতনের পরও সেখানে আল্লাহু আকবার তাকবীর উচ্চারিত হয়েছে এবং আজও হচ্ছে। মোটকথা আল্লাহ্ তায়ালার সাহায্য যাদের সাথে থাকে অন্য কেউ তাদের ক্ষতি করতে পারে না।

ঃ আপনাদের আন্দোলনের উদ্দেশ্য কি শুধু বর্তমান সরকারের পতন, না গোটা পদ্ধতির পরিবর্তন?

তাহের জান ঃ ইসলামের প্রাথমিক যুগের মুসলমানদের মতোই আমাদের উদ্দেশ্য উজবেকিস্তানের পূর্ণ স্বাধীনতা এবং দেশে ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠা করা এবং আমরা সেদিকেই অগ্রসর হচ্ছি।

ঃ হরকাতুল ইসলামের সূচনা কিভাবে হলো?

তাহের জান ঃ আমাদের এই সংগঠন আজকের নতুন নয়। স্টালিনের শাসনামলে কম্যুনিস্ট নির্যাতনের বিরুদ্ধে আমাদের উলামায়ে কেরাম হরকাতুল ইসলামী গঠন করেছিলেন। তবে তখন তা গোপনে ছিলো। তৎকালীন সময়ে আমাদের সংগঠনের মূল তৎপরতা ছিলো মসজিদ, মাদ্রাসা, মক্তব প্রতিষ্ঠা করা। দীর্ঘদিন গোপনে দ্বীনি শিক্ষার মাধ্যমে আলেম-হাফিজ তৈরী করা হয়। বর্তমানে আমাদের সংগঠনের তৎপরতা আর গোপন কিছু নয়। আমাদের কাজ ইনশাআল্লাহ্ অব্যাহত থাকবে।

ঃ আমরা জানি উজবেকিস্তান একটি স্বাধীন দেশ। এরপরও আবার কিসের স্বাধীনতা আন্দোলন?

তাহের জান ঃ আমাদের বর্তমান অবস্থাটা ভিন্ন। যদিও আমরা স্বাধীনতার নামে পৃথক হয়েছি, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা নামমাত্র। বর্তমানে আমাদেরকে শাসন করছে পূর্বেকার কম্যুনিস্ট লোকগুলোই। ওরা আগের মতোই রাশিয়ার ইঙ্গিতে দেশ চালাচ্ছে। তাছাড়া গত কিছুদিন আগে ইসলাম করিমভ (বর্তমান উজবেকিস্তানের প্রেসিডেন্ট) ইসরাঈল সফরে গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি নিজে ঘোষণা করেছেন যে, 'আমি ইহুদির সন্তান ইহুদি।' কার্ল মার্কস্, লেনিন প্রমুখও ইহুদি ছিলেন। আর ইহুদিরা হলো ইসলাম ও মুসলমানদের কট্টর শত্রু। ১৯৯১ সালে ইসলাম করিমভ এক ঘোষণার মাধ্যমে উজবেকিস্তানের চার হাজার মসজিদ বন্ধ করে দেয়। বাকীগুলোতে মাইকে আজান দেয়া নিষিদ্ধ রয়েছে। তাছাড়া ইতোমধ্যে অনেক মসজিদ ধ্বংস করা হয়েছে। প্রচুর দ্বীনি মাদ্রাসা বন্ধ এবং ধ্বংস করা হয়েছে। দ্বীনি তৎপরতার উপর কঠোরতা গ্রহণ করেছে। অন্যদিকে ইহুদি-খৃষ্টান মিশনারীদের তৎপরতা প্রকাশ্যে চলছে। কোন কোন ক্ষেত্রে সরকার তাদেরকে সাহায্য করছে। বর্তমান সরকার উজবেকিস্তানের অসংখ্য আলেমকে শহীদ করেছে। বিশেষ করে শহীদ আল্লামা কাহরামান, আল্লামা আহমদ খান, আল্লামা কারী আব্দুল হাকিম প্রমুখ ছিলেন দেশের সর্বজন-শ্রদ্ধেয় আলেম। এই একমাস পূর্বে শহীদ করা হয়েছে হরকাতুল ইসলামীর আমীর আল্লামা মোহাম্মদী কারীকে। তাছাড়া আল্লামা আব্দুল্লাহ্ ওতাইয়ূ এবং আল্লামা আব্দুল্লাহ্ আল-কারী প্রমুখ প্রাজ্ঞ আলেমসহ

হাজারো দেশবরেণ্য আলেম বর্তমানে জেলে। তাঁদের অপরাধ একটিই- তাঁরা ইসলামকে ভালোবাসেন এবং দেশে ইসলামী শাসনের স্বপ্ন দেখেন।

ঃ সফলতার প্রতি আপনারা কতটুকু আশাবাদী?

তাহের জান ঃ আল-হামদু লিল্লাহ্। আল্লাহ্র উপর বিশ্বাস রেখে বলতে পারি, ইনশাআল্লাহ্ আমরা একদিন বিজয়ী হবো এবং উজবেকিস্তানে ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠিত হবে। ইসলাম করিমভ এর সাথে গোটা বিশ্বের ইহুদি শক্তি থাকলেও আমাদের সাথে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ আছেন। আল্লাহ্ পাক বিশ্ব মুসলিমের মধ্যে যে ঈমানী শক্তি দিয়েছেন, তা অন্য কারো নেই। মুসলিম উম্মাহর শুধু সংঘবদ্ধতার অভাব।

ঃ উজবেকিস্তানে বর্তমান ইসলামী আন্দোলন কি আপনি শুরু করেছেন?

তাহের জান ঃ না। আজ থেকে পঞ্চাশ বছর পূর্বে হরকাতুল ইসলামীর জন্ম। এটা আমি শুরু করিনি। আমাদের পূর্বসূরী বিজ্ঞ আলেমগণ তা শুরু করেছিলেন। তবে পূর্বে এ সংগঠনের তৎপরতা গোপনে চলত। এ সংগঠনের দায়িত্বপ্রাপ্ত আলেমগণ শহীদ হওয়ার পর এক পর্যায়ে আমার উপর দায়িত্ব অর্পিত হয়।

ঃ আপনি নিজের নেতৃত্বের উপর কতটুকু আস্থাশীল?

তাহের জান ঃ আস্থা ও ভরসা সম্পূর্ণ আল্লাহ্র উপর। তবে আমার সামনে দু'টি পথ ঃ

এক. হয় বিজয়।

দুই. নয় আকাবিরের মতো শাহাদতবরণ।

ঃ বর্তমানে উজবেকিস্তানে মাদ্রাসার সংখ্যা কত?

তাহের জান ঃ কম্যুনিস্ট শাসনের শুরুতেই মাদ্রাসাসমূহ বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল। আমাদের ত্যাগী আলেমগণ পাহাড়ের উপর গর্ত করে এবং মাটির নিচে মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করে দ্বীনি শিক্ষা অব্যাহত রেখেছিলেন। আমি নিজেও দ্বীনি শিক্ষা অর্জন করেছি সেরকম এক মাদ্রাসায়। বর্তমানেও মাটির নিচের মাদ্রাসাগুলো চালু আছে। এখনো প্রকাশ্যে খালেস দ্বীনি মাদ্রাসা পরিচালনা করা সম্ভব হচ্ছে না।

ঃ সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্যান্য মুসলিম এলাকায় আপনাদের তৎপরতা কেমন চলছে?

তাহের জান ঃ চেচনিয়াসহ প্রায় সব ক'টি মুসলিম অধ্যুষিত এলাকায় আমাদের কাজ চলছে।

ঃ চেচনিয়ার বর্তমান অবস্থার উপর কিছু বলবেন কি?

তাহের জান ঃ চেচনিয়া সম্পর্কে আমার কিছু বলা উচিত নয়। তাদের নিজস্ব কিছু ব্যাপার আছে। আমি শুধু একথা বলতে পারি, গোটা উম্মতের জন্য চেচনিয়া এক নিয়ামত। সোভিয়েত ব্লকে ইসলামের তৎপরতা বৃদ্ধির পেছনে চেচনিয়ার প্রচুর অবদান আছে।

ঃ সময় দেয়ার জন্য আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ।

তাহের জান ঃ আপনি যে আমাদের কথা বাঙ্গালী ভাইদের কাছে পৌঁছাবেন, তাই আপনাকেও ধন্যবাদ।

কাশ্মীর জিহাদের কমাণ্ডার ইলিয়াস কাশ্মীরীর সাক্ষাৎকার

মোহাম্মদ ইলিয়াস কাশ্মীরী জম্মু ও কাশ্মীরের একটি স্বশস্ত্র সংগঠনের কমাণ্ডার ইন চীফ। ছোটবেলা থেকেই কাশ্মীরের পরিস্থিতি তাঁকে জিহাদের দিকে অনুপ্রাণিত করলেও গ্রাজুয়েশন পাস করে মাস্টার্স ডিগ্রীতে ভর্তির পর তিনি সক্রিয় জিহাদে অংশগ্রহণ করেন। এরপর থেকে আছেন এই পথে। আমার কাবুল অবস্থানকালে এক সংক্ষিপ্ত সফরে তিনি কাবুলে এসেছিলেন। এই সুযোগে তাঁর সাথে দেখা। আমি বাংলাদেশী শুনে বুকে জড়িয়ে ধরে চোখের পানি প্রবাহিত করলেন। স্মৃতিচারণ করলেন তাঁর শ্রদ্ধাভাজন উস্তাদ শহীদ কমাণ্ডার আব্দুর রহমান ফারুকীর কথা। দীর্ঘ আলাপ হলো। একসাথে এক প্লেটে বসে খাওয়া-দাওয়া হলো। জানতে চাইলাম কাশ্মীরের বর্তমান অবস্থার কথা।

বললেন : আলহামদু লিল্লাহ্! কাশ্মীরের মুজাহিদরা বর্তমানে অনেক শক্তিশালী। জম্মু ও কাশ্মীর এই দু'টি অঞ্চল নিয়ে গঠিত বৃহত্তর কাশ্মীর। প্রথমে আমরা জম্মুকে হাতে রেখে কাশ্মীরে কাজ শুরু করেছিলাম। শত্রুরা যখন তাদের সকল শক্তি কাশ্মীরে নিয়োগ করলো, তখন আমরা জম্মুতে কাজ শুরু করি। সেই প্রথম অবস্থা থেকে বর্তমান অবস্থা অনেক উন্নত। শত্রুরা দিন দিন পরাজয়ের দিকে চলেছে। গত বছর ফ্রন্টে থাকা অবস্থায় ভারতীয় এক কর্নেল আমার কাছে পত্র লিখে। যাতে সে অনুরোধ করেছে, 'দেখ, আমাদের চাকরি মাত্র সাত-আট মাসের হয়ে থাকে। দয়া করে এই সাত-আট মাস তুমি তোমার এলাকায় কাজ করো, আমি আমার এলাকায়। তোমার সাথে আমরা কোন খারাপ ব্যবহার করবো না। তুমিও আমাদের দিকে সুনজর রেখো।' এ থেকেই প্রমাণিত হয় ভারতীয় সৈন্যরা আতংকিত। বাস্তবে মানসিকভাবে তারা অত্যন্ত দুর্বল। আন্তর্জাতিক কুফরী শক্তি যদি ভারতকে সহযোগিতা না করে, তবে উলট-পালট হওয়া সময়ের ব্যাপার মাত্র।

ঃ ১৯৪৭ সাল থেকে আজ পর্যন্ত কাশ্মীর সমস্যা অব্যাহত আছে। সেখানে মুজাহিদদের তৎপরতাও আমরা লক্ষ্য করছি। অথচ আজ পর্যন্ত সমস্যার সমাধান হচ্ছে না। আফগানিস্তান অল্পদিনে রাশিয়ার মতো পরাশক্তিকে পরাজিত করল। আপনারা তাদের মত সফলতা দেখাতে পারছেন না, কারণ কি?

ঃ গেরিলা যুদ্ধের সাফল্যের ব্যাপারটা কোন সময় সীমার মধ্যে আটকানো যায় না। ঘুণপোকা যেমন আস্তে আস্তে খেয়ে ভেতরে ভেতরে নষ্ট করে, তেমনি গেরিলা যুদ্ধও আপনগতিতে চলে। গেরিলা যুদ্ধের পাঁচটি স্তর রয়েছে। কাশ্মীর জিহাদ বর্তমানে তৃতীয় ও চতুর্থ স্তরে রয়েছে। তৃতীয় স্তরের নাম হচ্ছে 'হিট এণ্ড রান'। চতুর্থ স্তরে রয়েছে 'মোর্চাবন্ধ'—যার পিছনে শক্তি থাকে আর সামনে থাকে শত্রু। দেখুন আল-জাজায়ের দীর্ঘ

ত্রিশ বছর যুদ্ধের পর স্বাধীনতা পেয়েছে। গেরিলা যুদ্ধে সময় লাগলেও সফলতা একদিন আসে। কাশ্মীর যুদ্ধ যত দীর্ঘ হচ্ছে, ভারতের ততই ক্ষতি হচ্ছে। কাশ্মীর গেরিলাদের প্রভাবে ভারতের ভেতর দারুণ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। যেদিন কাশ্মীর স্বাধীন হবে, সেদিন দেখবে ভারতের ভেতর আরও অনেক কাশ্মীরের জন্ম হয়ে গেছে।

ঃ আমরা দেখতে পাচ্ছি, কাশ্মীরের স্বাধীনতাকামীরা বিভিন্ন গ্রুপে বিভক্ত। কেউ গণতন্ত্রের কথা বলছেন। কেউ ভারত থেকে পৃথক হয়ে উভয় কাশ্মীর নিয়ে স্বাধীন কাশ্মীরের কথা ভাবছেন। কেউ ভারত থেকে পৃথক হয়ে পাকিস্তানের সাথে মিলে যাওয়ার কথাও বলছেন। কেউ কাশ্মীরে পূর্ণাঙ্গ ইসলাম প্রতিষ্ঠার কথা বলেন। কেউ বলেন শুধু স্বাধীনতার কথা। আপনাদের বক্তব্য কি?

ঃ আমাদের আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে কাশ্মীরে মুসলিম নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা। আমরা কোন প্রকার জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী নই। হাদীসে এসেছে, ‘সকল মুসলমান ভাই-ভাই’। তাই গোটা বিশ্বের মুসলমান আমাদের দৃষ্টিতে সমান। আমরা চাই সকল মুসলমান এক প্লাটফর্মে এসে দাঁড়াক।

ঃ কাশ্মীর লিবারেশন ফ্রন্টের নেতা চৌধুরী আমানুল্লাহ্ কাশ্মীরে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কথা বলছেন। গণতন্ত্র সম্পর্কে আপনাদের মতামত কি?

ঃ দেখুন, গণতন্ত্রের দর্শন হচ্ছে, ‘গভর্নমেন্ট অব দ্যা পিপল বাই দ্যা পিপল এণ্ড ফর দ্যা পিপল।’ আমরা মনে করি এ কথাগুলো সঠিক নয়। এর মাধ্যমে একজন সৎ ব্যক্তির সাথে একজন জঘন্য ব্যক্তির ব্যবধান থাকে না। গণতন্ত্রে একজন বুজুর্গ শায়খুল হাদীসের যে মূল্য, একজন জঘন্য জাহেল ব্যক্তিরও সেই মূল্য। বাস্তবে তা হতে পারে না। এটা প্রকৃতিরও খেলাফ। জন্মগতভাবে যদিও সবাই সমান, কিন্তু তাক্বওয়াহ্ বলে একটা বিষয় আছে। তাক্বওয়াহ্ হচ্ছে আল্লাহ্‌র ভয়। তাই একজন পরহেজগার ব্যক্তির সমান একজন পাপিষ্ঠ হতে পারে না। এ জন্যই এই গণতন্ত্রে আমরা বিশ্বাসী নই। এটা ইসলামী দর্শনকে অবদমিত রাখার উদ্দেশ্যে ইহুদি-খৃষ্টানদের একটি কৌশল। যেখানেই গণতন্ত্র দেখবেন, সেখানেই পাবেন শুধু ধোঁকা আর ধোঁকা। ইসলাম কোন প্রকার ধোঁকাকে প্রশ্রয় দেয় না। তাই আমরা গণতন্ত্রে বিশ্বাস করি না।

ঃ কাশ্মীর ইস্যুতে জাতিসংঘের প্রস্তাব ছিলো গণভোটের। তা এখনও কার্যকর হয়নি। এরপর জাতিসংঘের ভূমিকা কি?

ঃ জাতিসংঘ বাস্তবে স্বাধীন কোন সংস্থার নাম নয়। মূলত তা ইহুদি-খৃষ্টানদের তৈরী একটি প্লাটফরম। এটা একটা প্রাণহীন ঘোড়া, যার মালিক হচ্ছে আমেরিকা, বিশেষ করে ইহুদিরা। শুরু থেকে আজ পর্যন্ত জাতিসংঘের সমস্ত ভূমিকা ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে। দেখুন কিভাবে বসনিয়া, কসোভো, ফিলিস্তিন, কাশ্মীর, চেচনিয়ায় মুসলমানদেরকে হত্যা করা হলো, হচ্ছে। অথচ কেউ হত্যাকারীকে কিছু জিজ্ঞেসও করছে না। কিন্তু আমেরিকার কিছু হলে জাতিসংঘে হৈ চৈ শুরু হয়ে যায়।

ইরাকের সামান্য ভুলে গোটা বিশ্ব গর্জে উঠলো। এ থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, জাতিসংঘ হল মুসলিম দমনের এক মহাযন্ত্র। এটাকে ইউনাইটেড ন্যাশন না বলে ইউনাইটেড অব কুফ্ফার বলতে পারেন। এটা ক্রুসেডের পর মুসলমানদের ধোঁকা দেয়ার জন্য গঠন করা হয়েছে। জাতিসংঘ আমাদেরকে কি হেফাজত করবে? আল্লাহ্র সাহায্য সাথে নিয়ে আমাদের হেফাজতের ব্যবস্থা আমাদেরকেই করতে হবে।

ঃ জেহাদের পথে আপনার আগমন কিভাবে হলো?

ঃ দেশের অসহনীয় পরিস্থিতি ছোটবেলা থেকেই আমাকে জেহাদের প্রেরণা দিচ্ছিলো। কিন্তু 'হুব্বুদ দুনিয়া' ছিলো প্রতিবন্ধক। কলেজে গ্রাজুয়েশন করার পর মাস্টারস্ ডিগ্রীর জন্য ভর্তি হই। তখন বিশ্ব মুসলমানের অবস্থা বিশেষ করে আফগানিস্তানের করুণ অবস্থা আমার হৃদয়ে প্রচণ্ড আঘাত করলো। হরকতুল জিহাদের মাধ্যমে আমি প্রথম জিহাদে আসি। আমার সৌভাগ্য যে, তখন এ সংগঠনের কমাণ্ডার ছিলেন শহীদ মুফতী আব্দুর রহমান ফারুকী (রঃ)। (চোখের পানি মুছতে মুছতে) তাঁর শিষ্যত্ব আমার সৌভাগ্য হয়েছিল। তাঁর কাছে ছিলো শুধু মহব্বত আর মহব্বত। তাঁকে দেখলে হযরত সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)-এর কথা স্মরণ হয়ে যেতো। এই মহান মুজাহিদের মহব্বত আর এখলাসিয়্যাত আমাকে জিহাদের পথে চিরবন্দী করে রাখে।

ঃ শহীদ কমাণ্ডার আব্দুর রহমান ফারুকী (রহঃ) আপনার উস্তাদ ছিলেন। তিনি বাংলাদেশের ছেলে। ছোটবেলা তাঁর অতি নৈকট্যলাভের সৌভাগ্য হয়েছে আমারও। ছাত্র-শিক্ষক হিসেবে তাঁর সাথে আমার আত্মার আত্মীয়তা ছিলো। তাঁর সম্পর্কে একটু বলবেন কি?

ঃ কিছু লোককে আল্লাহ্ পাক দুনিয়ায় বিশেষ বিশেষ জ্ঞান ও গুণ দিয়ে প্রেরণ করেন বলে আমার বিশ্বাস। প্রত্যেক লোকই দুনিয়ায় আসে। কিন্তু এ থেকে কিছু লোককে আল্লাহ্ বিশেষ মর্যাদা দিয়ে থাকেন। আমি মনে করি, শহীদ কমাণ্ডার আব্দুর রহমান ফারুকী আল্লাহ্র পক্ষ থেকে এক বিশেষ নেয়ামত ছিলেন। যার পদস্পর্শে এ পৃথিবীর অনেক অঞ্চলের মানুষের জিহাদ সম্পর্কে ধারণা পাল্টে গেছে। তিনি এমন অনেক মানুষকে জিহাদের পথে এনেছেন, যারা পথভ্রষ্ট ছিলো। তিনি এক মহান জেনারেল ছিলেন। ইসলামের এক হিরো ছিলেন। সেই সময়ের উসামা বিন লাদেন ছিলেন।

ঃ কি ভাবে?

ঃ দেখুন কোথায় বাংলাদেশ আর কোথায় আফগানিস্তান। তিনি বাংলাদেশ থেকে এখানে এসে সর্বপ্রকার জাতীয়তাবাদের ঊর্ধ্বে উঠে আমাদেরকে নেতৃত্ব দিয়েছেন। আজ উসামা বিন লাদেন বা আমরা যা বলছি, বিশ্ব মুসলিম গণজাগরণের জন্য ঐ সময় মুফতী আব্দুর রহমান ফারুকী তা-ই বলতেন। তিনি ছিলেন আল্লাহ্ কর্তৃক প্রেরিত বিশেষ

ব্যক্তিত্ব। রাশিয়ার কম্যুনিষ্ট সৈন্যদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রথম যেদিন ময়দানে গেলাম, সেদিন এক জাদরেল কমাণ্ডারের প্রতি আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হলো। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলাম, যুদ্ধের পর এই কমাণ্ডারের সাথে পরিচিত হব। এমন সময় আমার গায়ে গুলি এসে বিঁধলো। আমি আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারলাম না। মাটিতে পড়ে গেলাম। কমাণ্ডার সাহেব পাশে এসে বললেন, 'পেরেশান নেহি হোনা, পেরেশান নেহি হোনা।' এরপর তিনি সামনে চলে গেলেন। প্রচণ্ড লড়াই হল। আমার পাশে ছিলো রহমতুল্লাহ্ (বাংলাদেশী, হযরত হাফেজ্জী হুজুরের (রহঃ) নাতি), তার গায়েও গুলি লাগলো। সে মাটিতে পড়ে গেল। উচ্চ আওয়াজে কালেমা শরীফ পাঠ করে সাথে সাথে শহীদ হয়ে গেল। আমার নাকে এমন সুগন্ধ এসে লাগলো যে, মনে হলো আতর-গোলাপের প্লাবন বইছে। আমি আহত অবস্থায় রহমতুল্লাহ্র পাশে গেলাম। পকেট থেকে রুমাল বের করে তার রক্ত মুছে দিলাম। তার সেই রক্তমাখা রুমালটা এখনো আমার কাছে আছে। যা হোক, প্রচণ্ড যুদ্ধের পর মুজাহিদরা বিজয়ী হলো। ক্যাম্পে কমাণ্ডার সাহেব আমার পাশে এসে দাঁড়ালেন। হাসলেন। একটি কবিতা আবৃত্তি করলেন- 'আয় খোদা তেরি উলফত মে জিন্দেগী ইউ গুজারা করেঙ্গে

আমি কবিতা ভালবাসতাম না। কিন্তু এই কবিতা আমার হৃদয়কে এতই স্পর্শ করল যে, এরপর থেকে তা প্রায়ই আবৃত্তি করি। এই কবিতা পাঠ করলে আমার শহীদ কমাণ্ডার আব্দুর রহমান ফারুকীর কথা স্মরণ হয়ে যায়। চোখে অশ্রু এসে যায়। সাথীদেরকে বলি, এটা আমার মাহবুবের সুর। সেদিন যুদ্ধে মোট ২৮ জন আহত হয়েছিলো। কিন্তু কমাণ্ডার সাহেব আমার পাশে এসে কবিতা আবৃত্তি করে তাঁর অকৃত্রিম মহব্বতের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছিলেন। এটা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে আমার প্রতি ছিলো এক নেয়ামত। আব্দুর রহমান ফারুকী এমন এক মহান কমাণ্ডার ছিলেন, আল্লাহ্র কসম, সারাজীবন যদি তাঁর কথা বলি, তবু শেষ হবে না। মন চায় সারাজনম তাঁর কথা বিরতিহীনভাবে বলেই যাই। আমার ধারণা, তিনি ফেরেশতা প্রকৃতির লোক ছিলেন। তাঁকে নিয়ে বাংলার ইতিহাস গর্ব করতে পারে।

ঃ বাংলাভাষী মুসলমানদের প্রতি আপনার কোন কথা আছে কি?

ঃ বাংলাদেশী মুসলমানদের সচেতন হওয়া উচিত। বিশ্ব কাফেরদের কুদৃষ্টি বর্তমানে বাংলাদেশের প্রতি। আমরা কাশ্মীরীরা বাংলাদেশী মুসলমানদের ভাই। বাংলাদেশী মুসলমানদের উচিত আমাদের এই সংকটময় মুহূর্তে আমাদের পাশে এসে দাঁড়ানো। আমি কাশ্মীরের মজলুম নির্যাতিত মানুষগুলোর পক্ষ থেকে বলছি, বাংলাদেশীদের স্মরণ রাখতে হবে, কাশ্মীরের স্বাধীনতার উপর অনেকটা নির্ভর করছে ভারতের আশ-পাশের দেশগুলোর স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও নিরাপত্তা।

সুলতান মাহমুদ গজনী (রহঃ)

দিল্লির সোমনাথ মন্দির এক সময় হয়ে উঠলো ব্রাহ্মণ শোষকদের অপকর্মের কেন্দ্রবিন্দু। ধর্মের পৈতা-তিলক লাগিয়ে পুরোহিতেরা সাধারণ মানুষকে শোষণ, নির্যাতন, নারী হরণ, নারী ধর্ষণ করতে লাগলো। এক সময় নারীলিপ্সু এক লম্পটের হাত একজন মুসলিম যুবতীর প্রতি অগ্রসর হলো। সুলতান মাহমুদ গজনবীর কাছে যখন এ সংবাদ পৌঁছলো যে, দিল্লির সোমনাথ মন্দিরের একজন পুরোহিত কর্তৃক এক মুসলিম নারী ধর্ষিত হয়েছে, তখন তিনি গর্জে উঠলেন। দিল্লির শাসকের কাছে ন্যায্য বিচার দাবী করলেন। শাসকগোষ্ঠী মোটেই কর্ণপাত করলো না তাঁর কথায়। সুলতান মাহমুদ দাঁতভাঙ্গা জবাবের শপথে যুদ্ধের দামামা বাজিয়ে দিলেন। গজনী থেকে দিল্লি অনেক দূর। পাঞ্জাব হয়ে যেতে হয়। দিল্লির শাসক পাঞ্জাবের কিছু মুনাফেক মুসলমানের সাথে আঁতাত করেছিলো। এই মুনাফেকদের বিশ্বাসঘাতকতার ফলে সুলতান মাহমুদকে ষোলবার চেষ্টা করতে হলো দিল্লি পৌঁছতে। সতেরোবারের সময় প্রথমে তিনি পাঞ্জাবের মুনাফেকদেরকে জব্দ করলেন। এরপর দিল্লিতে গিয়ে পৌঁছলেন। দিল্লির শাসক ও পুরোহিতরা দলবদ্ধ হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করলো এবং গজনীর সালতানাতে ট্যাক্স দানের ওয়াদা করলো। সাথে সাথে অনুরোধ জানালো, সোমনাথ মন্দির না ভাঙতে। তিনি তাদের অনুরোধ মেনে নিলেন। সকল আনুষ্ঠানিকতা শেষে তিনি বিশ্রামে গেলেন। স্বপ্নে দেখলেন, মন্দিরের পায়খানার নিচে সংরক্ষিত প্রচুর স্বর্ণ-রৌপ্য। এগুলো সঞ্চয় করা হয়েছে স্থানীয় জনসাধারণের নিকট থেকে শোষণ-নির্যাতন করে। ঘুম ভাঙ্গার সাথে সাথেই নির্দেশ দিলেন, মন্দির ভেঙ্গে সবকিছু বের করে সাধারণ মানুষের মধ্যে বিতরণ করতে। নির্দেশানুসারে তাই করা হলো।

ইরানের বন্দর আব্বাস থেকে শুরু করে তাসখন্দ, বোখারা, উজবেকিস্তান, বেলুচিস্তান, পাঞ্জাবসহ দিল্লি পর্যন্ত সুলতান মাহমুদ গজনীর শাসনের সীমা ছিলো। সেই প্রতাপশালী শাসক, ঐতিহাসিক বিজয়ী যোদ্ধা, আল্লাহ্ ভক্ত সুলতান মাহমুদ ঘুমিয়ে আছেন গজনীর মাটিতে। ১৪ই মার্চ দুপুর একটার সময় তাঁকে দেখতে কাবুল থেকে যাত্রা শুরু করলাম। অন্যায়ের বিরুদ্ধে ইস্পাতকঠিন, কুফরী শক্তির আতংক, মজলুমের বন্ধু সুলতানের সামনে আজ আমাকে দাঁড়াতে হবে। এই ভয়ে আমার অস্তিত্ব কেঁপে উঠলো। কাবুল থেকে আমার রাহবার হলেন জাফর বিন কাসেম। তিনি একজন আলেম-এ-দ্বীন। ভালো আরবী ও উর্দু জানেন। পথে আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি সুলতান মাহমুদ গজনী (রহঃ) সম্পর্কে আল্লামা রুমী (রহঃ)-এর মসনবী থেকে কয়েকটি ঘটনা বললেন ঃ

১. সুলতান মাহমুদ গজনবী (রহঃ) প্রায় রাতে ছদ্মবেশে বের হতেন হযরত উমর বিন খাত্তাব (রাঃ)-এর মতো। জানতে চেষ্টা করতেন প্রজারা কেমন আছে। ঈদের দু'চার দিন বাকী। অভ্যাসানুসারে এক রাতে তিনি বের হয়েছেন। চৌ-রাস্তায় দেখা হলো

চারজন লোকের সাথে। জানতে চাইলেন, আপনারা কারা?

– আমরা মুসাফির। আপনি?

– আমিও আপনাদের মতো। আপনাদের উদ্দেশ্য কি?

– আমরা গরীব লোক। ঈদ এসেছে, পরিবারের জন্য কোন ব্যবস্থা নেই। রুজির চিন্তায় বের হয়েছি।

– আমি-ও। আচ্ছা আপনারা কি কোন উপায় খুঁজেছেন?

– আমাদের মাথায় একটা চিন্তা আছে। তবে তা আপনাকে বলা যাবে না।

– ভয় নেই। যে কোন কাজে আমি আপনাদের সাথে আছি। আমারও টাকার প্রয়োজন।

– আপনার কি যোগ্যতা আছে?

– আগে আপনাদের পরিকল্পনা বলুন?

– আমরা চিন্তা করছি, সুলতানের কোষাগার চুরি করবো! আপনি কি এতে আমাদের সাথে আছেন?

– চুরি করার মতো কি যোগ্যতা আপনাদের আছে?

একজন জবাব দিলো,

– আমি গাধার মতো ডাকতে পারি। চুরির সময় আমি গাধার মতো ডাকলে, পাহারাদার ভাববে–গাধারা নড়াচড়া করছে।

দ্বিতীয়জন বললো,

– আমি এক ঘুষিতে দেয়াল ভেঙ্গে দিতে পারি।

তৃতীয়জন বললো,

– আমি সিন্দুকের উপর হাত রেখে বলতে পারি, এর ভেতর কি আছে। তালাও অনায়াসে খুলতে পারি।

চতুর্থ ব্যক্তি বললো,

– যাকে আমি নিশি রাতে অন্ধকারেও দেখি, তাকে আমি কোনদিন ভুলি না।

ছদ্মবেশী সুলতান বললেন,

– বাহ্! আপনাদের তো দারুণ যোগ্যতা।

– কিন্তু আপনার যোগ্যতা কি, এবার তা বলুন?

– আমার তেমন কোন যোগ্যতা নেই। তবে আমার দাড়ি একটু নড়াচড়া করলেই ফাঁসীর নির্দেশ রহিত হয়ে যায়।

একথা শোনে চারজনই একই সাথে বললো,

–বাহ্! এটাতো দারুণ যোগ্যতা! তাহলে আপনি আমাদের সঙ্গী হতে পারেন।

এবার সবাই সুলতানের কোষাগারের দিকে যাত্রা করলেন। দ্বিতীয় ব্যক্তি ঘুষি মেরে

দেয়াল ভাঙ্গার পূর্বক্ষণে প্রথম ব্যক্তি ঠিক গাধার মতো একবার ডেকে উঠলো। গাধার বিকট চিৎকারে দেয়াল ভাঙ্গার শব্দ মিলিয়ে দিল। পাহারাদার কিছুই টের পেল না। পাঁচজন মিলে ভেতরে প্রবেশ করলো। তৃতীয় ব্যক্তি পর্যবেক্ষণ করে সিন্দুকের তালা খুলে দিলো। সবাই মিলে স্বর্ণ-রৌপ্য নিয়ে বেরিয়ে আসলো এবং ভাগাভাগি করে নিয়ে গেলো।

ভোরে পাহারাদার এসে জানালো, কোষাগার চুরি হয়ে গেছে। কোষাধ্যক্ষ স্বয়ং এ সংবাদটি সুলতানের কাছে নিয়ে আসলেন। সুলতান জানতে চাইলেন, পাহারাদার কোথায় ছিলো? তাকে ডেকে আনো।

পাহারাদার এসে কাচুমাচু করে দাঁড়ালো। সুলতান প্রশ্ন করলেন,

কোথায় ছিলে গত রাতে? কোষাগার যে চুরি গেল!

– জাঁহাপনা! আমি তো পাহারাতেই ছিলাম। গভীর রাতে একটা গাধার ডাক শুনেছি। ভাবলাম, হয়তো কোন গাধা ছোটাছুটি করছে।

– আচ্ছা যাও। অমুক অঞ্চলের অমুক অমুক ব্যক্তির বাড়িতে যাও। তাদেরকে যদি ঘুমন্ত অবস্থায় দেখতে পাও, তবে মনে করবে এরাই এ ঘটনার সাথে জড়িত। ওদেরকে গ্রেফতার করে নিয়ে এসো।

সুলতানের নির্দেশমতো একদল সৈন্য সে অঞ্চলে চলে গেলো এবং চারজনকেই ঘুমন্ত অবস্থায় পেয়ে গ্রেফতার করে নিয়ে এলো। তাদেরকে দরবারে হাজির করা হলো। হাকিম একেক করে চারজনকেই জিজ্ঞেস করলেন, রাষ্ট্রীয় কোষাগার চুরি হয়েছে, আপনারা কি কিছু জানেন? তারা একবাক্যে জবাব দিলো–

–মাননীয় বিচারক! আমরা কিছুই জানি না। শুরু হলো জেরা। শেষ পর্যন্ত তাদেরকে চুরির কথা স্বীকার করতেই হলো। ইসলামী বিধান অনুযায়ী চোরদের হাত কাটার নির্দেশ হলো। এবার হাত কর্তনের আয়োজন শুরু হলো। সুলতান এসে তাঁর আসন গ্রহণ করলেন। সাথে সথে চতুর্থ ব্যক্তি বলে উঠলো, 'জাঁহাপনা! দয়া করে আপনার দাড়িটা একটু নাড়াচাড়া করুন!'

সুলতান মাহমুদ হাসলেন। সত্যিই তিনি দাড়ি নাড়লেন। বিচারের রায় স্থগিত হলো। তিনি তাঁর শাসনের অক্ষমতার কথা বলে দুঃখ প্রকাশ করলেন। এবার বাস্তব ঘটনা সবাইকে খুলে বললেন।

২. আজ আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে মেধাশূন্য করার জন্য স্বয়ং সরকারই ইন্ধন যোগাচ্ছে। অথচ সুলতান মাহমুদ তাঁর দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে মানসম্মত রাখার জন্য রাতের অন্ধকারে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনে যেতেন। একদা এক ছাত্রাবাসে তিনি উপস্থিত হলেন। বিভিন্ন কক্ষে গিয়ে ছাত্রদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে পর্যবেক্ষণ করতে লাগলেন। ছাত্রদের কাছে তাঁর প্রধান প্রশ্ন ছিলো, তোমরা লেখাপড়া কেন করছো? উত্তরে কেউ বলছে চাকরির জন্য, কেউ বলছে মন্ত্রিত্বের আশায় এবং কারো

কারো উদ্দেশ্য সেনাপতি হবে। তবে একটা ছাত্র বললো, আমি আল্লাহ্‌র দ্বীন জানার জন্য লেখাপড়া করছি।

সুলতান এ ছেলেটিকে জড়িয়ে ধরে বললেন, 'বাবা, আজ বড় ক্ষুব্ধ হয়েছিলাম। ইচ্ছে ছিলো এই প্রতিষ্ঠানটি জ্বালিয়ে ভস্ম করে দেবো। কিন্তু শুধু তোমার জন্য সে ইচ্ছা ত্যাগ করলাম। যা হোক, অন্তত একজন তো এখানে মানুষ হচ্ছে।

এই প্রতিষ্ঠানে আমার অর্থদান শুধু তোমার জন্যই সার্থক।

৩. সারাদিন কাজ শেষে সুলতান মাহমুদ ক্লান্ত। বিশ্রাম নিতে এসেছেন নিজ কক্ষে। বিছানার পাশেই আল্লাহ্‌র কালাম। না, আল্লাহ্‌র কালাম কক্ষে রেখে তিনি ঘুমাতে যাবেন না। আয়াজকে বলতে হবে তা অন্য কোথাও নিয়ে রাখতে। তিনি ডাক দিলেন, 'আয়াজ!'

– জ্বি হুজুর!

– এই কোরআন মজীদখানা অন্য কক্ষে নিয়ে যাও।

– জ্বি আচ্ছা।

হুকুম অনুসারে আয়াজ কোরআন শরীফখানা আরেকটি কক্ষে নিয়ে রাখলো। কিন্তু সুলতান মুহূর্তের মধ্যে আবার আয়াজকে ডাকলেন।

– জ্বি হুজুর!

– কোরআন মজীদখানা নিয়ে এসো।

আয়াজ কোরআন মজীদ নিয়ে আসলো।

সুলতান আল্লাহ্‌র কালাম হাতে নিয়ে বলতে লাগলেন, 'তুমি নিজের বিশ্রামের জন্য আল্লাহ্‌র কালাম সরিয়ে দিয়েছিলে। খুব অন্যায় করেছো। হে আল্লাহ্! তোমার গোলাম নিজের বিশ্রামের জন্য তোমার কালাম সরিয়ে যে অন্যায় করেছে, তা তুমি অনুগ্রহ করে মাফ করো।'

এরপর তিনি এ সামান্য অন্যায়ের জন্য আল্লাহ্‌র দরবারে কাঁদতে কাঁদতে সারারাত কাটিয়ে দিলেন। ফজরের নামাযের আযান হয়ে গেল, কিন্তু তিনি আর বিশ্রাম নিলেন না।

৪. সুলতান মাহমুদের অত্যন্ত স্নেহভাজন খাদেম ছিলেন আয়াজ। সুলতান যে কোন কাজে তার পরামর্শ নিতেন। দরবারে অন্যান্যের অভিযোগ ছিলো, আয়াজ একজন সাধারণ চাকর। বুদ্ধিও তার তেমন নেই। অথচ সুলতান সর্বদা তার পরামর্শ নিয়ে কাজ করেন। একদিন সুলতান দরবারে বসেই ঘোষণা দিলেন, 'আজ যে যা ইচ্ছে নিয়ে যাও'।

সবাই যার যার ইচ্ছে মতো চাইলো। শুধু আয়াজ নীরব। আয়াজের এ কান্ড দেখে দরবারের সবাই তার বিরুদ্ধে সুলতানের কাছে অভিযোগ করলো, 'মাননীয় সুলতান! আমরা বলেছিলাম না যে, আয়াজের বুদ্ধি-সুদ্ধি নেই। আজ মহাসুযোগ আসলো। আয়াজ চাইলে দু' এটা জায়গীর নিয়ে ভবিষ্যৎ জীবনের সুব্যবস্থা করে নিতে পারতো।'

সুলতান ভাবলেন, সত্যিই তো। তিনি আয়াজকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কি ব্যাপার আয়াজ? তুমি যে নীরব?'

আয়াজ মৃদু হাসলো। বললো, 'আমি যা চাইবো সত্যিই কি তা দিয়ে দেবেন জাহাঁপনা?'

– অবশ্যই! আমি কি মিথ্যা বলি?

– না আপনি সত্যবাদী, শুধু জানতে চাইলাম।

– বলেছি যখন, তবে অবশ্যই দেব, বলো কি চাও?

– আমি কিছুই চাই না জাঁহাপনা! শুধু আপনাকে চাই। আয়াজ ধন-সম্পদের কিংবা সুলতানের গোলাম নয়, গোলাম শুধু সুলতানের তাহাজ্জুদ নামাযের। হ্যাঁ সুলতান, আপনি যতোদিন তাহাজ্জুদ নামাজের সময় জেগে উঠে আল্লাহ্‌র দরবারে কাঁদবেন, ততোদিন এই আয়াজ আপনার গোলাম থাকবে। আর যেদিন আপনি আল্লাহ্‌র গোলামী ছেড়ে দেবেন, তখন আয়াজকে গোটা বিশ্বের সম্পদ দিয়েও রাখতে পারবেন না।

এ ঘটনা থেকে আমরা অনুমান করতে পারি, সুলতান মাহমুদ গজনবী আল্লাহ্‌র কত নিকটতম অলি ছিলেন। আর তাঁর খাদেম আয়াজ ছিলেন একজন উচ্চ পর্যায়ের পরহেজগার মুত্তাকী ব্যক্তি। এক সময় এই আয়াজকেই সুলতান মাহমুদ গজনবী (রহঃ) তাঁর রাজ্যের অর্থমন্ত্রীর দায়িত্ব দিয়েছিলেন। হিংসুকরা তা সহ্য করতে না পেরে আয়াজের ক্রটি-বিচ্যুতি খুঁজতে থাকে।

একসময় বিরাট এক ক্রটি তারা আবিষ্কার করে ফেললো। দলবদ্ধ হয়ে তারা সুলতানের কাছে এসে অভিযোগ করলো, 'জাহাঁপনা! আয়াজ প্রত্যহ রাতে একা একা কোষাগারে ঢুকে দরোজা বন্ধ করে কিছু একটা করেন বলে সন্দেহ হয়।'

সুলতান প্রথম দিকে এতে কর্ণপাত করলেন না। কিন্তু অভিযোগের মাত্রা যখন দিন দিন বৃদ্ধি পেতে লাগলো তখন বাধ্য হয়ে ব্যাপারটি সম্পর্কে আয়াজকে জিজ্ঞেস করলে আয়াজ বললেন ঃ

– জাহাঁপনা! ঘটনাটা কি গোপন রাখা যায় না? বিশ্বাস করুন আমি এমন কোন কাজ করছি না, যাতে রাজ্যের কোন ক্ষতি হতে পারে।

– তা আমার বিশ্বাস আছে। তবুও তোমাকে ব্যাখ্যা দিতে হবে। এ ব্যাপারে অনেকের মনে সন্দেহ রয়েছে।

– জাহাঁপনা! নিশ্চয়ই আপনার মনে আছে, এই আয়াজ এক সময় গোলাম ছিলো। তাকে আজাদ করে রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ পদ অর্থমন্ত্রীর দায়িত্ব আপনিই দিয়েছেন। অনেকের একথা স্মরণ না থাকলেও আমি ভুলতে পারি না–আমার গোলামীর সময়ের একটি জামা আছে। এটি ঐ কোষাগারে রক্ষিত আছে। প্রতি রাতে কোষাগারে ঢুকে আমি ঐ জামাটি পরে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে বলি, হে আয়াজ! তুমি তোমার অতীত জীবনের কথা ভুলে যেয়ো না। একদা তুমি গোলাম ছিলে। আজ তুমি রাজ্যের অর্থমন্ত্রী

হয়েছো। মনে রেখো, আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা ইজ্জত দেন এবং যাকে ইচ্ছা তাকে বেইজ্জত করেন। আল্লাহ্র গোলামী কখনো ভুলে যেয়ো না। অনেকের কাছেই আয়াজের এই উত্তরটি বিশ্বাসযোগ্য হলো না। তাই সুলতান স্বয়ং ছদ্মবেশে কোষাগার পর্যবেক্ষণে গেলেন। বাস্তব অবস্থা নিজে দেখে ভীষণ লজ্জিত হলেন। বললেন, 'হে আয়াজ! তুমি আজ আমাদেরকে উত্তম শিক্ষা দিলে। যে আল্লাহ্ আমাদেরকে একবিন্দু পানি থেকে তৈরি করে সৃষ্টির সেরা করলেন, আজ আমরা তাঁকে ভুলে গেছি।' সুলতান কাঁদতে শুরু করে দিলেন। বললেন, 'হে আল্লাহ্! আমাদেরকে ক্ষমা করো।'

সুলতান মাহমুদ গজনবী (রহঃ)-এর মাজারের পাশেই এক পাহাড়ের উপর শায়েখ আয়াজের কবর।

আকাশ থেকে সূর্য ঢলে পড়ার উপক্রম। এমন সময় আমাদের গাড়ি এসে থামলো সুলতানের দরবারে। প্রায় শ' খানেক সিঁড়ি বেয়ে উঁচু পাহাড়ের উপর উঠলাম। সুলতানের মাজারে দাঁড়িয়ে দোয়া-দরূদ পড়ে নীচে এসে মাগরিবের নামায আদায় করলাম। এরপর করাচীর উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করলাম।

হোটেল আল-হাবীব

উড়োজাহাজের অনিয়ম যে শুধু বাংলাদেশ বিমানের ক্ষেত্রেই ঘটে তা কিন্তু নয়, এটা আমি করাচী হাওয়াই আড্ডায় পৌঁছে বুঝলাম। প্রায় তিন ঘণ্টা বিলম্ব। শেষ পর্যন্ত দুপুরের দিকে ইসলামাবাদ পৌঁছি। তখন বৃষ্টি ঝরছিলো। কায়েদে আজম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর মোহাম্মদ এহসান রিসিভ করতে এসেছেন। তাঁর এক বন্ধুর সাথে আমার বন্ধুত্ব এই হিসাবে তাঁর সাথে পরিচয়। পঞ্চাশোর্ধ্ব এই প্রফেসর মনের দিক থেকে সম্পূর্ণ যুবক। বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশেই তাঁর বাড়ি। ইসলামাবাদের পরিবেশ, প্রকৃতি, বাড়িঘর প্রায় সিলেটের মতো। রাস্তাঘাট অবশ্য অনেক উন্নত। সরকারী প্লান মতো গড়ে উঠা এই শহর অনেকটা আধুনিক। পাতলা বসতি, জনসংখ্যা খুব সীমিত। প্রফেসর এহসান নিজে ড্রাইভ করে আমাদেরকে নিয়ে গেলেন তাঁর বাড়িতে। কথা ছিল হোটেলে থাকার ব্যবস্থা করে দেয়ার। পাকিস্তানের বর্তমান পরিস্থিতিতে তিনি আতংকিত, তাই সকল ব্যবস্থা করেছেন নিজের বাড়িতে। আমি বাংলাদেশের মানুষ, তাই আমার কাছে এসব নতুন কিছু নয়। পাক-ভারত-বাংলার পরিস্থিতিতে ভিন্নতার মধ্যেও অভিন্নতা রয়েছে। পাকিস্তানকে আমি দেখতে এসেছি আমার মতো করে, তাই কারো মেহমান হতে মন চাইলো না। এহসান সাহেবকে বললাম, একটা হোটেলে ব্যবস্থা করে দিতে। তিনি আল হাবীব হোটেলে আমাকে নিয়ে গেলেন। তার মতে হোটেলটা খুব নিরাপদ। কিছুটা ইসলামী পরিবেশ আছে। হোটেলের কাউন্টারে দাঁড়িয়ে বুঝতে অসুবিধা হলো না, এই হোটেলের মালিক পাকিস্তান জামাত-এ-ইসলামীর কোন নেতা বা কর্মীর। কাউন্টারে জামাত নেতা কাজী হোসাইন আহমদের বিরাট ছবি ঝুলানো, ছবিটা শোভিত করা হয়েছে ফুলের মালা দিয়ে। ইসলামী আন্দোলনের ভেতর

এই জাহেলী সংস্কৃতি আমাকে অনেকটা ভাবিত করলো। তবে ভালো লাগলো হোটেলের ভেতর মসজিদ এবং একটি ইসলামী পাঠাগার দেখে।

প্রফেসর মোহাম্মদ এহসানের দৃষ্টিতে একাত্তর

ভদ্রলোক বলতে আমরা যা বুঝি, প্রফেসর এহসান সেই রকম একজন লোক। আক্ষরিক অর্থেই তিনি ভদ্রলোক। ইংল্যান্ডের গ্লাসকো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আন্তর্জাতিক যোগাযোগ বিষয়ে ডিগ্রী নিয়ে বর্তমানে ইসলামাবাদের কায়েদে আজম বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রফেসর হিসাবে আছেন। তাছাড়া তিনি জাতিসংঘের আফগান বিষয়ক একজন কর্মকর্তা। ব্যক্তি হিসাবে অত্যন্ত সচেতন ও পরহেজগার। জাতে পাঞ্জাবী। দীর্ঘ আলাপ হলো তাঁর সাথে। একাত্তর সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য আমাকে অবাক করেছে। দীর্ঘ নিঃশ্বাস নিয়ে বললেন, আমরা ভাই ভাই ছিলাম। আজ পৃথক হয়ে গেছি। যদি সাধারণ নিয়মে পৃথক হতাম তবু কথা ছিলো। বাঙালীরা আমাদেরকে ঘৃণা করে। একাত্তরে আপনাদের সাথে যে অপরাধ করা হয়েছে, তা ক্ষমার অযোগ্য। মবনু সাহাব! আপনারা আমাদেরকে ক্ষমা করে দিন। আপনারা মজলুম। আমরা জালেম। আপনাদের বদ দোয়া আমাদেরকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। আপনি জানেন না, যারা একাত্তরে বাংলায় জুলুম-নির্যাতন করেছে, তাদের বেশির ভাগই আজ পাগল। সত্য একটি কথা বলি, যদিও আমি পাঞ্জাবী, তবুও সত্য বলতে কি? পাঞ্জাবীরা বড় অশিক্ষিত জাতি। এই জাতি তাঁদের অশিক্ষার কারণে সর্বদা অন্যের গোলামী করেছে। তারা বড়ই তাবেদার গোলাম। তারা গোলামী ছাড়া আর কিছু জানে না। দীর্ঘদিন তারা বৃটিশের গোলাম ছিলো। পাঞ্জাবের শিখ কিংবা মুসলমান উভয়ের ক্ষেত্রে একথা সত্য। মনিব যদি তাদেরকে এমন একটা বস্তি জ্বালাতে বলেন, যেখানে তার মা আছে, তবু জ্বালিয়ে দেবে। এ রকম হুকুমের গোলাম বলেই সেনাবাহিনীতে তাদের সুযোগ বেশি। তবে জ্বালানোর পর যদি কেউ বলে, এখানে তোমার মাও ছিলো, তখন কাঁদবে। বিশ্বাস করুন, বাংলার ঘটনার জন্য আজ অনেকেই কাঁদে। আপনারা আমাদেরকে ক্ষমা করে দিন।

প্রফেসর মোহাম্মদ এহসানের কথাগুলো শুনে ভদ্রলোককে শ্রদ্ধা জানাতে ইচ্ছে হলো।

কথাশিল্পী সৈয়দ শাহাদৎ হোসেন ঃ প্রাসঙ্গিক কিছু কথা

ইসলামাবাদ এসেছি মূলত সৈয়দ শাহাদৎ হোসেনের পরিবারের সাথে দেখা করতে। সৈয়দ শাহাদৎ হোসেন ষাটের দশকের বাংলা সাহিত্য জগতের প্রতিভাবান কথাশিল্পীদের একজন। ১৯২৪ সালের ২৪ ডিসেম্বর তৎকালীন সিলেট জেলার জগন্নাথপুর থানার ঐতিহ্যবাহী সৈয়দপুর গ্রামে তাঁর জন্ম। সৈয়দপুর ভাটি অঞ্চলের একটি উন্নত গ্রাম। এই গ্রামে ঘুমিয়ে আছেন সিলেট বিজয়ী বিশ্ববিখ্যাত দরবেশ হযরত শাহ জালাল (রঃ)-এর ৩৬০ সাথী। দরবেশের একজন শাহ সৈয়দ শামসুদ্দিন (রহঃ)।

গ্রামের অধিকংশ লোক এই দরবেশেরই বংশধর। সৈয়দ শাহাদৎ হোসেনও এই দরবেশের বংশধারার লোক। প্রাচীনকাল থেকে এই গ্রামে অনেক কবি, সাহিত্যিক, রাজনীতিবিদ, সমাজকর্মী, সংস্কৃতিকর্মী, আলেম-উলামা, দরবেশের জন্ম হয়ে আসছে। বৃহত্তর সিলেটে (গোটা দেশ বললেও হয়তো ভুল হবে না) সৈয়দপুরের মতো একটি গ্রাম পাওয়া অসম্ভব, যেখান থেকে এত মরমী কবি, আধুনিক কবি, সাহিত্যিক, সমাজকর্মী, আলেম-উলামা, রাজনৈতিক নেতা, সাংস্কৃতিক কর্মীর জন্ম হয়েছে। এ গ্রামের প্রতিথযশা মনীষীদের হাতে প্রকাশিত হয়েছে প্রচুর পদ্য-গদ্যের বই, ম্যাগাজিন ও সাহিত্য পত্রিকা। এখানে রয়েছে চারটি প্রাথমিক স্কুল, শ' খানেক মক্তব, একটি হাই স্কুল, কওমী মাদ্রাসা, আলিয়া মাদ্রাসা, ইতোমধ্যে কলেজও প্রতিষ্ঠিত হতে যাচ্ছে, বেশ ক'টি পাঠাগার, একটি একাডেমী, দু'টি মহিলা মাদ্রাসা, একটি আধুনিক শিশু স্কুলও আছে। সৈয়দপুর সিনিয়র আলিয়া মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয় ঢাকা শ্বিবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার অনেক পূর্বে, অর্থাৎ ১৯০৩ সালে। আর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯২১ সালে। এই সিনিয়র মাদ্রাসা সংলগ্ন একটি মডেল স্কুল রয়েছে। এক সময় এ স্কুলের নাম ছিলো সৈয়দপুর ৭২ নম্বর মক্তব।

এই মক্তবের একজন নিষ্ঠাবান শিক্ষক ছিলেন সৈয়দ এখলাস হোসেন। তিনিই কথাশিল্পী সৈয়দ শাহাদৎ হোসেনের শ্রদ্ধাভাজন পিতা। তাঁর দাদা সৈয়দ তখদ্দুস আলী বৃটিশবিরোধী সিপাহী বিপ্লবের একজন সক্রিয় কর্মী ছিলেন। এ সময় একই গ্রামের বৃটিশবিরোধী আন্দোলনের সক্রিয় কর্মী সৈয়দ শরাফত আলীকে সিপাহী বিপ্লবের 'এজিটেটর' সন্দেহ করে গ্রেফতার করে নিয়েছিলো। সিপাহী বিপ্লবের সময় শাহাদৎ হোসেন মরহুমের দাদা সৈয়দ তখদ্দুস আলীর বয়স ছিলো আনুমানিক ষাট বছর। তিনি ১৯৪৮ সালে মৃত্যুবরণ করেন। দীর্ঘ আয়ুর অধিকারী এই ব্যক্তি গ্রামের সবার কাছে মিয়া সাহেব হিসাবে পরিচিত ছিলেন। সৈয়দ শাহাদৎ হোসেনের চাচা এবং শ্বশুর সৈয়দ তখলিস হোসেন সাহেব ছিলেন ভারত উপমহাদেশের প্রখ্যাত মুহাদ্দিস, রাজনীতিক ও আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব সৈয়দ হুসাইন আহমদ মাদানী (রঃ)-এর খলীফা। সৈয়দ শাহাদৎ হোসেন সাহেবের লেখাপড়া শুরু হয় সৈয়দপুর গ্রামের সিনিয়র মাদ্রাসার নিকটস্থ তৎকালীন ৭২ নম্বর মক্তব (যা বর্তমানে মডেল স্কুল) থেকে। এরপর তিনি চলে আসেন সিলেট শহরে। এখানে তাঁর মামাত বোনের বাসায় থেকে লেখাপড়া করেন। তাঁর মামাত বোনের স্বামী ছিলেন মরহুম এডভোকেট আব্দুল হাফিজ। আব্দুল হাফিজ সাহেবের ছেলে বাংলাদেশের সুপরিচিত অর্থনীতিবিদ এক সময়ের অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আব্দুল মুহিত।

শাহাদাৎ হোসেন সিলেট থেকে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপ্ত করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। সেখান থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে এম.এ ডিগ্রী লাভ করেন। ছাত্র জীবন থেকেই তিনি সাহিত্যের সাথে জড়িত। রাজনীতিতে তিনি কোন

সময়ই ময়দানমুখী ছিলেন না। দর্শনগত দিক থেকে প্রাথমিক জীবনে বাম ধারার সাথে কিছু সম্পর্ক ছিল। কিন্তু সেই ভূয়া দর্শন তাঁকে বেশি দিন আকৃষ্ট করে রাখতে পারেনি। ঐ বলয়ে তাঁর অবস্থান ছিলো ক্ষণকালীন। ষাটের দশকে তিনি তৎকালীন জাতীয় দৈনিক আজাদ পত্রিকায় যোগ দেন। পরবর্তীকালে দৈনিক আজাদের প্রধান সম্পাদকের গুরুদায়িত্ব পালন করেন। আজাদের কর্মজীবনে তিনি প্রখ্যাত সাহিত্যিক আবুল কালাম শামসুদ্দিন, মুজিবুর রহমান খাঁ, আকবর উদ্দিন প্রমুখ ব্যক্তিত্বের সাহচর্য লাভ করেন। মাওলানা আকরম খাঁ-এর দৈনিক আজাদ ছিলো পাকিস্তান আন্দোলনের মুখপত্র। ব্যক্তিগতভাবে মাওলানা আকরম খাঁ মরহুমও ছিলেন মুসলিম লীগের প্রথম সারির নেতা। দীর্ঘ সংগ্রামের বিনিময়ে অর্জিত পাকিস্তান ভেঙ্গে যাক, তা পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতারা কখনো চাননি। স্বয়ং শেখ মুজিবুর রহমানও পাকিস্তান ভাঙ্গার পক্ষে ছিলেন না। তাই আমরা দেখতে পাই, পাক শাসকদের নির্যাতনে অতিষ্ঠ হয়ে মাওলানা ভাসানী যখন বলেছেন, "ভোটের বাক্সে লাথি মার-বাংলাদেশকে স্বাধীন কর" সেই সত্তরের নির্বাচনে শেখ মুজিবের নেতৃত্বে এরপরও আওয়ামী লীগ অংশ নিয়েছে। আবার যখন নির্বাচনের পর সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর না করে আলোচনার নামে প্রহসন চলতে থাকলো, তখন মাওলানা ভাসানী ঘোষণা দিলেন, "কিসের আলোচনা, আমরা চাই স্বাধীনতা।" তখনও শেখ মুজিব হোটেল শেরাটনে ইয়াহিয়া-ভুট্টোর সাথে আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান চেয়েছেন।

১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ শেখ মুজিবুর রহমান পল্টন ময়দানে যে ঐতিহাকি ভাষণ দিয়েছিলেন, তা পর্যালোচনা করলে আমরা স্পষ্ট দেখতে পাই যে, শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি চেষ্টা করেছেন পাকিস্তানকে অবিভক্ত রাখতে। এখনো ৭ই মার্চের ক্যাসেট বাজালে আমরা শুনতে পাই বঙ্গবন্ধুর সেই দরাজকণ্ঠ, "জেনারেল ইয়াহিয়াকে আমি বলেছিলাম, আপনি এসেম্বলী ডাকুন। কিন্তু তিনি আমার কথা শুনলেন না। শুনলেন ভুট্টো সাহেবের কথা।"

এই বক্তব্য থেকে কি স্পষ্ট হয় না যে, ইয়াহিয়া খান যদি ভুট্টোর কথা না শুনে শেখ মুজিবের কথা শুনতেন, তবে ২৫শে মার্চের দুঃখজনক ঘটনার সৃষ্টি হতো না। আর যদি ২৫শে মার্চের গভীর রাতে টিক্কা বাহিনী নরপশুর মতো হামলা না করতো, তবে হয়তো স্বশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে পাকিস্তান বিভক্ত হতো না। মূল কথা হচ্ছে, পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠির স্বৈরাচারী মনোভাব ও শোষণ-নির্যাতনের ফলে বাংলার মানুষ বাধ্য হয়েছে পাকিস্তান থেকে পৃথক হতে। পাকিস্তান যে লক্ষ্য-উদ্দেশ্য নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো, যদি সেখানে সেই কোরআন-সুন্নাহ্র শাসন প্রতিষ্ঠিত করা হত, তবে শোষণ-নির্যাতনের প্রশ্নই উঠতো না।

আর শোষণ-নির্যাতন না হলে বাংলার মুসলিম সমাজ সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে পাকিস্তান থেকে পৃথক হতো না। যে ক'টি প্রদেশ নিয়ে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো,

এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি ভূমিকা রেখেছে পাকিস্তান আন্দোলনে বাংলার মুসলমানরা। ১৯৪০ সালে লাহোরের গোল টেবিল বৈঠকে যে প্রস্তাব পাস করা হয়েছিলো, তা উপস্থাপন করেছিলেন শেরে বাংলা এ, কে, ফজলুল হক, যা ইতিহাসে 'লাহোর প্রস্তাব' নামে খ্যাত। আজকের পাক-বাংলার পৃথক সত্তা লাহোর প্রস্তাবের-ই বাস্তব রূপ। ১৯৪৬ সালে এসে এই প্রস্তাবকে সংশোধন করে 'States' শব্দের পরিবর্তে 'State' প্রতিস্থাপন করে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানকে এক রাষ্ট্র করা হলো। আর এই সংশোধনী প্রস্তাব উপস্থাপনাকারী ছিলেন বাংলার মুসলিম লীগ নেতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী। ১৯৪৬ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার কর্মসূচীর ভিত্তিতে ভারতবর্ষে যে নির্বাচন হয়েছিলো এতে একমাত্র পূর্ব পাকিস্তানে (অর্থাৎ বর্তমান বাংলাদেশে)-ই মুসলিম লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে সফল হয়েছিলো। পাকিস্তান আন্দোলনের জনপ্রিয় শ্লোগান 'লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান' বাংলার শ্রেষ্ঠ কবি ফররুখ আহমদের কবিতার একটি অংশ। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠায় মাওলানা আকরম খাঁ-এর 'আজাদ' পত্রিকার ভূমিকাও উল্লেখযোগ্য।

এ ইতিহাস দীর্ঘ। মোট কথা হচ্ছে, পাকিস্তানের স্বাপ্নিক যদিও আল্লামা ইকবাল, রূপক যদিও চৌধুরী রহমত আলী কিন্তু বাস্তবায়ক বাংলার মুসলমান। যা-ই হোক, আমরা সেই দীর্ঘ ইতিহাসে যাচ্ছি না। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের নেতা-কর্মীগণ শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত চেষ্টা করেছেন অবিভক্ত পাকিস্তান রক্ষার। কিন্তু শাসকদের স্বৈরাচারের ফলে সেই চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। তখন অবিভক্ত পাকিস্তানের স্বাপ্নিকরা বেশ কয়েক ভাগে বিভক্ত হয়ে গেলেন। এর মধ্যে একভাগ বাধ্য হয়ে পাকিস্তানী সৈন্যদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সংগ্রাম গড়ে তুলেছিলেন। এই ভাগের নেতৃত্বে ছিলেন স্বয়ং শেখ মুজিবুর রহমান। অন্য একভাগ অবিভক্ত পাকিস্তান রক্ষার্থে স্বাধীনতাকামীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন। ওরা হচ্ছেন রাজাকার, আল-বদর, আশ্-শামস বাহিনী। আরেক ভাগ ছিলেন যারা স্বার্থ হাসিলের জন্য পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠিকে গোপনে সাহায্য করেছেন, আবার মুক্তিযুদ্ধের উপর ছদ্ম নামে স্বাধীনতার পক্ষেও দু'চার লাইন লিখেছেন। যদি দেশ স্বাধীন হয়ে যায়, তবে তারা যেন বলতে পারেন, আমরাও মুক্তিযোদ্ধা ছিলাম। যেমন-প্রখ্যাত কথাশিল্পী শওকত ওসমান, যার আসল নাম শেখ আজিজুর রহমান। আইয়ূব খানের শাসনামলের সাহিত্য জগতে যদি একটু দৃষ্টিপাত করা হয়, তবে আমরা দেখতে পাবো যে, আইয়ূব তন্ত্রকে প্রতিষ্ঠিত করতে শেখ আজিজুর রহমান অসংখ্য কলাম ও নিবন্ধের সৃষ্টি করেছিলেন, তেমনি তিনি শওকত ওসমান নামে স্বাধীনতার পক্ষেও দু'চার কথা লিখেছেন। আরেক ভাগ আছেন যারা পাক স্বৈরতন্ত্রকে সর্বাত্মক বুদ্ধিভিত্তিক সহযোগিতা করেছেন এবং বিনিময়ে চাকরি ও পদ পেয়েছেন। যেমন ইয়াহিয়ার মার্শাল'ল আমলে পাকিস্তানের শিক্ষামন্ত্রী এবং স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের আমলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এফিসিয়েন্সি কমিটির সদস্য শামসুল হক সাহেব। এ কাতারে আরো রয়েছেন-বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের আহ্বানের পরও পাকিস্তানের সরকারী মিডিয়ায়

ঈমানদারীর সাথে দায়িত্ব পালনকারী প্রখ্যাত কবি শামসুর রাহমান, মুনাইম খানের পরামর্শদাতা কবির চৌধুরী প্রমুখ। আরেক ভাগ ছিলো যারা স্বৈরতন্ত্রকে ঘৃণা করতেন, স্বৈরতন্ত্রের বিরোধিতা করতেন, কিন্তু স্বপ্নের পাকিস্তান ভেঙ্গে যাক তা কামনা করতেন না। আবার পাক শাসকগোষ্ঠির সাথেও সম্পর্ক ভালো ছিলো না তাদের। কারণ, এরা আদর্শের প্রশ্নে জীবনের কোন অংশে কারো সাথে আপোষ করেননি। এই শ্রেণীর-ই একজন কথাশিল্পী সৈয়দ শাহাদৎ হোসেন। তিনি মেনে নিতে পারেননি দীর্ঘ সংগ্রামের বিনিময়ে অর্জিত পাকিস্তান বিভক্ত হয়ে যাক। কবি ফররুখ আহমদকেও এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা যায়। কিন্তু ফররুখের বৈচিত্র হচ্ছে তিনি শত প্রতিকূলতার মধ্যেও ঢাকা ছাড়েননি। একাত্তরের পরও তিনি ঢাকায় ঘরের দরজা খুলে বসার মতো ঈমানী সাহস রাখতেন। সৈয়দ শাহাদৎ হোসেন কিন্তু একাত্তরের ডিসেম্বরের দিকে বাংলা ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন।

হয়তো তিনি চাইলে শওকত ওসমান, কবির চৌধুরী, শামসুল হক, শামসুর রাহমান প্রমুখের মতো আজ পোশাক পরিবর্তন করে মুক্তিযোদ্ধা সেজে স্বাধীনতার পদক গ্রহণ করতে পারতেন। নতুবা কবি ফররুখ আহমদের মতো নিজের আদর্শের উপর দৃঢ় থেকে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বাংলাদেশেই থাকতে পারতেন। কিংবা শাহ আজিজ, শামসুল হুদা প্রমুখের মতো বড় দলে যোগ দিয়ে মন্ত্রী-এম,পি হতে পারতেন। কিন্তু তিনি এসব সুযোগ গ্রহণ না করে চিরদিনের জন্য পাকিস্তানে চলে গেলেন। রাজনৈতিক দৃষ্টিতে যদিও এটা পরাজয়। কিন্তু বাস্তব সত্য যে, নিজের আদর্শ–বিশ্বাসের প্রতি দৃঢ় ব্যক্তিত্বের পরিচয়ে তিনি বিজয়ী। পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের এক সময়ের স্পীকার, মুসলিম লীগ নেতা বাংলার সিংহ পুরুষ ফজলুল কাদের চৌধুরী সম্পর্কে বাংলাদেশের বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী কথাশিল্পী অধ্যাপক শাহেদ আলী যে মন্তব্য করেছেন, তা আমার মতে সৈয়দ শাহাদৎ হোসেনের বেলায়ও প্রযোজ্য। শাহেদ আলী বলেছেন, 'ফজলুল কাদের চৌধুরী পাকিস্তানের জন্য সংগ্রাম করেছেন। পাকিস্তানকে গড়ে তোলার জন্য কাজ করেছেন। তাই যখন দেখা গেলো পাকিস্তানের অস্তিত্ব সংকটের মুখে, তখনও পাকিস্তানে তিনি অকুণ্ঠ বিশ্বাসী ছিলেন। তার এই সময়ের ভূমিকা নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। আমরা তার সাথে ভিন্ন মত পোষণ করতে পারি। কিন্তু তার বিশ্বাসকে শ্রদ্ধা না করে পারি না। নিজের বিশ্বাসের জন্য যারা ত্যাগ স্বীকার করে, তারা মানুষের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে।' (দৈনিক ইনকিলাব, ১৮ জুলাই ১৯৯৭)

সৈয়দ শাহাদৎ হোসেন পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে একজন সক্রিয় কর্মী ছিলেন। পাকিস্তানকে তার জন্মের উদ্দেশ্য-লক্ষ্যের দিকে ফিরিয়ে নিয়ে তাকে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। তাই পাকিস্তানের বিভক্তি তিনি মেনে নিতে পারেননি। নিজের জন্মভূমি ত্যাগ করেছেন, কিন্তু বিশ্বাসের সাথে প্রতারণা করেননি। তার মতের সাথে আমাদের ভিন্নতা থাকতে পারে, কিন্তু (অধ্যাপক শাহেদ আলীর মতে) তার বিশ্বাসকে শ্রদ্ধা না

করে পারি না। একজন দৃঢ় আদর্শবাদী হিসাবে তিনি শ্রদ্ধা পাওয়ার যোগ্য। জানি না সৈয়দ শাহাদৎ হোসেন কখনো চেষ্টা করেছেন কি-না পাকিস্তান থেকে ফিরে আসার। হয়তো করেছেন, হয়তো করেননি। তবে আমার ধারণা মতে, যিনি নীতি এবং আদর্শের প্রশ্নে দেশ ত্যাগ করেছিলেন, তিনি কখনো ফিরে আসার চেষ্টা করবেন না। দেশের অসংখ্য বন্ধু-বান্ধব, শুভানুধ্যায়ী, আত্মীয়, নিকটাত্মীয়ের জন্য তাঁর মন অবশ্য উতালা হওয়ার কথা।

সে যাই হোক, গত ২৮ শে ফেব্রুয়ারি ১৯৯৭ সালে পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদে সৈয়দ শাহাদৎ হোসেন জীবনের শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ছিলো ৭৩ বছর। ইসলামাবাদে তাঁর স্ত্রী এবং এক ছেলে ও মেয়ে শাহীন ও শাহনাজ রয়েছেন। ষাটের দশকের বাংলা সাহিত্যের সুধীমহল অবশ্যই স্বীকার করবেন যে, সৈয়দ শাহাদৎ হোসেন একজন প্রতিভাবান কথাশিল্পী ছিলেন। যারা গল্প-উপন্যাসে নিজেদের প্রতিভার বিকাশ ঘটাতে পারেন, তাদেরকেই তো প্রতিভাবান কথাশিল্পী বা কথা সাহিত্যিক বলা হয়। আমরা যদি সৈয়দ শাহাদৎ হোসেনের 'সাঝের বেলার কাহিনী', 'যত কথা যত গান', 'বাঁকে বাঁকে বয়ে যায়', 'ছায়া লোকের খেলা' প্রভৃতি উপন্যাস অধ্যয়ন করি, তবে তাঁর প্রতিভার প্রচুর স্বাক্ষর পাবো। এই উপন্যাসগুলো এক সময়ে বাংলা সাহিত্য জগতে প্রচুর সাড়া জাগিয়েছিলো। মানচিত্র কিংবা রাজনৈতিক দৃষ্টিতে বিবেচনা না করে আমাদের উচিৎ তাঁকে সাহিত্যিক হিসাবে বিবেচনা করা। এর দ্বারা বাংলা সাহিত্যের সমৃদ্ধ ভাণ্ডার আরো শ্রীমন্ডিত হবে। বিশ্বব্যাপী বিস্তৃত বাংলা সাহিত্যের সেতু বন্ধনের কথা আমরা অনেকেই বলে থাকি। অথচ এখানে সবার আদর্শ, লক্ষ্য, রাজনৈতিক দর্শন, মানচিত্র এক নয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম, মীর মোশাররফ হোসেন, ড. মোহম্মদ শহিদুল্লাহ, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, বঙ্কিম চন্দ্র, ঈশ্বর চন্দ্র থেকে শুরু করে আজকের ফররুখ আহমদ, সৈয়দ আলী আহসান, আল-মাহমুদ, শামসুর রাহমান, গাফফার চৌধুরী, সুনিল, সমরেশ, ড. আশরাফ সিদ্দিকী, দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, দিলওয়ার, আব্দুল মান্নান সৈয়দ, আফজাল চৌধুরী প্রমুখ পর্যন্ত সবার চিন্তা, বিশ্বাস, মানচিত্র কিন্তু এক নয়। তবু ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় মেনে নিতে হবে, এঁদের সাহিত্যকর্ম বাংলা সাহিত্য ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে। এঁদেরকে বাদ দিয়ে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস অসম্পূর্ণ। তেমনি সৈয়দ শাহাদৎ হোসেন মরহুমের সাহিত্য কর্মকে অস্বীকার করা যাবে না। বাংলা সাহিত্যের বিশাল ভাণ্ডারকে আরো সমৃদ্ধ করতে আমাদের জানা প্রয়োজন, বোঝা প্রয়োজন, সংগ্রহ করা প্রয়োজন সৈয়দ শাহাদৎ হোসেনের সাহিত্য কর্ম। আমাদের যাদের সুযোগ আছে তাদের উচিৎ পাকিস্তানে তাঁর ছেলের সাথে যোগাযোগ করে মরহুমের সকল সাহিত্য কর্ম সংগ্রহ করা। তাঁর একটি কবিতা বার বার আমাদেরকে সেই আহ্বান করছে ঃ

"স্বপ্নগুলোকে ছাড়িয়ে আবেশে
হাওয়ায় উড়েছে দিন কয়েক;
ভিসার মেয়াদ ফুরায় কোন ফাঁকে
দালালের খপ্পরে
ভূয়া মেয়াদ নিয়ে ফেরার পথে ধরা পড়ে
সেই থেকে আমার কবিতাকে জেলে বসে
দু'চোখের জলের কলসে
কতো কি যে ভাসায় আর হাসায়
কয়দী বেশে মলিন মুখে
কবিতা আমায় কাটায় শোকে
ফিরে হয়তো আসবে আবার
ডেকে নেই যদি
নতুবা থেকে যাবে আজীবন কয়েদী।"

ব্যক্তিগত জীবনে তিনি নিজের বিশ্বাসের উপর দৃঢ় থেকেও ভিন্ন মতের প্রতি সহিষ্ণুতা প্রদর্শনে ছিলেন উদার। তা ছাড়া মিষ্টভাষী, অমায়িক ব্যবহার এবং বন্ধুবৎসল হিসাবে তিনি ছিলেন সবার পরিচিত।

বাংলা সহিত্যের নবীন ও প্রবীণ গবেষকদের কাছে সর্বশেষ আকুতি, রাজনৈতিক ও মানচিত্রগত কারণে বাংলা সাহিত্যের এই উজ্জ্বল প্রতিভাকে অবহেলা কিংবা উপেক্ষা করা উচিৎ নয়। তার ঔজ্জল্য থেকে আমাদের সকলের উপকৃত হওয়া প্রয়োজন।

যা-ই হোক, হোটেল থেকে ফোন করলাম সৈয়দ শাহাদৎ হোসেনের বাসায়। অপর প্রান্ত থেকে আওয়াজ এলো – হ্যালো। আপ কোউন হে?

ভাবলাম হয়তো ভুল নম্বর। আবার হৃদয়টা কেঁপে উঠলো একথা ভেবে, বাংলা সাহিত্যের কথাশিল্পীর পরিবার হারিয়ে যাচ্ছে উর্দুর ভেতর। নম্বর ভুল হওয়ার সম্ভাবনা খুব কম। তাহলে মেয়েটা কে? শাহাদৎ হোসেনের সাথে তার সম্পর্ক কি? মেয়ে। ছেলে বউ? তারাও কি বিলেত প্রবাসীদের মতো ত্যাগ করছে নিজের মাতৃভাষা, বাপ-দাদার ভাষা। দীর্ঘ ভাবার সময় নেই। ওদিক থেকে আবার হ্যালো শব্দ হলো। প্রতি উত্তরে বললাম ঃ

– এধার শাহীন ইয়া শাহনাজ হে? হাম বাংলাদেশ সে আয়া-উনহ্ কা রিসতাদার।

– আমি-ই শাহনাজ। আপনার নাম?

– চিনবেন না। আপনার আম্মাকে দিন। এভাবেই কথা শুরু হলো। এক গ্রামের লোক, তাই পরিচয় পর্বে বেশি সময় নষ্ট হলো না। শাহীন বাসায় ছিলেন না। তিনি একটি বেসরকারী ব্যাংকের সহকারী ম্যানেজার। ঘরে ফিরে সংবাদ পেয়ে সরাসরি হোটেলে এলেন। নিয়ে গেলেন তাদের বাড়ীতে। দেখলাম শাহাদৎ হোসেন সাহেবের

স্মৃতিময় অনেক কিছু। বেশ কিছু পাণ্ডুলিপিও রয়েছে। শাহীন চেষ্টা করছেন সেগুলো প্রকাশের। শাহীনের আম্মা আমার নানীর বাল্যবান্ধবী। ছোট বেলার অনেক স্মৃতিচারণ করলেন। শুদ্ধ বাংলায় কথা বলতে পারেন তাদের ঘরের সবাই। তবে সিলেটি ভাষা আস্তে আস্তে ভুলে যাচ্ছেন। তারা সবাই বাংলাদেশের কথা ভাবেন। কিন্তু ফিরে আসার কোন ভাবনা নেই। রাত প্রায় এগারোটার দিকে তাদের বাসা থেকে বিদায় নিয়ে হোটেলে ফিরে এলাম।

মেজর (অবঃ) সোলেমানের সাথে দেখা

প্রফেসর এহসানের কাছে মাহমুদ আলীর সন্ধান চাইলে মেজর (অবঃ) সোলেমানের নাম আলোচনায় আসে। তিনি একজন বাঙ্গালী। পাক আর্মীতে ছিলেন। একাত্তরেও তিনি পাকিস্তানের পক্ষে কাজ করেছেন। বর্তমানে স্থায়ীভাবে পাকিস্তানে আছেন। ২১শে মার্চ সকালে তাঁর সাথে দেখা। বিরাট কক্ষের অফিস। দু' চারজন সাক্ষাৎপ্রার্থী আছেন। সবার শেষে আমার অবস্থান। জানতে চাইলেন কি চাই?

পরিচয় দিয়ে উদ্দেশ্য বললাম। হয়তো ভাবলেন, আমিও তাঁর মতো পাকিস্তানপন্থী। দীর্ঘ আলোচনায় তাঁর ভুল ভাঙ্গে। কথায় সচেতনতা দেখাতে শুরু করেন। তাঁর এক সময় জামাতে ইসলামীর সাথে সম্পর্ক ছিলো। বর্তমানে তাঁর ধারণা জামাতে ইসলামী বিভ্রান্ত। আলোচনার মাধ্যমে স্পষ্ট হলো তিনি লন্ডনের ব্যারিস্টার আজহার গ্রুপের সাথে সম্পর্ক রাখেন। ব্যারিস্টার আজহার গ্রুপ শুধু স্বাধীনতাবিরোধী নয় বরং এখনো বাংলাদেশকে 'পূর্ব পাকিস্তান' বলে থাকে। বাংলাদেশ হওয়ার তিন দশক পরও এমন ছেলেমানুষী সত্যিই হাস্যকর। সবচাইতে আশ্চর্য লাগে, যখন দেখি ওরা পাকিস্তানের বিরোধিতার সাথে ইসলামের বিরোধিতা সংযুক্ত করেন। অথচ নিজেদের মধ্যে ইসলাম নেই। ইসলাম আর পাকিস্তান যে এক জিনিস নয়, তা তাদের বোঝার শক্তি নেই। তারা বাংলাদেশকে মুসলিম দেশ হিসাবেও মানতে রাজী নয়। অথচ আমার বাস্তব অভিজ্ঞতা পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশে ইসলামের চর্চা বেশি হয়। মেজর (অবঃ) সোলেমানের সাথে বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রশ্নে, ইসলামী রাজনীতির নীতিগত দিক নিয়ে, বর্তমান বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে বেশ তর্ক-বিতর্ক হয়। এই তর্ক-বিতর্কের সময় তিনি বেশ ক'বার উত্তেজিতও হয়েছেন। তিনি আমাকে পাকিস্তানের বাবা সাহেব নামীয় এক পীরের ঠিকানা দিয়ে বললেন দেখা করতে। এই পীরের সাথে না-কি হাসিনা, খালেদা, এরশাদ, বেনজীর, নেওয়াজ, বাজপেয়ী প্রমুখের সম্পর্ক আছে। শুনে আমি ভয় পেলাম। হয়তো পীর নয়, কোন গডফাদার হবে।

ফয়সল মসজিদের পাশে ঘুমিয়ে আছেন প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হক

ইসলামাবাদের বাদশা ফয়সল মসজিদ দেখার বড় ইচ্ছে ছোটবেলা থেকে। মেজর (অবঃ) সোলেমানের অফিস থেকে বেরিয়ে একটা টেক্সী নিয়ে চলে আসি ফয়সল মসজিদে। উঁচু পাহাড়ের গা ঘেঁষে উঁচু উঁচু মিনারের মসজিদটি সত্যিই আকর্ষণীয়। মসজিদ তো আর শুধু মসজিদ নয়। বর্তমানে একটা পর্যটন এলাকা। ফলে মসজিদের

মর্যাদা ও আদব মোটেও রক্ষা পাচ্ছে না। বেপর্দা নারীদের অবস্থান চোখে পড়ার মতো। টেক্সী ড্রাইভারের ভাষ্য মতে, সন্ধ্যার পর কিছু কিছু দু' নম্বর নারীদেরকেও এখানে দেখা যায়। ঐতিহাসিক বাদশা ফয়সল মসজিদ পাকিস্তানের সাবেক প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হক সৌদী সরকারের অর্থ সাহায্যে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাই বাদশা ফয়সলের নামে-এর নামকরণ।

মসজিদের পাশেই মরহুম জিয়াউল হকের কবর। পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টদের মধ্যে যে ব্যক্তি নিজের দেশে এবং মুসলিম বিশ্বে সর্বজন শ্রদ্ধেয় ছিলেন, তিনি মরহুম জিয়াউল হক। মুসলিম বিশ্বের স্বার্থে তিনি অনেক কিছুই করেছেন। আফগানিস্তানের স্বাধীনতা আন্দোলনে জিয়াউল হকের অবদান সবার জানা। আজো পশতু ভাষায় জিয়াউল হকের নামে অসংখ্য গজল–কাসিদা আবৃত্তি হচ্ছে। পাকিস্তান আজ বিশ্ব দরবারে যে একটা শক্তি হিসাবে মথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে, তার মূল অবদান মরহুম জিয়াউল হকের। জিয়াউল হকই পাকিস্তানের প্রথম প্রেসিডেন্ট, যিনি বাংলাদেশের বন্যা দুর্গত মানুষের পাশে এসে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করেছেন–"দেশ ভাগ হলেও আমাদের রক্ত ভাগ করা যাবে না।" জিয়াউল হকের মৃত্যুতে বাংলাদেশেও শোকের ছায়া দেখা গেছে। একটু শ্রদ্ধা দেখাতে, একটু মাগফেরাত কামনা করতে এক সময় এসে দাঁড়ালাম জিয়াউল হকের কবরের পাশে। ফুলে ফুলে সাজানো কবর দেখে মনে হলো এটিও বুঝি কবর পূজারীর দখলে। একজন খাদেমও আছেন। একের পর এক আসছেন, জিয়ারত করছেন, আবার ফিরে যাচ্ছেন। এভাবেই চলছে।

পাকিস্তানের প্রখ্যাত বুদ্ধিজীবী ও রাজনীতিক মাহমুদ আলীর সাথে কিছু সময়

'ALI BROTHERS OF SUNAMGONJ' কথাটি বৃটিশ শাসিত ভারত বিশেষ করে আসাম প্রদেশে অত্যন্ত পরিচিতি লাভ করেছিলো। মাহফুজ আলী, মোজাহেদ আলী, মহদ্দর আলী ও মনোত্তর আলী তৎকালীন স্থানীয় এবং জাতীয় রাজনীতির সাথে সম্পর্কিত চার ভাই। তাদের পিতা মুশাররফ আলী ছিলেন সুনামগঞ্জের একজন সুপরিচিত আইনজীবী। মাহফুজ আলী স্থানীয় রাজনীতিতেও অত্যন্ত জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন। মোজাহেদ আলী রাজনীতির সাথে সম্পর্কিত থাকলেও মূলত তিনি শিক্ষা ও সাহিত্যের সেবায় নিয়োজিত ছিলেন। বিএ পাস করে তিনি সিলেট আলিয়া মাদ্রাসায় শিক্ষকতা শুরু করেন। 'ঈদুল আজহা' ও 'ঝঙ্কার' নামে তাঁর দু'টি বইও প্রকাশিত হয়। মহদ্দর আলী EAC ছিলেন। চাকরিরত অবস্থায়ই মারা যান। ভাইদের মধ্যে মনোত্তর আলী দীর্ঘদিন বেঁচে ছিলেন এবং বিজ্ঞ রাজনীতিবিদ ও অভিজ্ঞ পার্লামেন্টারিয়ান হিসাবে খ্যাতি লাভ করেছিলেন। ১৯২১ সালে প্রথমে তিনি সুনামগঞ্জ লোকাল বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান এবং পরে মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। এই সময়েই তিনি আসাম ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্বাচিত হন। বিশের দশকে তিনি খেলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন। পরে তিনি মুসলিম লীগে যোগ দিয়ে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে বিশেষ অবদান রাখেন। সাদুল্লা মন্ত্রী সভায় দুইবার আসামের মন্ত্রী ছিলেন। ১৯৪৭ সালে ভারত ভাগ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তিনি আসাম ব্যবস্থাপনা পরিষদের সদস্য ও মুসলিম লীগ পার্লামেন্টারী পার্টির সেক্রেটারী ছিলেন। পাকিস্তান হওয়ার পর পূর্ব পাকিস্তান ব্যবস্থাপনা পরিষদের প্রথম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। ১৯৫১ সালে তাঁর মৃত্যুর পর পাকিস্তানের রাজনীতির এই শূন্যস্থান পূরণ করতে এগিয়ে আসেন তাঁর আপন ভাই মোজাহেদ আলী মরহুমের ছেলে মাহমুদ আলী।

মাহমুদ আলী অল্প বয়সে পিতৃহারা হওয়ায় বড় হয়েছেন চাচা মনোত্তর আলীর তত্ত্বাবধানে। ফলে, ছোট বেলা থেকেই তিনি রাজনৈতিক দিক থেকে বিজ্ঞ হয়ে উঠেন। অন্যদিকে তাঁর দেহে ছিল বিদ্যোৎসাহী ও সাহিত্যিক পিতা মোজাহেদ আলীর রক্ত প্রবাহিত। তাই তিনি সাহিত্যের দিকেও মনোযোগী ছিলেন। তাঁর সম্পাদনায়ই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো তৎকালীন 'নও বেলাল' পত্রিকা। বর্তমানে (১৯৯৯ ইং)-ও তিনি পাকিস্তানে নিয়মিত প্রকাশ করেন The concept নামে একটি মাসিক ম্যাগাজিন।

মাহমুদ আলী তাঁর রাজনৈতিক জীবনে খুব ঘনিষ্ঠভাবে সংস্পর্শ পেয়েছেন প্রথমত নিজ চাচা মনোত্তর আলীর। এরপর শেরে বাংলা এ কে এম ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, খাজা নাজিম উদ্দিন, লিয়াকত আলী খান, মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী প্রমুখের।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে যুবনেতা হিসাবে তিনি অত্যন্ত সুপরিচিত ছিলেন। আইয়ুব খানের সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে যে নয়জন নেতা পত্রিকায় বিবৃতি দিয়েছিলেন, তাদের অন্যতম মাহমুদ আলী। আইয়ুববিরোধী আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় বাংলার স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্ম হলেও মাহমুদ আলী এদিকে অগ্রসর হননি। ফলে একাত্তরে বাংলাদেশের জন্ম হলেও মাহমুদ আলী আর নিজ জন্মভূমিতে ফিরে আসেননি এবং আসতে চেষ্টাও করেননি। আজো তিনি বাংলাদেশকে পূর্ব পাকিস্তান বলেন। স্বপ্ন দেখেন শেরে বাংলার প্রস্তাবিত পাকিস্তানের। তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে তেমন ইসলামের ছাপ দেখা না গেলেও মনে-প্রাণে মুসলিম জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী। বয়স অনেক হয়েছে। এখনো পাকিস্তানের রাজনীতিতে সক্রিয়। আজীবন প্রতিমন্ত্রীর পদমর্যাদা ছাড়াও মাহমুদ আলী এক সময় পাকিস্তানের পূর্ণ মন্ত্রী ছিলেন।

যদিও মাহমুদ আলী বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে ছিলেন, তবুও অস্বীকার করা যাবে না পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতির ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় তাঁকে বাদ দিয়ে রচনা করা যাবে না। মাহমুদ আলী এক সময় এ গ্রহ ছেড়ে চলে যাবেন। কোনদিন যদি তাঁকে ইতিহাসের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয়, তবে এক পক্ষের জবানবন্দীতেই রায় ঘোষণা করতে হবে। তাঁর ব্যাপারে সঠিক পর্যালোচনা না-ও হতে পারে। আগামী দিনের ইতিহাসের বিচারকদের সাহায্যার্থে রাজনীতিক মাহমুদ আলীর জবানবন্দী সংগ্রহের জন্য ২১শে মার্চ ১৯৯৯ সালে বিকাল চারটায় উপস্থিত হলাম তাঁর ইসলামাবাদের পার্ক রোডস্থ বাসায়। পূর্বে যোগাযোগ করা হয়েছিলো বলে তিনি অপেক্ষায় ছিলেন। আমি প্রথমে শুদ্ধ বাংলায় কথা শুরু হলেও যখন তিনি জানতে পারলেন আমি সিলেটের ছেলে, সাথে সাথে বুকে জড়িয়ে নিলেন। এক হাত দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে জানতে চাইলেন, সিলেট কি কিছু উন্নত হয়েছে? সিলেটের প্রবীণ অনেকের সম্পর্কে জানতে চাইলেন। হাসতে হাসতে বললেন "আইজ খুব খুশি লাগের অনেক দিন বাদে সিলেটী ভাষায় মাততাম পাররাম করি।" এরপর তিনি উর্দু, বাংলা, ইংরেজী, সিলেটী মিশ্রিত করে আমার বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন। প্রথমে আমি জানতে চাইলাম, আপনি কি আর বাংলাদেশে যাবেন না?

চোখের পানি মুছতে মুছতে বললেন, যাওয়ার মতো অবস্থা হলে যাব। অর্থাৎ-যে কারণে ছেড়েছি সেই কারণ সংশোধিত হলে যাব।

আমি জানতে চাইলাম ঃ কারণটা কি?

মা.আলী ঃ পাকিস্তান ভেঙ্গে যাওয়া।

ঃ নিজের জন্মভূমি, মাতৃভূমি ত্যাগ করার জন্য এটা কি যথেষ্ট কারণ।

মা.আলী ঃ তোমরা যারা পাকিস্তানের জন্ম দেখনি, তারা বুঝবে না পাকিস্তানের কি প্রয়োজন ছিলো? কেন আমরা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা করেছিলাম?

ঃ বিষয়টা একটু খুলে বলবেন কি?

মা.আলী ঃ পিছন থেকে বলতে হয়। ১৭৫৭ সালে ইংরেজ বণিকরা ধোকাবাজী, ষড়যন্ত্র ইত্যাদির মাধ্যমে ভারত উপমহাদেশের পূর্বাংশ দখল করে নেয়। সেই সময়ে আজকের বাংলাদেশের মতো এত ছোট বঙ্গদেশ ছিলো না। সিরাজ-উদ-দৌলা যে বাংলার নবাব ছিলেন, তা ছিলো বিশাল। নবাব সিরাজকে ক্ষমতাচ্যুত করতে একদিকে ছিলো ইংরেজদের প্রবঞ্চনা, কূটকৌশল, অন্যদিকে ইংরেজদেরকে হিন্দু বণিকদের সহযোগিতা এবং সর্বশেষে নবাবের সেনাপতি মীর জাফরের বিশ্বাসঘাতকতা। এরপর একশ' বছর চলে যায়। একশ' বছর পরও ১৮৫৭ সালে বাহাদুর শাহ্ জাফর দিল্লির শাসক ছিলেন। তিনি সর্বশেষ মুসলিম শাসক। তাঁর সাথে বৃটিশদের লড়াই হয়। এই একশত বছরের ইতিহাস ধোঁকাবাজী ও বিশ্বাসঘাতকতার ইতিহাস। শেষ পর্যন্ত ইংরেজরা দিল্লির সিংহাসন দখল করে। ১৭৫৭ থেকে ১৮৫৭ পর্যন্ত বাংগালী মুসলমানরা ইংরেজদেরকে নিস্তার দেয়নি। তারা বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার জন্য লড়াই করেছে। ১৮৫৭ সালে দিল্লির ক্ষমতা হারানোর পর বাকীরা প্রকাশ্যে ময়দানে আসেন। ১৮৮৫ সালে অল ইন্ডিয়া ন্যাশনাল কংগ্রেসের জন্ম হয়। আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে, কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা একজন ইংরেজ। দীর্ঘদিন, অর্থাৎ-উনিশ শতকের প্রথম কয় বছর ইংরেজই কংগ্রেসের সভাপতি ছিলো। ইংরেজদের উদ্যোগে যখন হিন্দুদের মধ্যে মুসলমানদের বিকল্প একটি গ্রুপ তৈরী করা হচ্ছিলো, তখন মুসলমানদের মধ্যেও চিন্তা জাগ্রত হলো আমাদেরও কিছু করা প্রয়োজন। ১৯০৬ সালে উপমহাদেশের প্রতিনিধিদের নিয়ে ঢাকায় নবাব সলিমুল্লাহ বাহাদুরের নেতৃত্বে এক বৈঠক হয়। ঢাকায় একটা শাহবাগ হোটেল আছে না? এটাই ছিলো নবাবের গার্ডেন, যেখানে সম্মেলন হয়। সেই সম্মেলন থেকেই অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগের জন্ম। এর মধ্যে অনেক ঘটনা রয়েছে। কলকাতা অধিবাসী জাস্টিস সৈয়দ আমীর আলী মুসলমানদেরকে সংঘবদ্ধ করার উদ্দেশ্যে ১৯০৬ সালের পূর্বে মোহামেডান এসোসিয়েশন করেছিলেন। তখনই তিনি অনুভব করেছিলেন, একা বাংগালী মুসলমানরা মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষা করতে পারবে না। মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষার্থে সর্বভারতীয় একটি মুসলিম অর্গানাইজেশনের প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যেই মোহামেডানের জন্ম। করাচী, লাহোর, পাঞ্জাবসহ বাংলার বাইরেও অনেক এলাকায় মোহামেডানের শাখা ছিলো। কিন্তু সৈয়দ আমীর আলী প্র্যাকটিস করতে লন্ডন চলে যান। ফলে মোহামেডানের কাজ বন্ধ হয়ে যায়। তবে মোহামেডানের এক্সটেনশন বলা যায় এই অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগকে। নবাব সলিমুল্লাহর নেতৃত্বে যখন মুসলিম লীগের জন্ম হয়, তখন শেরে বাংলা আবুল কাসেম ফজলুল হক যুবক। তিনিই সংগঠনের নীতি-আদর্শের ড্রাফট প্রথম লিখেন। নবাব বিকারুল মুল্‌ক, নবাব মুহসিনুল মুল্‌ক প্রমুখ ব্যক্তিও ইউপি, বিহার থেকে উপস্থিত হয়েছিলেন এই সভায়। তখনো কংগ্রেসের সাথে মুসলমানদের ভালো সম্পর্ক ছিল। মাওলানা মোহাম্মদ আলী জওহর, মাওলানা শওকত আলী, কায়েদে আজম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ, আল্লামা ইকবাল প্রমুখ তখনও কংগ্রেসে।

মাওলানা মোহাম্মদ আলী খেলাফত আন্দোলন শুরু করলে এতে গান্ধীজীও যোগ দেন। অল ইন্ডিয়া কংগ্রেসের এক অধিবেশনে মাওলানা মোহাম্মদ আলী জওহর সভাপতিত্ব করলেন। তবুও মুসলমানরা যখন দেখলো, হিন্দুরা মুসলমানদের কোন অধিকার দিতে রাজী নয়। তখন শুরু হয় ভিন্ন চিন্তা। কংগ্রেসের স্টেইজেই আল্লামা ইকবাল বলেছিলেন- "সারে জাহাঁ সে আচ্ছা/ হিন্দুস্তাঁ হামারা/হাম উস্‌কে বুলবুলি হে/ও গুলিস্থাঁ হামারা।" এই আল্লামা ইকবাল যখন দেখলেন হিন্দুরা মুসলমানদের সাথে বৈষম্য নীতি অনুসরণ করছে, তখন গাইলেন ঃ

"চীন ও আরব হামারা/ হিন্দুস্তাঁ হামারা/ তৌহিদ কী আমানত সীনূ মে হে হামারে।"

এইভাবে ধাপে ধাপে মুসলমানরা অগ্রসর হতে লাগলো। প্রথমে তো শুধু ইংরেজকে শত্রু মনে করা হতো; কিন্তু পরে দেখা গেলো হিন্দুরাও বন্ধু নয়। মাওলানা মোহাম্মদ আলী জওহর বলতেন, "যদি আমি মহানবী হযরত মোহাম্মদ (সঃ)-এর পর কোন মানুষকে শ্রদ্ধা করে থাকি, তবে তিনি মহাত্মা গান্ধী।" কিন্তু যে দিন তিনি বুঝলেন, হিন্দুদের ষড়যন্ত্রের কথা উপলব্ধি করলেন, সেদিন নিজেই ঘোষণা করলেন- "গান্ধীরা চায় না ইন্ডিয়া স্বাধীন হোক। তারা চায় মুসলমানদেরকে হিন্দু মহাসভায় গোলাম করে রাখতে।"

এইভাবে পৃথক চিন্তা শুরু হয়। এরপর দীর্ঘ ইতিহাস। কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ এক প্লাটফরমেও এসেছিলো। মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ কংগ্রেসকে ১৪টি পয়েন্টও দিয়েছিলেন। কিন্তু কংগ্রেস তা গ্রহণ করলো না। এভাবে যেতে যেতে ১৯৪৬ সালে ইংরেজরা কেবিনেট মিশন প্লান দিলো। এতে A, B, C এই তিন গ্রুপের কথা বলা হলো। A আর C গ্রুপে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকা আর এক গ্রুপে অর্থাৎ B তে রেস্ট অফ ইন্ডিয়া। ফলে তারা মেজরিটি হয়ে গেলো। এদিকে যখন ইংরেজ ও হিন্দুরা কিছুতেই মুসলমানদের দাবীতে কর্ণপাত করছিলো না, তখনই (১৯৪০ সালে) পাকিস্তান প্রস্তাব পাস হয়ে যায় লাহোরের মুসলিম লীগ অধিবেশনে। কিন্তু এরপরও ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত অখণ্ড ভারতের চেষ্টা করা হয়। সে দিনগুলোর প্রায় সকল মিটিং-এ আমি উপস্থিত ছিলাম। ১৯৪৬ সালের কেবিনেট মিশন প্লান মুসলিম লীগ ও কংগ্রেস উভয়ই গ্রহণ করে নেয়। কিন্তু জওহর লাল নেহেরু কংগ্রেস কমিটির মিটিং-এ বলেছিলেন, "মুসলমানদের দাবী সময় সাপেক্ষে বিবেচনা করা হবে।" জিন্নাহ বুঝলেন ওরা মুসলমানদেরকে কিছুই দেবে না। নিজেদের দাবী নিজেদেরই আদায় করতে হবে। যে কোনভাবে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

ঃ পাকিস্তান প্রস্তাবে তো বাংলাদেশের কথা ছিলো না?

মা.আলী ঃ পাকিস্তান রেজুলেশন পড়লে দেখতে পাবে শেরে বাংলার বক্তব্যে ছিলো- "আমরা ভারত উপমহাদেশে মুসলমানদের একটি শক্তি সঞ্চয় করতে চাই। আর তা তখনই সম্ভব যখন সংঘবদ্ধ হয়ে চেষ্টা করবো। নতুবা সম্ভব হবে না।" শেরে বাংলা

অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন। গোটা ভারতবর্ষে তাঁর তুল্য উকিল খুব কম ছিলো। যদি হিন্দু ধর্মের মতো ইসলামেও দেবতা তৈরীর বিধান থাকতো, তবে বাংগালী মুসলমানেরা শেরে বাংলাকে দেবতা মানতো। বাংগালী সমাজে তিনি অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিলেন। সেই লোক বাংগালীর স্বার্থের বিরুদ্ধে কোন কদম উঠাতে পারেন না। উঠানওনি। জীবনে যা করেছেন, বাংগালীর জন্যই করেছেন। আর লাহোর প্রস্তাবটাই ছিলো পাকিস্তানের মূল ভিত্তি।

ঃ শেরে বাংলার লাহোর প্রস্তাবানুসারে তো পাকিস্তান হয়নি?

মা.আলী ঃ লাহোর প্রস্তাবানুসারে আন্দোলন শুরু হলে হিন্দুরা প্রশ্ন উপস্থাপন করলো, জিন্নাহ কয়টি পাকিস্তান চায়? এই প্রশ্নের ভেতর ছিলো হিন্দুদের বিরাট ষড়যন্ত্র। শহীদ হোসেন সোহরাওয়ার্দী এই ষড়যন্ত্রকে মাটির সাথে মিশিয়ে দিলেন দিল্লির রেজুলেশন পাস করে। আর সেই অনুসারেই পাকিস্তানের জন্ম।

ঃ দিল্লির রেজুলেশনে কি ছিলো?

মা.আলী ঃ বৃটিশরা ১৯৪৬ সালে সর্বভারতে একটি নির্বাচন দিয়ে বললো, এতে যদি মুসলিম লীগ বিজয়ী হয়, তবে বোঝা যাবে, মুসলমানরা পাকিস্তান চায়। সেই নির্বাচনে যুক্ত বাংলায় মুসলমানদের শতকরা ৯৭টি ভোট মুসলিম লীগের পক্ষে যায়। যে সকল এলাকায় মুসলিমরা সংখ্যালঘু, সেখানেও মুসলমানদের প্রায় সকল ভোট মুসলিম লীগের পক্ষে আসে। লাহোর প্রস্তাবে বলা হয়েছিলো, ভারত মহাদেশের উত্তর পশ্চিম ও উত্তরপূর্ব এলাকায় যেখানে মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা রয়েছে, সেই দু'এলাকা নিয়ে পাকিস্তান হবে। লাহোর প্রস্তাবে ছিলো এই দুই অঞ্চলের পাকিস্তান স্বাতন্ত্র বৈশিষ্ট্য নিয়ে দাঁড়াবে। শুধু বিশেষ বিষয়ে ঐক্য থাকবে। কিন্তু হিন্দুরা এর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু করলে শহীদ হোসেন সোহরাওয়ার্দী প্রস্তাব করেন উভয় পাকিস্তানকে এক কেন্দ্রের অধীনে নিতে।

ঃ আমরা জানি পাকিস্তানের স্বপ্নদ্রষ্টা ছিলেন আল্লামা ইকবাল এবং এর নক্সা তৈরী করেছেন চৌধুরী রহমত আলী। স্বপ্ন ও নক্সায় নাকি বাংলাদেশ ছিলো না। আমাদের প্রশ্ন, পরে এই বাংলাদেশ যুক্ত হলো কিভাবে?

মা.আলী ঃ অজ্ঞরাই এসব বাজে কথা বলে। যারা অধ্যয়ন কম করেছে, তারাই এসব বলতে পারে। ১৯২৩ ইংরেজীতে আল্লামা ইকবাল এক ভাষণে 'বাই দ্যা ওয়ে' বলেছিলেন। তা ছিলো শুধু ধারণা। স্পষ্ট কোন কথা ছিলো না। পাকিস্তান রেজুলেশন পাশ হয়েছে ১৯৪০ সালে। চৌধুরী রহমত আলীর নক্সায় ছিলো ভারতবর্ষে তিনটি মুসলিম রাষ্ট্রের কথা। (১) হায়দারাবাদ ইত্যাদি নিয়ে নিজামীস্তান। (২) বাংলা ও আসাম ইত্যাদি নিয়ে বাংগীস্তান। (৩) পাঞ্জাব, সিন্ধু, বেলুচি ইত্যাদি নিয়ে পাকিস্তান।

পাকিস্তানের উল্লেখ লাহোর রেজুলেশনেও ছিলো। এই পাকিস্তান নামের জনপ্রিয়তা তখনই আসে, যখন লাহোর রেজুলেশন পাস হওয়ার পর হিন্দুরা চিৎকার শুরু করলো, "লাহোর রেজুলেশনের অর্থই পাকিস্তান।"

ঃ পাকিস্তান শব্দের ভেতরও তো বাংলা নেই?

মা.আলী ঃ অনেক কিছুই তো নেই। PAKISTAN হলো P দিয়ে পাঞ্জাব, K দিয়ে কাশ্মীর এবং স্তান আনা হয়েছে বেলুচিস্তান থেকে। এখানে সিন্ধের নাম নেই। বিষয়টা তোমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যাবে চৌধুরী রহমত আলীর পাকিস্তান সম্পর্কিত বই পড়লে। দেখ ১৯৪০-এর পূর্ব পর্যন্ত বিভিন্ন সময় বিভিন্ন কথা এসেছে। কিন্তু এগুলোর কোন অর্থ নেই। মূল কথা হয়েছে ১৯৪০-এর লাহোর অধিবেশনে। তোমরা নিশ্চই হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর কথা জান। তিনি কিভাবে আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব আবিষ্কার করেছিলেন। সূর্য, চন্দ্র, পাহাড় যা দেখেছেন প্রথমে ওসবকে আল্লাহ্‌ ভেবেছেন। কিন্তু এগুলো যখন মিলিয়ে যেতো, তখন ভাবতেন, না আরো শক্তিশালী কেউ আছেন। এভাবেই তিনি প্রকৃত আল্লাহকে জেনেছিলেন। তেমনি পাকিস্তানও অস্তিত্বে এসেছে খণ্ড খণ্ড ভাবনার ভেতর দিয়ে। প্রকৃত পাকিস্তানের ধারণা এসেছে লাহোর অধিবেশনে। এর ভিত্তিতেই আন্দোলন হয়েছে। ইতোপূর্বে কোন আন্দোলন হয়নি। ১৯৪০-এর পূর্বে অর্থাৎ—১৯৩৮ সালে আল্লামা ইকবাল দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে আল্লাহ্‌র সান্নিধ্যে চলে গেছেন।

১৯৩৭ সালে জিন্নাহ সাহেব লন্ডনে থাকাকালীন সময়ে আল্লামা ইকবাল চিঠিতে বলেছিলেন, 'আপনি চিন্তা করে দেখুন, বর্তমান ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলন যে ধারায় চলছে, তাতে মুসলমানদের কোন আগ্রহ নেই এবং থাকতে পারেও না। কারণ মুসলমানরা বিগত দেড়শ' বছরে ইংরেজ কর্তৃক শোষিত হওয়ার কারণে অর্থনৈতিকভাবে একেবারে দুর্বল হয়ে পড়েছে। তারা মানুষের মতো জীবন যাপনের উপযোগী রয়নি। তাদেরকে উদ্ধারের যদি কোন রাস্তা না দেখান, তাহলে তারা স্বাধীনতা যুদ্ধে যোগ দেবে না। মুসলমানদের অবস্থা উন্নত করা সম্ভব, যদি তাদের জন্য পৃথক কোন রাষ্ট্র গড়ে সেখানে ইসলামী অর্থনীতি চালু করা হয়। সর্বভারতে তা মোটেও সম্ভব নয়। জওহর লাল নেহেরু সমাজতন্ত্রের কথা বললেও ভারতে তা সম্ভব নয়। কারণ হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুস্তান বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত। হিন্দু ধর্মশাস্ত্রে মানুষে মানুষে যে ব্যবধানের পদ্ধতি রয়েছে, তা থেকে হিন্দুরা কখনো বেরিয়ে আসতে পারবে না। ফলে ধর্মীয়ভাবেই হিন্দুদের মধ্যে ক্যাপিটেলিজম প্রতিষ্ঠিত। হিন্দুরা এ প্রাচীর কোনদিন ভাংতে পারবে না। কিন্তু ইসলামী শরিয়ত অনুযায়ী যদি সম্পদের মুনসিফানা বন্টন হয়, তবে মুসলমানদের আপত্তি করার কথা নয়। তাই আপনি চেষ্টা করতে পারেন, যাতে হিন্দু ও মুসলমানদের পৃথক পৃথক রাষ্ট্র হয়ে যায়। আর এই আন্দোলনের নেতৃত্ব একমাত্র আপনিই দিতে পারেন।"

আল্লামা ইকবাল যে সমস্ত চিঠি জিন্নাহর কাছে দিয়েছিলেন, তা প্রকাশিত হয়েছে। বাজারে আছে পড়ে দেখতে পার। জিন্নাহ সাহেব তখনো কায়েদে আজম হননি। লন্ডন থেকে ফিরে তিনি মুসলিম লীগের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। এরই মধ্যে আল্লামা ইকবাল মারা গেলেন। তাঁর মৃত্যুর দু'বছর পর লাহোর অধিবেশনে পৃথক রাষ্ট্রের রেজুলেশন পাস হলো।

ঃ আপনাদের দাবী ছিলো মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকাসমূহ নিয়ে পাকিস্তান গঠন। আমাদের প্রশ্ন হলো, যে সব এলাকায় মুসলমানরা সংখ্যালঘু, তাদের অবস্থা কি হতো?

মা.আলী ঃ মুসলিম সংখ্যালঘু এলাকার মুসলমানরা জানতো তাদের জন্য পাকিস্তান হবে না; তবে পাকিস্তান তাদের আশ্রয়স্থল হবে।

ঃ পাকিস্তান আন্দোলনে বাংগালীদের ভূমিকা কেমন ছিলো?

মা.আলী ঃ পাকিস্তান আন্দোলনে বাংগালী মুসলমানদের ভূমিকা ছিল সর্বাগ্রে। বাংগালী মুসলমানরা আগ্রহী না হলে সেদিন পাকিস্তানই হতো না। বাংগালী মুসলমানরা যেভাবে পাকিস্তান আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, পশ্চিম পাকিস্তানের মুসলমানরা সেভাবে পারেনি। যার বাস্তব প্রমাণ ১৯৪৭-এর পূর্বে একমাত্র বাংলায়ই মুসলিম লীগের একক মন্ত্রী পরিষদ ছিল। পাকিস্তানের মূল অংশ পাঞ্জাবেও মুসলিম লীগ-কংগ্রেস যৌথ মন্ত্রী পরিষদ ছিল। আসামেও মুস্মলিম লীগের মন্ত্রী পরিষদ ছিল।

ঃ যে বাংগালী মুসলমান কর্তৃক মুসলিম লীগ ও পাকিস্তানের জন্ম, শেষ পর্যন্ত সেই বাংগালী মুসলমানদের সাথে পাকিস্তানের সংঘাত কেন?

মা.আলী ঃ পাকিস্তানের সংঘাত নয়। সংঘাত শাসক ও নেতাদের। এই সংঘাত শুধু বাংগালী মুসলমানদের সাথে নয়। অন্যদের সাথেও হয়েছে। যেহেতু বাংলা দেড় হাজার মাইল দূরে, তাই তারা এই সংঘাত বেশি উপলব্ধি করেছে।

ঃ পাকিস্তানের উদ্দেশ্য কি ছিলো?

মা.আলী ঃ এখানে দু'টি দিক ছিল। একটা দিক স্পষ্ট হয়ে উঠেছে আল্লামা ইকবাল যে পত্র জিন্নাহকে দিয়ে ছিলেন তাতে। অর্থাৎ ইসলামী অর্থনীতির ভিত্তিতে সম্পদের মুনসিফানা বন্টন। দ্বিতীয়তঃ আমরা যারা আন্দোলন করেছি, তাদের স্বপ্ন ছিলো 'খেলাফত আলা মিনহাজিন নুবুওয়াহ' অর্থাৎ মহানবী (সঃ) মদীনায় যে অর্থনীতি, রাজনীতি, সমাজনীতি, শিক্ষানীতি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, পাকিস্তানেও তা-ই প্রতিষ্ঠিত করা। মোটকথা- এই দুই উদ্দেশ্যেই পাকিস্তানের জন্ম।

ঃ কার্লমার্ক্স দর্শনের মূল কথা হলো, মানুষের প্রধান সমস্যা হলো অর্থনৈতিক। তাই দেখা যায়, কালমার্ক্সের সকল আলোচনা অর্থনৈতিক সীমার ভেতর আবদ্ধ। কম্যুনিস্ট আন্দোলনের মতো কি পাকিস্তান আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য অর্থনৈতিক উন্নয়ন ছিলো?

মা.আলী ঃ না। অন্য বিষয়সমূহও ছিল। কিন্তু মসজিদে যাওয়া, নামাজ পড়া, ইবাদত করার মধ্যে তো কখনো বাধা সৃষ্টি হয়নি। বৃটিশ শাসিত ভারতবর্ষে ইংরেজ ও হিন্দুরা যৌথভাবে মুসলমানদের বেশি ক্ষতি করেছে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে। তাই এটাকে আমরা প্রধান ইস্যু মনে করতাম। অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান একমাত্র ইসলামই দিতে পারে। কার্লমার্ক্স বা সমাজতন্ত্র মানুষের অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান দিতে চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছে। ফলে তাদের অস্তিত্ব আজ ধ্বংসপ্রায়।

ঃ পাকিস্তানের সাথে যোগ দেওয়ার ব্যাপারে পূর্ব পাকিস্তানের অন্য কোন অঞ্চলে গণভোট হলো না, শুধু সিলেটে হলো। এখানে স্বাতন্ত্রটা কি?

মা.আলী ঃ পাকিস্তান আন্দোলনের কারণে আমি তখন জেলে। মুক্তি পেয়ে শুনলাম সিলেটে গণভোট হবে। চলে আসি সিলেটে। ঘটনা হচ্ছে, ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে মুসলিম লীগ সিলেটে বিজয়ী হয়। কিন্তু জওহর লাল নেহেরু এই বিজয়কে অস্বীকার করলেন।

ঃ কোন্ যুক্তিতে?

মা.আলী ঃ মাওলানা হোসাইন আহমদ মাদানীর জমিয়তে-উলামায়ে হিন্দ ছিলো কংগ্রেসের পক্ষে। গোটা সিলেটে তাঁর প্রচুর শিষ্যভক্ত রয়েছে। (আমার দিকে ইংগিত করে) তোমাদের গ্রাম সৈয়দপুরেও মাওলানার প্রচুর ভক্ত ছিলো। সিলেটের নয়া সড়কে মাওলানা নামাজ পড়াতেন। ১৯৪৬-এর নির্বাচনে তিনি মুসলিম লীগের মোকাবেলায় প্রত্যেক আসনে প্রার্থী দেন। অবশ্য একটিতেও বিজয়ী হতে পারেননি। তখন নেহেরু দাবী করলেন, যদিও মুসলিম লীগকে বাহ্যত বিজয়ী মনে হচ্ছে, কিন্তু কংগ্রেস ও জমিয়তের ভোট এক করলে ভারতের পক্ষে ভোটের সংখ্যা বেশি হবে। তাই সিলেটকে ভারতের সঙ্গে রাখা হোক। তখন কায়েদে আজম এই বলে চ্যালেঞ্জ করলেন, আচ্ছা এটাই যদি হয় তোমাদের দাবী, তবে গণভোটের মাধ্যমে পরীক্ষা করে দেখ। সত্যিই গণভোট দেওয়া হলো। প্রথমে আমরা যত ভোট পেয়েছিলাম, গণভোটে তা থেকে অনেক বেশি পেলাম।

ঃ লাহোর অধিবেশনে পাকিস্তান রাষ্ট্রের যে ম্যাপের আলোচনা হয়েছিলো, সে অনুযায়ী কি পাকিস্তান হয়েছে?

মা.আলী ঃ না।

ঃ কেন?

মা.আলী ঃ ইংরেজ ও হিন্দুরা যখন বুঝলো মুসলমানরা সত্য সত্য পৃথক রাষ্ট্র চায়, পাকিস্তান চায়, তখন তারা দাবী মেনে নিলো সত্য, কিন্তু ভাগ-বন্টনের সময় ধোঁকাবাজি করল। আমরা লাহোর রেজুলেশনে বলেছিলাম, ভারতের উত্তর-পশ্চিম ও উত্তর-পূর্ব এলাকার যেখানে মুসলিম মেজরিটি, তা নিয়ে পাকিস্তান হবে। তুমি যদি সে দিনের ম্যাপ দেখ, তবে বুঝবে। আমরা চেয়েছিলাম সম্পূর্ণ সরহদ বা সীমান্ত। সিন্ধু, বেলুচিস্তান, কাশ্মীর, হিন্দুস্তানের উত্তর প্রদেশে একটা অঞ্চল আছে সাহরানপুর– যা পাঞ্জাবের সাথে মুসলিম মেজরিটি হিসাবে ছিল। অন্যদিকে উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে মুসলিম মেজরিটি ছিলো সমস্ত বাংলা, আসাম এবং বিহারের পূর্ণিয়া জেলা, যাদের ভাষাও বাংলা। এই ছিলো আমাদের দাবীর পাকিস্তান। কিন্তু হিন্দু আর ইংরেজ মিলে আমাদের দাবী না মেনে কেটে-ছেঁটে একটা বুঝ দিতে চেষ্টা করলো। পাঞ্জাব কেটে অর্ধেক দিলো পাকিস্তানকে, কাশ্মীরে তো একটা সংঘাত স্থায়ীভাবেই সৃষ্টি করে গেলো। সাহরানপুর দিলোই না।

তেমনি বাংলাকে ভেংগে এক অংশ ভারতকে দিয়ে দিলো। মুর্শিদাবাদ মুসলিম মেজরিটি, কিন্তু তা পাকিস্তানকে দিলো না। আসামের আড়াই থানা কেটে হিন্দুস্তানকে দিল, শুধু সিলেট দিলো পাকিস্তানকে।

ঃ জিন্নাহ সাহেব তা মানলেন কেন?

মা.আলী ঃ প্রতিবাদ করেছেন। শেষ পর্যন্ত বলেছেন, পাকিস্তান যখন স্বীকার করা হয়েছে, তখন একদিন বাকী অংশগুলো আসবেই।

ঃ আসলো তো না, বরং ভাংলো।

মা.আলী ঃ পাকিস্তান হওয়ার এক বছরের মধ্যে জিন্নাহ মারা গেলেন। তাঁর পরে পাকিস্তানের নেতৃত্ব দেওয়ার মতো যিনি যোগ্য ছিলেন, সেই কায়েদে মিল্লাত লিয়াকত আলী খানকেও শত্রুরা ১৯৫১ সালে গুলি করে হত্যা করলো। তোমরা নিশ্চয়ই শুনেছো যে, লিয়াকত আলী খান পূর্ব পাকিস্তানের নির্বাচিত প্রতিনিধি ছিলেন। এরপর প্রধানমন্ত্রী হলেন খাজা নাজিম উদ্দিন। কায়েদে আজমের পর তিনি গভর্নর জেনারেল ছিলেন। প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানের পর তিনি মুসলিম লীগের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। সেই হিসাবে তিনি দলের পার্লামেন্টারী গ্রুপের নেতা ও প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। সেই সময় গোলাম মোহাম্মদ ছিলেন গভর্নর জেনারেল। সে খাজা নাজিম উদ্দিনের মন্ত্রী পরিষদ ভেঙ্গে দিল। যদিও ভেঙ্গে দেওয়ার কোন অধিকার তার ছিল না। এই থেকে শুরু হলো সমস্যা। তুমি জানতে চেয়েছিলে বাংগালীদের সাথে সমস্যা হলো কেন। আসলে সমস্যা শুধু বাংগালীদের সাথে নয় বরং সবার সাথে। খাজা সাহেবের এক অবসরপ্রাপ্ত জজ বন্ধু প্রশ্ন করেছিলো ঃ

খাজা সাহেব, আপকে ছাথ এয়ছা কেউ হুয়া?

তিনি বলেছিলেন- "আমি পাকিস্তানকে পি, এল, ফর এইট্রির গন্ধমের বিনিময় বিক্রি করতে অস্বীকার করেছিলাম। তাই আমাকে বের করে দেওয়া হয়েছে।"

এ কথাটা নোট কর। এটা খাজা সাহেবের নিজের কথা। এখন কথা হলো একজন গণপ্রতিনিধিকে বহিষ্কারের অধিকার তাকে কে দিলো? এটা কোন্ শক্তি? গোলাম মোহাম্মদ পার্লামেন্টের সদস্য পর্যন্ত ছিলো না। সে কোন অধিকারে খাজা সাহেবকে বহিষ্কার করলো? খাজা সাহেবের বক্তব্য থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, গোলাম মোহাম্মদের শক্তির উৎসের কথা। তার শক্তি ছিলো আমেরিকা। পর্দার পেছনে থেকে আমেরিকা কাজ করেছে। তাকে সাহস দিয়েছে আইয়ূব খান। সে ছিলো তখন সেনাবাহিনী প্রধান। বুঝতে পারছো তুমি ব্যাপারটা? আইয়ূব খানের কাঁধে সোয়ার হয়েছিলো আমেরিকা। আমেরিকা ও আইয়ূব মিলে গোলাম মোহাম্মদকে শক্তি দিয়েছে। তাই আইনত অশুদ্ধ কাজ সে করতে সাহস পেয়েছে।

ঃ যদি তা আইনত অশুদ্ধ হয়, তবে খাজা সাহেব বা তাঁর দল এর বিরুদ্ধে আন্দোলনে গেলেন না কেন?

মা.আলী ঃ খাজা সাহেব অত্যন্ত শরীফ আদমী ছিলেন। সেই সময়ে আমি যুবক। নুরুল আমীন সাহেবরা তখন নেতা। আমি নুরুল আমীন সাহেবকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, আপনারা সংখ্যাগরিষ্ঠ থাকার পরও তা সহ্য করতে গেলেন কেন?

তিনি বললেন, আমরা সহ্য করতে চাইনি। খাজা সাহেব এই বলে আমাদেরকে থামিয়ে দিলেন- "যদি তোমরা এ নিয়ে লড়াই কর, তবে সেনাবাহিনীর শাসন এসে যাবে।"

ঃ গোলাম মোহাম্মদের বেআইনী কাজের বিরুদ্ধে কোন মামলা হয়েছিলো কি?

মা.আলী ঃ খাজা সাহেব ক্ষমতার লড়াই-এ-কোর্টে যেতে লজ্জাবোধ করলেন। তবে মৌলভী তমিজ উদ্দিন খান চীফ কোর্টে মামলা করেছিলেন। মৌলভী তমিজ উদ্দিন আমাদের লোক ছিলেন। তিনি বৃটিশবিরোধী খেলাফত আন্দোলনের সময় এবং পাকিস্তান আন্দোলনের সময় জেলে ছিলেন। অত্যন্ত উঁচু মাপের নেতা ছিলেন। পাকিস্তান গণপরিষদের প্রথম প্রেসিডেন্ট কায়েদে আজম এবং দ্বিতীয় প্রেসিডেন্ট মৌলভী তমিজ উদ্দিন খান। চীফ কোর্ট রায় দিল "গোলাম মোহাম্মদ আইন অশুদ্ধ কাজ করে অন্যায় করেছে। তার সিদ্ধান্তকে বাতিল করা হলো।" এরপর আবার আপীল করা হলো। শেষ পর্যন্ত উচ্চ আদালত বললো- যেহেতু CONSTITUTION ASEMLE বাতিল করা হয়ে গেছে, তাই এটাকে আবার ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয়। তাই দ্বিতীয়বার CONSTITUTION ASEMLE গঠন করা হোক। পাকিস্তানে তখনো কোন সংবিধান ছিলো না। দ্বিতীয় CONSTITUTION ASEMLE তে শেরে বাংলা এ কে এম ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, আমি ও শেখ মুজিবুর রহমান মেম্বার ছিলাম। এতে একটি আইন পাস হয়েছিলো, যা 1956 CONSTITUTION হিসাবে পরিচিত। যা কার্যকর হয়েছিলো ২৩শে মার্চ ১৯৫৬ সালে। এই আইনের অধীনে নির্বাচন হওয়ার কথা থাকলেও হয়নি। ফিরোজ খান প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর নির্বাচনের ঘোষণা দেওয়া হলো। ইতোমধ্যে আরো অনেকেই প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন। সোহরাওয়ার্দীও প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন। বগুড়ার চৌধুরী মোহাম্মদ আলীও প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। নির্বাচনের তারিখ দেওয়া হলো ১৯৫৯ সালের ১৬ই ফেব্রুয়ারীতে। নির্বাচনের মাধ্যমে সাধারণ জনতার কাছে ক্ষমতা যাবে। এর পূর্বে জনতার হাতে ক্ষমতা যাওয়া সম্ভব ছিলো না। পাকিস্তানের কোন সংবিধানই ছিলো না। সংবিধান রচনা করার পর নির্বাচনের ঘোষণা দেওয়া হলো।

ঃ সংবিধান কখন রচিত হয়?

মা.আলী ঃ ১৯৫৬ সালের ২৩ শে মার্চ কার্যকর হয়।

ঃ ১৯৫৬ সালে সংবিধান কার্যকর হলো; অথচ নির্বাচন দেওয়া হলো ১৯৫৯ সালে। ব্যাপার কি?

মা.আলী ঃ ১৯৫৬,৫৭,৫৮ যাওয়ার পর আমরা বিষয়টা তাঁর কাছে তুলে ধরলে তিনি বললেন, আমার রিপোর্ট মতে এখন নির্বাচন দিলে খুন-খারাবী হওয়ার সম্ভাবনা

আছে। বললাম, আমরা তো খুন-খারাবীর সম্ভাবনা দেখি না। তবু যদি তোমার পর্যবেক্ষণ এমন হয়, তবে সকল রাজনৈতিক দলকে ডেকে তাদের সামনে প্রস্তাবটা রাখ।

এরপর ফিরোজ খান সকল পার্টির লোককে ডাকলো। ১৯৫৮ ইংরেজীর সেপ্টেম্বর মাসে করাচীর সিন্ধু এসেম্বলী হাউসের বৈঠক থেকে ফিরোজ খানকে সর্বসম্মতিক্রমে বলা হলো, আপনি নির্বাচন দিন বাদ-বাকী দিক আমরা দেখবো। কোন খুন-খারাবী হবে না।

ঃ সেই সম্মেলনে তৎকালের পূর্ব পাকিস্তান অর্থাৎ আজকের বাংলাদেশের প্রতিনিধি হিসাবে কে কে ছিলেন?

মা.আলী ঃ নেতৃত্ব পর্যায়ে ছিলেন শেরে বাংলা এ কে এম ফজলুল হক ও হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী। ইয়ংদের মধ্যে আমি আর শেখ মুজিব।

ঃ কিন্তু শেষ পর্যন্ত তো নির্বাচন হলো না?

মা.আলী ঃ এই ঘোষণার কয়েকদিন পর ৭ই অক্টোবর রাতের অন্ধকারে আইয়ূব খান ক্ষমতা দখল করে সামরিক শাসন জারি করে। ঐ যে আমি বলেছিলাম শক্তির কথা, সেই শক্তির কেন্দ্র এই। সামরিক আইনের মধ্য দিয়ে এসেম্বলী, মিনিস্ট্রি সবই ভেঙ্গে দেওয়া হলো। পূর্ব পাকিস্তানে আতাউর রহমান খানের মন্ত্রী পরিষদ ছিলো। তাও ভেঙ্গে দেওয়া হলো। অন্যান্য প্রদেশেরও একই অবস্থা। ফিরোজ খানের কাছ থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে নেওয়া হলো।

গোলাম মোহাম্মদের মৃত্যুর পর ইসকান্দর মির্জা প্রেসিডেন্ট ছিলেন। তোমরা হয়তো অনেকেই জানো না যে, ইসকান্দর মির্জা মীর জাফরের বংশের লোক। আইয়ূব খান তার স্বাক্ষর নিয়েই সামরিক শাসন জারি করেছিলো। আর বিশ দিন পর কানে ধরে তাকে বের করে দেয়া হয়েছিল। ১৭৫৭ সালে মীর জাফরের সাথেও ইংরেজরা অনুরূপ কান্ড ঘটিয়েছিল। ব্যবধান শুধু মীর জাফরকে ক্লাইভ বের করে দিয়েছিলো তিন মাস পর আর ইসকান্দর মীর্জাকে আইয়ূব খান বের করে দিয়েছে বিশ দিন পর। সামরিক শাসনই পাকিস্তান ভাংগার মূল কারণ।

ঃ তাহলে কি আপনি বলতে চান মূল সমস্যার জন্য দায়ী আইয়ূব খান?

মা.আলীঃ হ্যাঁ। আমি আজো এদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের জনসভায় বলে থাকি যে, পাকিস্তান ভাংগার জন্য যদি কোন ব্যক্তিকে দায়ী করতে হয়, তবে সে আইয়ূব খান। হি ইজ দ্যা কালপ্রিট। যদি সে সামরিক শাসন জারি না করতো, তবে এতো সমস্যা হতো না। নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতার পরিবর্তন হতো। ফলে আমরা বাংগালী মুসলমান এতটুকু মনক্ষুণ্ন হতাম না। পশ্চিম পাকিস্তানের লোকেরাও মনক্ষুণ্ন হয়েছে, কিন্তু বাংগালীরা দূরত্বের কারণে বেশি হয়েছে। বাংগালীদের মনক্ষুণ্ন হওয়ার অন্য কারণ হলো অফিস-আদালত ও সেনাবাহিনীতে বেশি ছিলো পশ্চিম পাকিস্তানের লোক। একদিকে দূরত্বের কারণে বাংগালীরা কেন্দ্রে কম ছিলো, অন্যদিকে পাকিস্তান হওয়ার পর ভারতের

বিভিন্ন অঞ্চল থেকে উর্দুভাষী যারা এসেছে, তারা অনেকটা যোগ্যতাসম্পন্নও ছিলো। উদাহরণ হিসাবে তোমরা দেখতে পার, পাকিস্তানের জন্মলগ্নে, অর্থাৎ-১৯৪৭-এ আমাদের বাংগালী একজন সি এস পিও ছিলো না। মাত্র একজন আইসিএস ছিলেন। তাও তিনি ছিলেন নমিনেইটেড।

ঃ তাঁর নামটা কি স্মরণ আছে?

মা.আলী ঃ নুরুন নবী চৌধুরী। এই একটি মাত্র লোক ছিলেন বাংগালী। অথচ তখন পশ্চিম পাকিস্তানে শত শত যোগ্য লোক উচ্চপদে ছিলো। সেনাবাহিনীতে কোন অফিসার ছিলো না আমাদের।

ঃ কারণ কি?

মা.আলী ঃ কারণ একটাই, ইংরেজ উপরে ওঠার সুযোগ আমাদের দেয়নি।

বাংগালী মুসলমানদেরকে তারা দমন করে রেখেছে। ১৭৫৭তে ইংরেজরা বাংলার ক্ষমতায় বসে প্রথমে। মুসলমানদেরকে অর্থনৈতিকভাবে তারা পর্যুদস্ত করে।

ঃ মুসলমান ছাড়াও তো বাংগালী ছিলো। শুধু মুসলমানদেরকে তারা দমন করলো কেন?

মা. আলী ঃ বাংগালী মুসলমানদের প্রতি তাদের আক্রোশ ছিলো।

ঃ ভারতবর্ষে বাংগালী মুসলমান ছাড়া তো আরো মুসলমান ছিলো। তাদের প্রতি কেন ইংজেদের আক্রোশ নেই? বিশেষ করে পাঞ্জাবী?

মা.আলী ঃ হ্যাঁ, ছিলো বটে। কিন্তু তারা ততটা ইংরেজদের বিরোধিতা করেনি, বরং অনেক ক্ষেত্রে সহযোগিতা করেছে। ১৮৫৭ সালের অনেক পাঞ্জাবী ইংরেজদের পক্ষে কাজ করেছে। বৃটিশ সেনাবাহিনীতে পাঞ্জাবী মুসলিম ও শিখ ছিলো প্রচুর। সিন্ধের লোক ছিলো না। ফ্রন্টইয়ার থেকেও কিছু কিছু ছিলো। বাংগালীকে সেনাবাহিনীতে ইংরেজরা নিতো না। কারণ বাংগালীরা কখনো বৃটিশের সাথে আপোষ করেনি; বরং সর্বদা সংগ্রাম করেছে। তিতুমীরের বাঁশের কেল্লা, হাজী শরিয়তুল্লাহর ফারায়েজী আন্দোলন, ফকির মজনু শাহর ফকির বিদ্রোহ—এভাবে আন্দোলনের পর আন্দোলন চলেছে। এদিকে ইংরেজরাও ক্ষমতায় বসে বাংগালী মুসলমানদেরকে অর্থনৈতিকভাবে বিপর্যস্ত করে ফেলে। মুসলমানদের যার কাছে যা ছিলো, তা ইংরেজরা কেড়ে নিয়ে তাদের তাবেদার হিন্দুদেরকে দিয়ে দিলো। মসলিন কাপড়—যার চল্লিশ গজ এক মুষ্টিতে সামলানো যেত—বাংগালী মুসলমানরাই তা তৈরী করত। ইংরেজরা কারিগরদের হাত কেটে দিলো। দুইশ' বছরের শোষণ-নির্যাতনের পর যেদিন স্বাধীন হলাম, সেদিন আমরা পশ্চিম পাকিস্তান থেকে অনেক পেছনে ছিলাম। আমি বললাম না, মাত্র একজন বাংগালী নমিনেইটেড আইসিএস ছিলেন।

১৯৩৭-এর পর শেরে বাংলা প্রধানমন্ত্রী হলে সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রে হিন্দু মুসলমানদের সমান সমান করলেন। এর আগে বাংলার মুসলমানরা সরকারী কোন

চাকুরিতে সুযোগ পেতেন না। ১৯৩৭ থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত এই দশ বছরের সামান্য সময়ে মুসলমানরা শিক্ষার দিকে তেমন অগ্রসর হতে পারেননি। কেরানী, পিয়ন পর্যায়ে কিছু মুসলমান যেতে পেরেছিলেন অবশ্য। সিলেট থেকে যারা কপ করে এসেছে, তারা কিছুটা বাংগালী মুসলমানদের মর্যাদা রেখেছিলেন। কমিশনার, ডেপুটি কমিশনার পর্যায়ে তারা ছিলেন। তেমনি যারা সি পি এবং ইউপি থেকে এসেছে, তারাও উচ্চ পর্যায়ে ছিলেন। যেমন আমাদের প্রথম চীফ সেক্রেটারী আজিজ আহমদ পাঞ্জাব থেকে কপ করে এসে আমাদের জন্য কাজ করেছেন।

কিন্তু তুমি ১৯৪৭ থেকে ৭১ পর্যন্ত চেয়ে দেখ বাংগালী মুসলমানরা পাকিস্তানের পিয়ন থেকে চীফ সেক্রেটারী পর্যন্ত হয়েছেন। অর্থাৎ-খুব দ্রুত উন্নতি ঘটেছে। আর তা একমাত্র সম্ভব হয়েছে পাকিস্তান হওয়ার জন্য, নতুবা সম্ভব হতো না।

ঃ আল্লাহর হুকুম হলে হয় তো সম্ভব হতো?

মা' আলী ঃ আল্লাহর হুকুম হলে এ থেকেও বেশি হতো তা স্বীকার করি। আমি বলছি অতীতের একশ' বছরে যা সম্ভব হয়নি, তা আল্লাহর হুকুমে পাকিস্তান হওয়ার কিছু দিনের মধ্যে হয়েছে। এটা আল্লাহর রহমত বলতে হবে। পাট কোথায় উৎপাদন হয়? পূর্ব বাংলায়। অথচ সমস্ত পাটের কারখানা ছিলো হুগলী ও কলকাতায়। ইংরেজ আর হিন্দু মিলে বাংগালী মুসলমানদেরকে শোষণ করেছে। পাকিস্তান হওয়ার পর আস্তে আস্তে পূর্ব বাংলায় শুরু হলো পাটের কারখানা তৈরী।

ঃ আমরা তো শুনেছি পাকিস্তান হওয়ায় বাংগালী, অর্থাৎ-পূর্ব পাকিস্তান বেশি শোষিত-বঞ্চিত হয়েছে। পূর্ব পাকিস্তানে পাট হতো, কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়া হতো?

মা.আলী ঃ তখন তো তারা এবং আমরা একই ছিলাম। পাকিস্তান বলতে তো উভয় অংশকেই বোঝাতো। তুমি হিসাব করে দেখ, ১৯৪৭-এর পূর্বে পূর্ব বাংলায় কয়টা জুটমিল ছিলো এবং পাকিস্তান হওয়ার পর ১৯৭১ পর্যন্ত কয়টা হয়েছে? '৪৭-এর পূর্বে পূর্ব বাংলায় একটাও জুটমিল ছিলো না। '৪৭-এর পর একাত্তর পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানে ৮৪টা জুটমিল হলো। যার মধ্যে এমনও একটি জুটমিল ছিলো, যা সমস্ত এশিয়ার মধ্যে বৃহৎ। আদমজী জুটমিল। '৪৭-এর পূর্বে পূর্ব পাকিস্তানে তিনটা মাত্র কাপড়ের কারখানা ছিলো। (১) ঢাকেশ্বরী. (২) লক্ষ্মী নারায়ণ, (৩) লক্ষ্মী নারায়ণ।

তিনটার মালিকই হিন্দু ছিলো। ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানে ৫৬টা টেক্সটাইল মিল হয়। যার মধ্যে ৩২টার মালিক বাংগালী মুসলমান। ১৯৪৭-এর পূর্ব পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানে কোন স্টীলমিল ছিলো না। গোটা পাকিস্তানের সর্বপ্রথম যে স্টীলমিল হয়, তা চট্টগ্রামে ছিল। সমস্ত পাকিস্তানের মধ্যে সার কারখানা ছিলো না। পাকিস্তান হওয়ার পর যে তিনটা হলো, তিনটাই পূর্ব পাকিস্তানে। এছাড়াও পাকিস্তান

হওয়ার পর পূর্ব পাকিস্তানে ছোট ছোট প্রায় ছয়শ' মিল প্রতিষ্ঠিত হয়। তাই পাকিস্তান সরকার পূর্ব পাকিস্তানীদের শুধু শোষণ করেছে-একথা সত্য নয়। পাকিস্তান সরকার তার উভয় অংশে সাধ্য মতো উন্নয়নের চেষ্টা করেছে। কিন্তু প্রধান যে কালপ্রিট আইয়ুব খান, সে সাধারণ মানুষের মধ্যে নৈরাজ্য সৃষ্টি করে। স্বৈরাচার আইয়ুব খানের ব্যবহারে বাংলার মুসলমানরা জেগে উঠে। তারা ভাবে, যে দেশ আমরা তৈরী করলাম, সে দেশে আমাদের কোন অধিকার নেই কেন। শুধু বাংলায় নয়, এখানেও মানুষের মধ্যে এ প্রশ্ন ছিল। তাই আমরা যখন আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করলাম, তখন পূর্ব পাকিস্তানে যেমন লক্ষ লক্ষ লোক রাজপথে এসেছে, তেমনি পশ্চিম পাকিস্তানেও। আমরা নয়জন নেতা আইয়ূব খানের বিরুদ্ধে যে বিবৃতি দিয়েছিলাম, তা আজো ইতিহাসে NINE LEADER STATEMENT বলে লিপিবদ্ধ হয়ে আছে।

ঃ এই নয়জন কে কে ?

মা.আলী ঃ নুরুল আমীন সাহেব, আতাউর রহমান খান, আবুল হোসেন সরকার, হামিদুল হক চৌধুরী, পীর মুহসিন উদ্দিন দুদু মিয়া, সৈয়দ আজিজুল হক (শেরে বাংলার ভাতিজা), আমি (মাহমুদ আলী), ফরিদপুরের ইউসুফ আলী চৌধুরী এবং শেখ মুজিবুর রহমান।

ঃ এই নয়জনের সকলেই তো পূর্ব পাকিস্তানের লোক।

মা.আলী ঃ হ্যাঁ আমরা নয়জনই বাংগালী ছিলাম। আইয়ূব খানের সামরিক শাসনের ফলে অন্য কারো সাথে যোগাযোগ সম্ভব হয়নি। আমাদের বাসার সামনে সব সময় আইয়ূবের পাহারা থাকতো। আমরা একের অন্যের সাথে চুপিচুপি মসজিদে নামাজের সময় দেখা করে বিবৃতি তৈরী করি। পত্রিকা অফিসে নিজে নিয়ে যাই। তারা অনেকেই বললেন, যদি এই বিবৃতি প্রকাশ করি, তবে পত্রিকা বন্ধ করে দেবে। আমরা বললাম, যদি এক দিনে সবাই প্রকাশ করেন, তবে এক সাথে সকল পত্রিকা বন্ধের সাহস করবে না। শেষ পর্যন্ত তারা রাজী হলেন। আমি নিজে সংবাদ হিসাবে তা টাইপ করে দিলাম। কারণ অন্য কাউকে দিলে তা জানাজানি হওয়ার সম্ভাবনা আছে। এখানের পত্রিকায় এই বিবৃতি প্রকাশিত হওয়ার সাথে সাথেই বেলুচিস্তানের জাফর জামান পত্রিকায় বিবৃতি দিয়ে আমাদের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করলেন।

জাফর জামান পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা আন্দোলনের একজন উল্লেখযোগ্য নেতা ছিলেন। এদিকে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, মাওলানা ভাসানীসহ বড় বড় নেতাদেরকে গ্রেফতার করা হলো। আমরা চুনোপুটিরা কোন রকম আছি কি নাই অবস্থা। শহীদ সোহরাওয়ার্দী জেল থেকে বের হওয়ার সাথে সাথে আইয়ূবের চামচারা তাকে বোঝাতে চেষ্টা করলো, নয় নেতা যারা বিবৃতি দিয়েছে ওরা সব চুনোপুটি। আপনি অনেক বড় নেতা। ওদের কথা আপনি মানতে যাবেন কেন? তিনি কোন কথা না বলে পূর্ব পাকিস্তান ফিরে এলেন। বিমান বন্দরেই ঘোষণা দিলেন, "আমি নয় নেতাকে পূর্ণ সমর্থন করি। প্রয়োজনে আমি দশ নম্বর নেতা হতে রাজী।"

তাঁর ছিলো অত্যন্ত প্রশস্ত মন। আমরা সবাই তাকে নেতা মেনে নিলাম। পূর্ব পাকিস্তানের সর্বত্র আন্দোলনের প্রস্তুতি শুরু হলো। বড় বড় মিটিং করলাম। মিটিং-মিছিল করে তিনি যখন পশ্চিম পাকিস্তানে আসার প্রস্তুতি নিচ্ছেন, তখন অসুস্থ হয়ে পড়েন। এরপর চিকিৎসার জন্য বিদেশে চলে যান। জীবিত আর ফিরে আসলেন না। ফিরে আসে তাঁর লাশ। বাংগালী জাতি চিরদিনের জন্য এক যোগ্য নেতাকে হারালো।

ঃ এটা কত সালের কথা?

মা.আলী ঃ ১৯৬৩ ইংরেজী।

ঃ আইয়ূব খানের মৌলিক গণতন্ত্র সম্পর্কে কিছু বলবেন কি?

মা.আলী ঃ আন্দোলন সংগ্রামের ফলে ১৯৬২ তে আইয়ূব খান একটা সংবিধান তৈরী করলো। আমরা তা মেনে নিলাম না। স্পষ্ট ভাষায় বলে দিলাম, জনপ্রতিনিধি ছাড়া কোন ব্যক্তির অধিকার নেই সংবিধান প্রণয়নের। সে কিন্তু আমাদের কথায় কর্ণপাত করলো না, এই সংবিধানের ভিত্তিতে নির্বাচন দিলো। নির্বাচনও আমরা বর্জন করলাম।

সে সেই নির্বাচনের নাম দিয়েছিলো 'মৌলিক গণতন্ত্র'। তার বক্তব্য ছিলো, চল্লিশ হাজার মৌলিক গণতান্ত্রিক পূর্ব পাকিস্তান থেকে এবং চল্লিশ হাজার পশ্চিম পাকিস্তান থেকে নির্বাচিত হবে। এরপর এই আশি হাজারে মিলে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত করবে। এটাই ছিলো আইয়ূবী মৌলিক গণতন্ত্র। এভাবে গেলো প্রথম পর্যায়। দ্বিতীয় পর্যায়ে এসে সে যখন আবার নির্বাচন দিতে চাইলো, তখন আমরা তার বিরুদ্ধে আন্দোলন করছি। সেই সময় নির্বাচনের বিরুদ্ধে ন্যাশনাল ডেমক্রেটিক ফ্রন্ট গঠন করা হলো। এতে সর্বসম্মতিক্রমে নুরুল আমীন সাহেবকে সভাপতি ও আমাকে সেক্রেটারী করা হলো। আমরা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও মাওলানা ভাসানীর সম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত নিলাম, গণতন্ত্র ফিরে না আসা পর্যন্ত ন্যাশনাল ডেমক্রেটিক ফ্রন্টের ব্যানারে আন্দোলন চালিয়ে যাব। এর মধ্যে নিজেদের দলীয় কর্মসূচী দিয়ে ঐক্যে ফাটল সৃষ্টি করবো না।

ঃ আমরা তো জানি শেষ পর্যন্ত এই ঐক্য থাকেনি। কেন?

মা.আলী ঃ সোহরাওয়ার্দী সাহেবের মৃত্যুর পর শেখ মুজিব চুক্তি ভঙ্গ করে একলা চলো নীতি অনুসরণ করলেন। মাওলানা ভাসানী আমাকে বললেন, শেখ মুজিব যখন ফ্রন্ট থেকে বেরিয়ে গেলো, তা হলে চলো আমরাও ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির পৃথক কর্মসূচী দেই। মাওলানা ভাসানী তখন ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির সভাপতি এবং আমি সেক্রেটারী। মাওলানার কথায় আমি রাজী হলাম না। এরপরও মাওলানা চলে গেলেন। ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের প্রশ্নে আওয়ামী লীগের আবুল মনসুর আহমদ ও আতাউর রহমান খান এবং ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির আমি ডেমক্রেটিক ফ্রন্টে থেকে গেলাম। আস্তে আস্তে ফ্রন্ট দুর্বল হয়ে যায়।

ঃ ১৯৬২-এর নির্বাচন বর্জন করলেন, কিন্তু আবার ১৯৬৪ তে আইয়ূবের অধীনে নির্বাচন করলেন কেন?

মা.আলী ঃ ১৯৬৪ তে আইয়ূব খান নির্বাচন দিলে আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম, তার বিরুদ্ধে সবাই মিলে একজন প্রার্থী দেব। শেষ পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানের বিরোধী দলগুলোর প্রস্তাবানুসারে অল পাকিস্তানের বিরোধী দলসমূহ সিদ্ধান্ত নিলো একমাত্র যোগ্য প্রার্থী মুহতারামা ফাতেমা জিন্নাহ। নির্বাচনে ফাতেমা জিন্নাহ পূর্ব পাকিস্তানে বিপুল ভোটে জয়ী হলেও পশ্চিম পাকিস্তানে আইয়ূবী ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে পরাজিত হলেন। পূর্ব পাকিস্তানীরা এতে মনক্ষুণ্ন হলো। আসলে পশ্চিম পাকিস্তানের সাধারণ মানুষের কোন অপরাধ নয়। সকল অপরাধ ঐ কালপ্রিটের।

ঃ নির্বাচনের পর আপনাদের ভূমিকা কি ছিলো ?

মা.আলী ঃ নির্বাচনের পর আমরা প্রথমে পর্যবেক্ষণ করলাম দুর্বলতাটা কোথায়? দেখা গেল অনৈক্যই সকল দুর্বলতার মূল। আমরা আবার চাইলাম ফ্রন্ট করতে। কিন্তু জামাতসহ অনেকে বিরোধিতা করলো।

ঃ জামাত কেন বিরোধিতা করলো?

মা.আলী ঃ তারা বললো আমরা ইসলামী আদর্শে বিশ্বাসী। আমাদের রাজনীতি ইসলামভিত্তিক। আমরা ফ্রন্টে আসতে পারি না।

ঃ শেষ পর্যন্ত কি আর ঐক্য হলো না?

মা.আলী ঃ ফ্রন্ট হয়নি। তবে আন্দোলনের জন্য একে-অন্যের সাথে লিয়াজোঁ ছিলো ডেমোক্রেটিক মুভমেন্টের মাধ্যমে।

ঃ এটা কত সালের কথা? এই মুভমেন্টে আপনার দায়িত্ব কি ছিল?

মা.আলী ঃ আমি তো পাকিস্তান ডেমক্রেটিক মুভমেন্টের সেক্রেটারী জেনারেল ছিলাম। সালটা হবে ১৯৬৫ কিংবা '৬৬ ইংরেজী।

ঃ জামাতে ইসলামীও কি ছিলো?

মা.আলী ঃ ছিলো। তবে তারা বলেছিলো যে, আমরা রাজনৈতিক দিক থেকে বেশি গুরুত্ব দেব ধর্মীয় দিক।

ঃ এর পর কি হলো?

মা.আলী ঃ এর পর আইয়ূবের বিরুদ্ধে শক্তিশালী মুভমেন্ট গড়ে উঠলো চলল। ১৯৬৬ সাল পর্যন্ত। ১৯৬৭ সালে আবার সবাই পৃথক হতে থাকলে আমরা অল পাকিস্তান ডেমক্রেটিক পার্টি গঠন করি।

ঃ আমরা মানে?

মা.আলী ঃ প্রেসিডেন্ট নুরুল আমীন সাহেব। আমি অন্যতম ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং পাঞ্জাব থেকে সেক্রেটারী।

ঃ আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা সম্পর্কে আপনার মতামত কি?

মা.আলী ঃ আইয়ূব খানের বিরুদ্ধে আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় এক পর্যায়ে

সরকার শেখ মুজিবকে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় জড়িত করে। ঘটনার সত্য-মিথ্যা আমি জানি না। মুনাইম খান তখন গভর্নর ছিলো। আমরা তাকে বললাম, শেখ মুজিবকে এই মামলায় যুক্ত করলে এর কঠিন রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া হবে। তোমরা এমন করতে যেও না।

ঃ সরকার বা মুনাইম খান কি আপনাদের কাছে পরামর্শ চেয়েছিলেন?

মা.আলী ঃ না। আমাদের কোন মতামত চায়নি। আমরা দেশের স্বার্থে পরামর্শ দিয়েছিলাম। কিন্তু সে তা শুনলো না। মুনাইম খান ভেবেছিলো, "পেয়েছি একটা বিষয়, শেখ মুজিবকে এ দিয়েই শেষ করে দেয়া যাবে।" কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমাদের ধারণা সত্য হলো। আমি, নুরুল আমীন সাহেব ও শাহ আজীজ তখন সংসদ সদস্য। সংসদের ভেতরেও আমরা বলেছি, এ মামলায় শেখ মুজিবকে সংশ্লিষ্ট না করতে। কিন্তু সরকার তা শুনলো না। বিচার চলতে থাকলো। এদিকে বাংগালীদের মনে দৃঢ়বিশ্বাস সৃষ্টি হল, মুজিব বাংগালীদের পক্ষে কথা বলে, তাই তাকে ষড়যন্ত্র মামলায় জড়িত করা হয়েছে। ফলে মুজিবের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পেতে লাগলো। এদিকে আমরা পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক মুভমেন্টকে শক্তিশালী করে মাঠে আইয়ুববিরোধী আন্দোলন শুরু করলাম। আওয়ামী লীগের সোহরাওয়ার্দী গ্রুপ তো পূর্ব থেকেই আমাদের সাথে ছিলো। ১৯৬৮ সালের জানুয়ারী মাসে শেখ মুজিবও এসে যোগ দিলো। আরো কিছু ছোট ছোট দল এসেছিলো। আইয়ূবের বিরুদ্ধে আট দলীয় শক্তিশালী জোট হলো।

ঃ আপনি বলছেন আন্দোলন শক্তিশালী হয়ে উঠে। কিন্তু এর পরও তো সরকার আপনাদের কথায় কর্ণপাত করলো না।

মা.আলী ঃ একেবারে যে করেনি, তা কিন্তু নয়। যেমন ১৯৬৯-এ আইয়ুব খান আমাকে ডেকে বললো ঃ

– দেশের অবস্থা খারাপ হতে চলছে এখন কি করবো?

আমি বললাম–এ কথা তো আমরা বার বার বলে আসছি–কিন্তু তুমি শুনছো না।

তুমি ১৯৬৬ সালে বলেছিলে, ঢাকার সংসদকে বাজেট প্রণয়ন ও বাতিলের পূর্ণ অধিকার দেবে। আজ (১৯৬৯-এর জানুয়ারী) পর্যন্ত তা কার্যকর হলো না। তাই লোক তোমাকে বিশ্বাস করে না এবং করতেও পারে না।

সে বললো, আমার কি দোষ? অমুক আমাকে ইয়ে বলেছে, অমুক তা করেছে।

আমি বললাম, তোমার দোষ আমি বলছি না। কিন্তু ক্ষমতা তো তোমার হাতে। যে ওয়াদা তুমি করেছিলে, তাও পূর্ণ করনি। মানুষ তোমাকেই অপরাধী বলবে। আমরা কোন ইনকিলাবী লোক নই। আমরা আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান চাই।

তখন সে বললো, এখন আমি কি করতে পারি? বললাম, যদিও দেরী হয়ে গেছে, তবু সব দলকে ডেকে গোল টেবিল বৈঠক করতে পার।

১৯৬৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে সে সত্যই রাওয়ালপিন্ডিতে বৈঠক ডাকলো।

ঃ সেই বৈঠকে কি আওয়ামী লীগ এসেছিলো?

মা.আলী ঃ শেখ মুজিব জেলে ছিলো। তার পক্ষ থেকে তাজউদ্দিন, সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও কামরুজ্জামান আসে।

ঃ সেই বৈঠকে কি সিদ্ধান্ত হলো?

মা.আলী ঃ দু'তিন দফা বৈঠকের পর তাজউদ্দিনরা বললো শেখ মুজিব ছাড়া আমরা কোন সিদ্ধান্তে যেতে পারবো না। ফলে নতুন সমস্যা সৃষ্টি হলো। আইয়ুব খান চাইলেই তো মুক্তি দিতে পারে না। আদালত থেকে প্যারালালে তাকে মুক্ত করে আনার সিদ্ধান্ত হলো। সব ব্যবস্থা হওয়ার পরও শেষ পর্যন্ত সে আসলো না।

ঃ কেন?

মা.আলী ঃ প্রকৃত কারণ তো বলা অসম্ভব। হয় তো এখানে কোন ষড়যন্ত্র ছিলো। নতুবা সকল ব্যবস্থা হওয়ার পরও কেন আসবে না। এদিকে আবার কে বা কারা জেলের এক সার্জেন্টকে হত্যা করে বসে। সরকার বলতে লাগলো, মুজিবের লোকেরা তা করেছে। তাজউদ্দিন নতুন করে দাবী করলো, যদি শেখ মুজিবকে নিঃশর্ত মুক্তি না দেওয়া হয়, তবে আওয়ামী লীগ বৈঠক বর্জন করবে। আইয়ুব খান বললো, নিঃশর্ত মুক্তি দানের আইনত বৈধতা আমার নেই। তাজউদ্দিন বললো, যে আইনে গ্রেফতার করা হয়েছে, তা বাতিল করে দাও। এভাবে অনেক দিন গেলো। শেষ পর্যন্ত মার্চের বৈঠকে শেখ মুজিব যোগদান করে। আইয়ূব খান বললো, আপনাদের ডেমোক্রেটিক এ্যাকশন কমিটি থেকে যে আটটি দাবী উত্থাপন করা হয়েছে, তা আমি সম্পূর্ণ মেনে নিলাম। ১৯৬৯ ইংরেজীর ১৩ই মার্চের ঐ বৈঠকে পূর্ব পাকিস্তান থেকে আমি, শেখ মুজিব ও নুরুল আমীন সাহেব ছিলাম। পশ্চিম পাকিস্তানেরও অনেক নেতা ছিলেন। শেখ মুজিব হঠাৎ দাঁড়িয়ে বললো "আমার আরো দু'টি পয়েন্ট আছে।" কি পয়েন্ট? সে বললো, "পশ্চিম পাকিস্তান যে এক ইউনিট তা ভেঙ্গে দিতে হবে। এবং ওয়ান ম্যান ওয়ান ভোট অর্থাৎ জনসংখ্যানুপাতে প্রতিনিধি হতে হবে।" জনসংখ্যানুপাতে প্রতিনিধিত্বের ব্যাপারটা তোমাদেরকে বলে রাখি–এটা হলো প্যারোটি বিটুউন ইস্ট এন্ড ওয়েস্ট পাকিস্তান। 56 CONSTITUTION তৈরীকালে CONSTITUTION ASSEMBLY তে এই পয়েন্ট এসেছিলো। কিন্তু সব দিক বিবেচনা করে শেরে বাংলা এ কে এম ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীসহ আমরা সকল এসেম্বলী মেম্বার সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম, পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে সমান অধিকারের ভিত্তিতে প্রতিনিধি নিয়োগ করা হবে। দেশের স্বার্থে তা সবাই মেনে নিয়েছিলেন। দেখ, শেরে বাংলার মতো লিডার তো শেখ মুজিব কেন আমরা কেউই ছিলাম না। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মতো লিডারও তো আমরা কেউ নই। তারাই বাংগালীর পক্ষে সে দিন এই সিদ্ধান্তগুলো নিয়েছিলেন। ফলে ১৯৫৬ ইংরেজীতে CONSTITUTION হয়েছিলো। আর এই প্যারোটিটা আইয়ূব খানও তাজা রেখেছিলো। কিন্তু শেখ মুজিব

বললো তা বাতিল করে দিতে হবে। আইয়ূব খান বললো, আমার যা ছিলো, তা তো দিয়ে দিলাম। বাকীগুলো আপনাদের রাজনীতিকদের ব্যাপার। আপনারা ঐক্যবদ্ধভাবে সিদ্ধান্তে আসুন।

গোল টেবিল বৈঠকের মিডিয়া স্পোকস্‌ম্যান হিসাবে তিন পক্ষের তিনজন নিয়ে একটি গ্রুপ করা হয়েছিলো। তাদের কাজ ছিলো বৈঠকের রিপোর্ট মিডিয়ার কাছে বলা।

ঃ এই তিনজন কে কে?

মা.আলী ঃ আওয়ামী লীগের পক্ষে খন্দকার মুশতাক আহমদ, বাকীদের পক্ষে আমি এবং সরকারের পক্ষে এস এম জাফর।

ঃ শেষ পর্যন্ত কি হলো?

মা.আলী ঃ আইয়ূব খান যখন বললো আমাদের রাজনীতিকরা সমাধান করবে, তখন আমি শেখকে বললাম, ভাই সে তো সত্যই বলেছে। এটা তো উভয় পাকিস্তানের রাজনীতিকদের ব্যাপার। চলো আলোচনার মাধ্যমে আমরা এর সমাধান করি। সে রাজী হলো। রাতে মিটিং বসবে। আমি আর নুরুল আমীন সাহেব তৎকালিন ওয়েস্ট পাকিস্তান হাউস অর্থাৎ বর্তমান পাঞ্জাব হাউসে রেস্ট নিচ্ছি। শেখ মুজিব ইস্ট পাকিস্তান হাউসে। ঐ খানেই মিটিং-এর ব্যবস্থা করা হলো। সন্ধ্যা ছয়টায় মিটিং বসার কথা। কিন্তু এর পূর্বেই রেডিও পাকিস্তান থেকে সংবাদ প্রচারিত হলো, শেখ মুজিবুর রহমান ডেমক্রেটিক এ্যাকশন কমিটি থেকে ইস্তফা দিয়ে দিয়েছ। ফলে আর কোন মিটিং বা সিদ্ধান্ত হলো না।

ঃ কেন এই ইস্তফা?

মা.আলী ঃ তা তো বলতে পারি না। যতটুকু জেনেছি, শেখ মুজিবের সাথে ইয়াহিয়া খানের গোপন সম্পর্ক গড়ে উঠে। ইয়াহিয়া খান তখন সেনাবাহিনীর কমান্ডার ইন চীফ। বর্তমানে যেমন সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীর পৃথক পৃথক প্রধান থাকেন, সে সময় কিন্তু এরকম ছিলো না। তিন বাহিনীর প্রধান একজনই থাকতো। শেখ মুজিব আমাদের সাথে বৈঠক না করে, ইয়াহিয়া খানের সাথে রাতে গোপনে ডিনার খেলো।

ঃ কত তারিখে, কোথায় হয় এই গোপন ডিনার?

মা.আলী ঃ ১৯৬৯-এর (যতটুকু স্মরণ হয়) ১৪ই মার্চ রাওয়ালপিন্ডিতে।

ঃ তাদের মধ্যে কি আলোচনা হয়?

মা.আলী ঃ গোপনে দু'জন কি 'ষড়যন্ত্র' করেছে তাতো জানি না। তবে এই গুরুত্বপূর্ণ ডিনারের সংবাদ পত্রিকায় এসেছে। এরপর সে ঢাকায় উড়ে গেলো।

ঃ আপনারা কি করলেন?

মা.আলী ঃ আমরা একদিন দু'দিন পর ঢাকায় গেলাম। যাওয়ার কিছু সময় পূর্বে করাচীর "কাসে নাজে" (সরকারী গেস্ট হাউস) সাংবাদিকরা এসে বললো, আপনি ঢাকায় যাবেন না।

বললাম, কেন?

– কারণ মুজিবুর রহমান ঢাকায় গিয়ে সাংবাদিকদের বলেছে, "বাংগালীদের জন্য আমি অনেক কিছু করতে পারতাম, কিন্তু প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে মাহমুদ আলী, হামিদুল হক চৌধুরী ও মৌলভী ফরিদ আহমদ।" ঢাকার অবস্থা খারাপ। ঢাকায় যাওয়া আপনাদের জন্য নিরাপদ নয়।

আমি বললাম, ভাই আমার ঘরে আমাকে যেতেই হবে। আমি বলছি না শেখ মুজিব বাংগালীদের স্বার্থ চায় না। কিন্তু চাওয়া আর করার মধ্যে অনেক ব্যবধান আছে। সে চায়, কিন্তু কিভাবে করতে হয় তা জানে না।

আমার এই বক্তব্যও পরদিন পত্রিকায় প্রকাশিত হলো। ঢাকায় পৌঁছে প্লেনে বসেই দেখলাম, বিমান বন্দর লোকে লোকারণ্য। ভাবলাম আর রক্ষা নেই।

ঃ ভয় পেয়েছিলেন কি?

মা.আলী ঃ (হাসলেন) হ্যাঁ কিছুটা পেয়েছিলাম। কিন্তু উপায় নেই। আমাকে নামতেই হবে। তো-খায়ের -আল্লাহ্‌র কি মর্জি, আমি যখন সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে এলাম, তখন লোক ফুলের মালা নিয়ে আমার দিকে এগিয়ে এলো। আমি এই বলে আল্লাহ্‌র প্রশংসা করলাম, হে আল্লাহ্! তুমি-ই একমাত্র পার মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়ে ফুলের মালা দিতে। এভাবে ঐ দিন চলে গেলো।

ঃ এর পর কি শেখ মুজিবের সাথে দেখা হয়েছে?

মা.আলী ঃ আমার বাড়ীতে কাজ চলায় আমি তখন ২৭ নম্বর ধানমন্ডির এক বাড়ীতে ভাড়া থাকি। শেখ মুজিব থাকতো ৩২ নম্বর ধানমন্ডিতে। আমার ভাড়া বাড়ীর টেলিফোন খারাপ ছিলো। আমার বাড়ীতেও একটি ফোন ছিলো। কাজের লোকটি জানালো হামিদুল হক চৌধুরী ফোন করেছেন দু'তিনবার। আমি টেলিফোন করতে আমার বাসায় যাচ্ছি। পেছন থেকে আওয়াজ হলো, আপনার সাথে কথা আছে।

দাঁড়িয়ে দেখলাম অনেক লোক। দু'চারজনকে জানি ওরা আওয়ামী লীগের লোক। জানতে চাইলাম, কি কথা? উত্তেজিত হয়ে বললো, আপনি শেখ সাহেবের বিরুদ্ধে কথা বলেছেন কেন?

– কি কথা, কোথায় বলেছি?

–কাগজে এসেছে।

– কোন্ কাগজে? নিয়ে এসো। অথবা শেখকে নিয়ে এসো কিংবা আমাকে তার কাছে নিয়ে যাও।

– শেখ সাহেব বাড়ীতে নেই। প্রোগ্রামে আছেন উনিশ নম্বর স্ট্রীটে।

– চলো সেখানে যাই।

– ওরা চাইলো গাড়ী নিয়ে আসতে।

বললাম, প্রয়োজন নেই। পায়ে হেঁটে-ই চললাম। দেশের পরিস্থিতি থমথমে। এই সময় স্বশস্ত্র পুলিশ যাচ্ছিলো। অফিসাররা আমাকে চিনতে পেরে নেমে এসে জানতে চাইলো, কোন সাহায্য লাগবে কি? বললাম, তোমরা তোমাদের কাজে যাও আমার সাথে আল্লাহ্ আছেন।

এই কথা শুনে একদিকে পুলিশ চলে গেলো অন্যদিকে উপস্থিত আওয়ামী লীগ কর্মীরা দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে গেলো। এক গ্রুপ আমাকে গালি দিচ্ছে অন্য গ্রুপ এর প্রতিবাদ করছে। উনিশ নম্বরে উপস্থিত হয়ে দেখি সত্যিই অনুষ্ঠান চলছে। শেখকে স্টেইজে না দেখে বললাম তাকে নিয়ে এসো। তারা বললো, তিনি আসছেন। এদিকে মাইকে আমাকে গালিগালাজ করা হচ্ছে। স্লোগান দেওয়া হচ্ছে, পাকিস্তানের দালাল মাহমুদ আলী হুঁশিয়ার। বেশ সময় অপেক্ষার পর বললাম, ভাই! এখানে যা বলা হচ্ছে, সব এক পক্ষের। উভয় পক্ষের বক্তব্য না শুনলে সত্যতা বোঝা যায় না। আমাকেও কিছু বলতে দাও। কেউ কেউ গর্জে উঠলো, অনেক বক্তৃতা শুনেছি আর শোনার প্রয়োজন নেই। (যদিও আমি স্মরণ থেকে বলছি, তোমরা এসব কথার প্রমাণ পাবে সেই সময়ের পত্রিকা খুলে দেখলে)। তারা আমার দিকে কাগজ এগিয়ে দিয়ে বললো, 'লিখে দেন শেখ সাহেবের বিরুদ্ধে যা বলেছি সব মিথ্যা। জীবনে আর বলবো না'।

আমি বললাম, তার বিরুদ্ধে তো আমি কিছুই বলিনি, তবু তোমরা চাইলে লিখে দেব। যাও, যা লেখার লিখে নিয়ে এসো আমি স্বাক্ষর করে দেব। কয়েকজন লিখে নিয়ে আসে। এই সময় একজন স্টেইজের নিকট থেকে চিৎকার দিয়ে বলে, 'লিখার কোন প্রয়োজন নেই, তাকে স্টেইজে নিয়ে এসো। সে মাইকে বলুক।' এটা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে আমার প্রতি সাহায্য ছিলো। যেই তারা বলেছে মুহূর্তের মধ্যে আমি মাইকের কাছে চলে যাই। প্রায় পাঁচ মিনিট কথা বলি। বিশ্বাস করো, বিপুল মানুষ জমা হয়ে যায়। আমি বললাম, আপনারা কি বিশ্বাস করেন মাহমুদ আলী বাংগালীর স্বার্থের বিরুদ্ধে কিছু বলতে বা করতে পারে? এরপর বিস্তারিত ঘটনা বললাম। শেখ মুজিবের অন্ধভক্তরা আমার বিরুদ্ধে শ্লোগান দিতে লাগলো। প্রচুর সাংবাদিক উপস্থিত ছিলেন। পরদিন পত্রিকায় ছবিসহ সংবাদ এসেছে।

আমি আমার বক্তব্য শেষ করে দ্রুত বড় রাস্তায় এসে পৌঁছে যাই। রাস্তায় পুলিশ দাঁড়ানো ছিলো। তারা বললো, স্যার চলেন বাড়ীতে দিয়ে আসি। আমি বললাম, কখনো তোমাদের গাড়ীতে উঠবো না। একটু অগ্রসর হতেই একটি প্রাইভেট জীপ এসে থামলো। ছদ্মবেশে এক সেনাবাহিনীর অফিসার। সে বললো, স্যার চলেন বাসায় দিয়ে আসি। আমি বললাম, বাসায় যাব না। প্রথমে শেখ মুজিবের বাড়ীতে গিয়ে জিজ্ঞেস করবো সে কি চায়? অফিসারটি আমাকে ৩২ নম্বরে নামিয়ে দিলো। সেখানে গিয়ে দেখি লোকে লোকারণ্য। সবাই আমার দলের লোক। তারা সংবাদ পেয়েছে আমাকে হত্যা করা হয়েছে, তাই জমা হয়েছে শেখ মুজিবকে চ্যালেঞ্জ করতে। তারা আমাকে দেখে

আশ্চর্য হলো। সবকিছু খুলে বললাম। আমার ইচ্ছে ছিলো শেখের সাথে দেখা করে জিজ্ঞেস করবো, সে গণতন্ত্র চায় না সন্ত্রাস চায়? কিন্তু দলের লোকেরা যেতে দিলো না। তারা আমাকে বাড়ীতে নিয়ে গেলো। এখানে এসে দেখি আমেরিকান এক সাংবাদিক অপেক্ষা করছে। ব্যাপার জানতে চাইলে সে বলে, শেখ মুজিবের বাড়ীতে বসা ছিলাম। তোমার স্ত্রী সেখানে গিয়ে শেখ মুজিবকে খুব গালি দিলো। আমি বাংলা বুঝি না। তবে তার রাগটা অনুমান করেছি। জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম, শেখ মুজিবের লোকেরা তোমার বাড়ী জ্বালিয়ে দিতে হুমকি দিচ্ছে। তাই তোমার স্ত্রী রাগান্বিত হয়ে এসে বলেছে- "তোমার লোকেরা আমার বাড়ী জ্বালানোর হুমকি দিচ্ছে এতে আমরা ভীত নই। যদি সত্যি তোমরা আমার বাড়ী জ্বালাও, তবে আমিও এক বোতল স্প্রিট জোগাড় করতে পারি তোমার বাড়ী জ্বালানোর জন্য।" তাই তোমার সাথে দেখা করতে এলাম।

যা-ই হোক, আমি মুজিবকে রাওয়ালপিন্ডিতে বলেছিলাম, তুমি যে এত টাইট করছো, তাতে সামরিক শাসন এসে যেতে পারে। সে বললো, আপনি কি আমাকে ভয় দেখাচ্ছেন? আমি বললাম, না তোমাকে ভয় দেখাচ্ছি না। আমরা নিজেরা ভয় পাচ্ছি। কারণ সামরিক শাসন এলে আমরা সবাই ভুক্তভোগী হব। তাই সামরিক শাসন আসুক, সে অবস্থা সৃষ্টি করা ঠিক নয়। ২৩ শে মার্চ তার সাথে আমার কথা হলো আর ২৫ শে মার্চ আইয়ূব খানকে সরিয়ে ইয়াহিয়া খান ক্ষমতা দখল করে সামরিক আইন জারী করল।

ঃ পাকিস্তান ভাংগার জন্য রাজনৈতিক কারণ ছাড়াও অর্থনৈতিক শোষণও কি অন্যতম বিষয় নয়?

মা.আলী ঃ পূর্ব পাকিস্তানের লোকদের ধারণা ছিলো পশ্চিম পাকিস্তানীরা আমাদেরকে খেয়ে ফেলছে। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানের এমন কোন অঞ্চল নেই, যেখানে আমি যাইনি। আগেও গিয়েছি। এখনো যাই। আমি দেখেছি সব গ্রামের লোকেরাই গরীব। কিন্তু এর পরও বেলুচিরা ভাবে পাঞ্জাবীরা সুখে, পাঞ্জাবীরা ভাবে বেলুচিরা। এই তো সপ্তাহ হলো আমি সিন্ধু থেকে এসেছি। সেখানের লোকেরা অভিযোগ করলো, সরকার শুধু পাঞ্জাবে সাহায্য করছে। আমি বললাম, তোমরা এখানে বসে তা বললে হবে না। আমার সাথে এসে দেখ গোটা পাকিস্তানের অবস্থা প্রায় এক। প্রকৃত পক্ষে পাকিস্তান যে উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, তা কার্যকর করা হয়নি। সকল সমস্যার মূল এখানে।

ঃ কার্যকর না হওয়ার কারণ কি?

মা.আলী ঃ এই যে বললাম না THIS IS BECOUSE OF THIS MAN। ইসলাম বলে সম্পদের মুনসিফানা বন্টনের কথা। কিন্তু পাকিস্তানে তা হচ্ছে না। কিছুসংখ্যক লোক সম্পদকে কুক্ষিগত করে রেখেছে।

ঃ আপনার বক্তব্য থেকে বোঝা যায়, পাকিস্তানের প্রধান সমস্যা ছিল সঠিক নেতৃত্বের অভাব?

মা.আলী ঃ না, এমন কথা আমি বলছি না। প্রথমে যে নেতৃত্ব ছিলো, তা সঠিক ছিলো। কায়েদে আজমের পর লিয়াকত আলী খান বেঁচে থাকলে অনেকটা লক্ষ্য হাসিল হতো। এরপর তো সব দুর্বল হয়ে গেলো। লক্ষ্যে পৌঁছার আন্দোলনই বর্তমানে করছে 'তাহরীকে তাকমীলে পাকিস্তান।' আমাদের উদ্দেশ্য নওয়াজ শরিফকে সরিয়ে মাহমুদ আলীকে ক্ষমতায় বসানো নয়। আমাদের উদ্দেশ্য ইসলামী শরিয়ত মতো অর্থনীতি সাজানো, যাতে সম্পদ কিছু লোকের হাতে কুক্ষিগত না থাকে। সিন্ধে আজো ৯৫ ভাগ লোকের কোন জমি নেই। মাত্র পাঁচ ভাগের কাছে জমি কুক্ষিগত। পাঞ্জাবে ৯০ ভাগের কাছে জমি নেই ১০ ভাগের কাছে জমি কুক্ষিগত। পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠা ইসলামী উদ্দেশ্যে হলেও এখানে পুঁজিবাদ অগ্রসর হয়ে গেছে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে আমরা শ্লোগান দিতাম 'টাটা আওর বিড়লা কি চঙ্গল মে রহেঙ্গে নেহি।' আজ পাকিস্তানে মুসলমান টাটা ও বিড়লা জন্ম হয়ে গেছে। ওদের বিরুদ্ধে আমরা আন্দোলন করছি। পূর্বেই বলেছি, ১৯৪৭-এর পূর্বে বাংলাদেশে বৃটিশ শাসনের দু'শ' বছরে কিছুই হয়নি। অথচ পাকিস্তান আমলে অনেক কিছুই হয়েছে। তোমরা যারা নতুন প্রজন্ম, দয়া করে একটু ইনসাফের সাথে ইতিহাস পর্যালোচনা করে দেখ। তাছাড়া পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পূর্ব পাকিস্তানে জায়গা কম, জনসংখ্যা বেশি। বাংলাদেশে তখনও এক এক স্কোয়ার কিলোমিটারে দু' দু'হাজার লোক ছিলো।

ঃ আপনার সব কথাও যদি মেনে নেই, অথবা তাও যদি মেনে নেই যে, দু'শ' বছরের শোষণ, নির্যাতনের শিকার কোন জাতিকে রাতারাতি উন্নতির চরমে পৌঁছানো সম্ভব নয়। কিন্তু সত্তরের নির্বাচনে তো শেখ মুজিবুর রহমান সত্যই বিজয়ী হয়েছিলেন?

মা.আলী ঃ হ্যাঁ, তোমার কথা ধ্রুব সত্য। আমি এই কথাই তোমাকে বলতে চেয়েছিলাম। ইয়াহিয়া খান ক্ষমতায় এসে ঘোষণা দিলো নির্বাচন দেবে। সে আমাদেরকে ডেকে বললো, আমি নির্বাচন দিতে চাই, কি বলেন? আমরা বললাম, বড় বুদ্ধিমানের কথা বলছো তুমি। কিন্তু কোন্ আইনের ভিত্তিতে নির্বাচন দেবে? কারণ সামরিক আইনের অধীনে নির্বাচন হলেও এর কোন কার্যকারিতা থাকবে না। কারণ নির্বাচনের পর লোক আশা করবে ক্ষমতার পরিবর্তন। তুমি কোন্ পদ্ধতিতে, কার কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করবে?

সে বললো, আপনাদের রাজনীতিকদের পরামর্শ কি?

আমরা বললাম, ১৯৫৬-এর আইনে জনপ্রতিনিধিরা পাস করেছিলো। আইয়ূব খান তা স্থগিত করেছিল। তা আবার নিয়ে এসো। এরপর নির্বাচন দাও এবং নিজে ঘরে ফিরে যাও। সে তাতে রাজী হলো। কিন্তু মাত্র তিন মাসের মধ্যেই সে 'লিগাল ফ্রেইম অফ অর্ডার' নামে এক অধ্যাদেশ জারি করে। এটা ছিলো সামরিক জান্তার নিজস্ব আইন। এতে বলা হলো, নির্বাচন হবে। নির্বাচিত সদস্যদের ১২০ দিনের ভেতর ক্ষমতা হস্তান্তর সম্পর্কিত আইন তৈরী করতে হবে। যদি সদস্যরা ১২০ দিনের ভেতর তা করতে ব্যর্থ হন, তবে অটোমেটিক ৩শ' আসনের পার্লামেন্ট বাতিল হয়ে যাবে।

'৭০-এর ৬ ডিসেম্বর নির্বাচন হলো। ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭১-এ পাকিস্তান ভেঙ্গে গেলো। এই এক বছরে একদিনও পার্লামেন্ট বসতে পারেনি। নির্বাচনের পূর্বে জেনারেল ইয়াহিয়াকে আমি জিজ্ঞেস্ করেছিলাম, নির্বাচনের ফলাফল কেউ অমান্য করলে কি করবে? সে হাতের ছড়ি দেখিয়ে বলেছিলো, পিটিয়ে সোজা করে দেব। বিশ্বাস কর, পশ্চিম পাকিস্তানের সাধারণ মানুষের কোন দোষ নেই। পরিস্থিতি ঘোলাটে করেছে এই আর্মী অফিসার ও রাজনীতিকরা। আজো এখানের মানুষদের বাংগালীদের প্রতি ভালবাসা রয়েছে। আমি তাদের অনেককে কাঁদতে পর্যন্ত দেখেছি। বিশ্বাস কর, '৭১-এ ইসলামাবাদের গলি দিয়ে সেনাবাহিনীর কেউ ইউনিফর্ম গায়ে দিয়ে বের হতে পারেনি। আমি পূর্বেই বলেছি, আইন ছিলো নির্বাচনের ১২০ দিনের ভেতর ক্ষমতা হস্তান্তরের আইন প্রণয়ন করা। কিন্তু সেই সংসদ একদিনের জন্যও বসতে পারল না। আমি ইয়াহিয়াকে পূর্বেই বলেছি, ক্ষমতা হস্তান্তরের আইন সংশোধন করে নির্বাচন দাও। নতুবা সফল হবে না। সে ভাবলো, কোন দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা না আসলে সে নিজে ক্ষমতায় থেকে যাবে।

ঃ একাত্তরে জুলফিকার আলী ভুট্টোর ভূমিকা তো ভালো ছিলো না?

মা.আলী ঃ মোটেও ভালো ছিলো না। কেমন করে ভালো নয় দেখ, সে ইয়াহিয়ার সাথে মিলে রাজনীতিতে সেনাবাহিনীকে জড়িত করে সমস্যা বৃদ্ধি করলো। ১৯৭১ সালের ২৫ শে মার্চ ভুট্টো সাহেব আর ইয়াহিয়া মিলে পূর্ব পাকিস্তানে সেনাবাহিনী লেলিয়ে দিয়ে পশ্চিম পাকিস্তান ফিরে ভুট্টো সাহেব বক্তব্য দিলেন, আল্লাহকে ধন্যবাদ যে, পাকিস্তান রক্ষার জন্য সেনাবাহিনী এগিয়ে এসেছে। আর এটাই শেষ চিকিৎসা। দেখ আমি বলি এখানে যদি সেনাবাহিনী জড়িত না হতো, তবে ভারত পূর্ব পাকিস্তানে হস্তক্ষেপ করার সুযোগ পেত না।

ঃ পাকিস্তানে অনেকের সাথে আলাপ করেছি একাত্তর নিয়ে। তারা বললেন, '৭১-এ পূর্ব পাকিস্তানে কি হয়েছে, তা আমরা প্রথম দিকে জানতে পারিনি। আমরা যতটুকু জেনেছিলাম, বাংগালীরা হিন্দুদের সাথে মিলে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে লড়াই করছে এবং অসহায় বিহারীদেরকে হত্যা করছে।

মা.আলী ঃ হ্যাঁ। আমি তো এই কথাই বললাম যে, এখানকার জনগণ কিছুই জানত না। পত্র-পত্রিকায় সঠিক সংবাদ তেমন আসত না।

ঃ এখানের পত্র-পত্রিকা '৭১-এ পূর্ব পাকিস্তানের মজলুম মানুষগুলোর বিরুদ্ধে যে ভূমিকা নিয়েছে, তা কি সত্যনিষ্ঠ সাংবাদিকতার পরিপন্থী নয়?

মা.আলী ঃ দেখ, একাত্তরে যা ঘটেছে এর প্রতিটি পদক্ষেপই ছিলো ভুল। ১৯৬২ সালে আইয়ূব খানের তৈরী আইন ছিলো, যদি কোন কারণবশত প্রেসিডেন্ট কাজ করতে ব্যর্থ হন, তবে স্পিকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করবেন। কিন্তু আইয়ূব খানই তৎকালীন স্পীকার বিচারপতি আব্দুল জব্বার খানের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর না করে হস্তান্তর করলো

ইয়াহিয়া খানের কাছে। মোটকথা, একের পর এক ভুল হয়েছে। পত্রিকাওয়ালাদের ব্যাপারটাও তাই।

ঃ '৭০-এর নির্বাচনের পর তো ইয়াহিয়া খান শেখ মুজিবের কাছে ক্ষমতা দিয়ে দিলে কোন সমস্যা হতো না?

মা.আলী ঃ কি করে ক্ষমতা হস্তান্তর করবে? ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য তো সাংবিধানিক আইন থাকা চাই। সেই আইন তো ছিলো না। এটা তো সংসদে বসে প্রণয়ন করার কথা ছিলো। সংসদই তো বসলো না। আর এই সুযোগে ইয়াহিয়া ভুট্টোকে নিয়ে ইডিয়েটের মতো এ্যাকশনে চলে গেলো। আমাদের সাথে সামান্য আলাপও করলো না।

ঃ আপনি নিজে বলছেন, সেনাবাহিনীর এ্যাকশন সম্পূর্ণ ইডিয়েটি। এরপরও আপনি পাকিস্তানের পক্ষে থাকলেন কেন?

মা.আলী ঃ যা অন্যায় তা অবশ্যই অন্যায়। আমরা অন্যায়কে মেনে নিতে পারি না। শাসকদের ভুলে পাকিস্তানকে ভেঙ্গে দেওয়াও অন্যায়। তাই আমরা সামরিক স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলনের সাথে সাথে চেষ্টা করেছি অখণ্ড পাকিস্তান রক্ষার। সত্য কথা হলো, পাকিস্তান উপমহাদেশের মুসলমানদের একটি শক্তির কেন্দ্র ছিল। ছিল প্রেরণার উৎস। শত্রুর মোকাবেলায় অখণ্ড পাকিস্তান ছিল অত্যন্ত জরুরী বিষয়।

ঃ পাকিস্তানী অনেকে মনে করেন ভুট্টো, মুজিব এবং ভারত মিলে পাকিস্তান ভাংগার মাস্টারপ্লান করেছিলেন?

মা.আলী ঃ না, আমি ভুট্টো সম্পর্কে একথা বলবো না। তবে সে ক্ষমতালোভী ছিলো। যেমন সত্তরের নির্বাচনের পর এক সময় সে প্রস্তাব করলো, দেশে দু'জন প্রধানমন্ত্রী হওয়া প্রয়োজন। একজন পূর্ব পাকিস্তানে এবং অন্যজন পশ্চিম পাকিস্তানে। সে সময়ের পত্রিকা খুলে দেখ, একমাত্র আমিই বিবৃতি দিয়ে বলেছিলাম, "এটা কি ধরনের কথা যে, একদেশে দুই প্রধানমন্ত্রী হবে? শেখ মুজিব নির্বাচিত হয়েছে তাকে প্রধানমন্ত্রী করা হোক। এক দেশে দু'জন প্রধানমন্ত্রী হতে পারে না।" মোটকথা, ভুট্টো ছিলো পাওয়ার হেংরী।

ঃ '৭১-এ যে জুলুম বাংলাদেশে হয়েছে, তা বন্ধের জন্য আপনি একজন বাংগালী অথবা একজন মানুষ হিসাবে কি ভূমিকা রেখেছেন?

মা.আলী ঃ তা বন্ধ করার মতো ক্ষমতা আমার হাতে ছিলো না।

ঃ প্রতিবাদের ক্ষমতাও কি ছিলো না?

মা.আলী ঃ করেছি। প্রতিবাদ যেখানে করার করেছি। অনেক মানুষকে পিঞ্জিরা থেকেও বাঁচিয়েছি। যার মধ্যে আওয়ামী লীগেরও লোক ছিলো।

ঃ পিঞ্জিরা কি?

মা.আলী ঃ মিলিটারী কাউকে যদি পিঞ্জিরায় নিয়ে যায় দ্যাজ মিন হিইজ ফিনিস। রাও ফরমান আলী ছিলো গভর্নরের পরামর্শদাতা। তাকে নিয়ে কত মানুষকে বাঁচিয়েছি।

ঃ '৭১-এর ঘটনার তদন্তের জন্য বিচারপতি হামিদুর রহমানের নেতৃত্বে যে কমিশন গঠন করা হয়েছিলো, সেই কমিশনের রিপোর্ট পাবলিশ হলো না কেন?

মা.আলী ঃ তোমরা হয় তো জান না যে, জাস্টিস হামিদুর রহমানও বাংগালী ছিলেন। তিনি যে রিপোর্ট দিয়েছিলেন, তা এখনো পাবলিশ করতে সরকারের সৎ সাহসের অভাব রয়েছে।

ঃ অনেকের ধারণা মিঃ ভুট্টো সেই রিপোর্ট নষ্ট করে ফেলেছেন?

মা.আলী ঃ না না, তা নষ্ট করা হয়নি। লোকেরা দাবী করছে আজো পাবলিশের জন্য কিন্তু সরকার করছে না।

ঃ কেন করছে না?

মা.আলী ঃ এতে অনেকেরই বিরুদ্ধে কথা আছে তাই। আমি সেই রিপোর্টের একজন স্বাক্ষী। দীর্ঘ পঞ্চাশ পৃষ্ঠার লিখিত স্বাক্ষী আমি দিয়েছি। হামিদুর রহমান কমিশন দীর্ঘ আড়াই ঘণ্টা আমার সাথে তর্ক-বিতর্ক করেছে।

ঃ '৭১-এর ঘটনার জন্য আপনারা আইয়ূব খানকে মূল দায়ী করতে চাচ্ছেন?

মা.আলী ঃ অবশ্যই। দেখতে হবে ঘটনা কোথা থেকে শুরু। যদি সে তার নিজের আইন মতোও স্পীকার জব্বার খানের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতো, তবে এমন ঘটনা হয়তো ঘটতো না।

ঃ বিচারপতি আব্দুল জব্বার খানের বাড়ী কোথায়?

মা.আলী ঃ আরে তিনি তো আমাদের বরিশালের লোক। যা-ই হোক '৭১-এর ঘটনার জন্য প্রকাশ্য দোষী আইয়ুব, ইয়াহিয়া এবং ভুট্টো আর পর্দার আড়ালে প্রকৃত দায়ী আমেরিকা। দেখ, আমেরিকার তৎকালীন প্রেসিডেন্ট নিক্সন তার এক বই-এ লিখেছেন, আমরা চেয়েছিলাম পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান পৃথক হয়ে যাক। তৎকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রী কিসিঞ্জারও একই কথা লিখেছেন।

ঃ তা হলে দেখা যায় পাকিস্তান ভাংগার মূল নায়ক আমেরিকা?

মা.আলী ঃ হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি তো বলেছি যে, পর্দার আড়ালে আমেরিকা দাবা চালিয়েছে। খাজা নাজিম উদ্দিনকে সরিয়ে আমাদের বগুড়ার মোহাম্মদ আলীকে কেন প্রধানমন্ত্রী করা হলো? কারণ খাজা সাহেব আমেরিকার ফ্রী গম গ্রহণে অস্বীকৃতি জানিয়ে ছিলেন। শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী যখন যুক্ত বাংলার প্রধানমন্ত্রী ছিলেন, তখন মোহাম্মদ আলী ছিলো পার্লামেন্টারী সেক্রেটারী। আর যখন তাকে প্রধানমন্ত্রী করা হয়, তখন সে সংসদ সদস্যই ছিলো না। সে ছিলো আমেরিকায় পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত। সেখান থেকে এনে তাকে প্রধানমন্ত্রী করা হলো, বিষয়টা স্পষ্ট নয় কি?

ঃ ফ্রী গমের খেলাটা খুলে বলবেন কি?

মা.আলী ঃ আমেরিকা পাকিস্তানকে প্রস্তাব করলো শুধু জাহাজের ভাড়ার বিনিময়ে আমি তোমাকে গম দেব। তুমি তা তোমার জনগণের কাছে বিক্রি করে যা পাবে এর আশি ভাগ তোমার এবং বিশ ভাগ আমেরিকার। এই বিশ ভাগ তুমি স্থানীয় আমেরিকান ব্যাংকে রাখবে, তবে জানতে চাইবে না আমি তা দিয়ে কি করবো।

ঃ এই অর্থ আমেরিকা কি করেছে বলে আপনি মনে করেন?

মা.আলী ঃ সেদিনও বলেছি আজও বলছি, এই বিশ ভাগ যার হিসাব জানার অধিকার পাকিস্তানের ছিলো না, তা আমেরিকা ব্যবহার করেছে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে। আমেরিকা যাদেরকে দিয়েই কাজ করিয়ে থাকুক করেছে। তারা প্রথম পাকিস্তানকে দিয়েছে ফ্রী গম। এরপর ফেরৎ দিতে হবে না এমন ঋণ। তোমরা কি জান আজ পাকিস্তানের ঋণ কত? এখানের লোকেরাও জানে না। পাকিস্তানের বর্তমান ঋণ চার হাজার দু'শ' কোটি রূপী। আর এই ঋণ বাবদ বাৎসরিক সুদ দিতে হয় একশ' আট চল্লিশ কোটি রূপী। আর পাকিস্তানের আমদানী মাত্র তিনশ' কোটি রূপী। যার মধ্যে একশ' আটচল্লিশ কোটি সুদ বাবদ চলে যায়। আমি প্রায় মিটিং-এ বলি, যদি সুদ ব্যক্তির জন্য হারাম হয়, তবে গোটা দেশের জন্য হালাল হয় কিভাবে? আমেরিকা মূলত চেয়েছিলো পাকিস্তান ভেঙ্গে মুসলমানদেরকে দুর্বল করতে। যদিও সে দিন ভারত আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে ভিন্ন ব্লকে ছিলো, তবু মুসলমানদের বিরুদ্ধে তারা সর্বদা এক। পাকিস্তানের উদ্দেশ্যের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে শেরে বাংলা ফজলুল হক লাহোর অধিবেশনে বলেছিলেন- "আমরা চাই এদেশে একটি মুসলিম শক্তি তৈরী করতে।"

হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী একথাটাই ১৯৪৬-এ দিল্লির অধিবেশনে উচ্চারণ করেছিলেন। আমেরিকা চাইলো এই শক্তিকে দুর্বল করে দিতে। আর সে পথেই তারা ঐ বিশ ভাগ খরচ করেছে।

ঃ '৭১-এ যারা পাক সেনাবাহিনীর সমর্থনে রাজাকার কিংবা এই প্রকারের বাহিনী করেছে, তাদের সম্পর্কে আপনার বক্তব্য কি?

মা.আলী ঃ আমি সেদিনও রাজাকার বাহিনীকে সমর্থন করিনি। আজও না। পাকিস্তানের অখণ্ডতার জন্য নিয়মতান্ত্রিক চেষ্টা করা যেতে পারে, কিন্তু নিজের জনগণের বিরুদ্ধে অস্ত্র নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়া যায় না। সেনাবাহিনীর মতো রাজাকাররাও অপরাধী।

ঃ পাক বাহিনী বাংলায় মুসলমানদেরকে নাকি কাফের হিসাবে হত্যা করেছে?

মা.আলী ঃ দেখ, এক সেনা অফিসার হিন্দুর ঘরে গিয়ে দেখলো, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছবি লাগানো। সে এত লম্বা দাড়ী দেখে ভাবলো, নিশ্চয় এই বাড়ী হিন্দু কিংবা কাফেরের নয়। চলে এলো। আবার অনেক দাড়ী ছাড়া মুসলমানকে তারা হিন্দু ভাবলো। মোটকথা, ওরা হিন্দু মুসলমান কিছুই বুঝতো না। তারা ছিলো হুকুমের গোলাম মাত্র। আমার তো সহজ কথা, ওদেরকে পাঠানোই ভুল হয়েছে। সেনাবাহিনীর এ্যাকশন অর্থই কিছু অঘটন

ঘটে যাওয়া। একাত্তরে আমি যখন ইউরোপ সফরে গিয়েছিলাম, তখন সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলাম, দেখ ইউরোপে অসংখ্য যুদ্ধ হয়েছে। প্রত্যেক যুদ্ধেই সেনাবাহিনী কর্তৃক বহু অঘটন ঘটেছে। প্রকৃত কথা হচ্ছে, নিজের দেশের ভেতর আর্মি ব্যবহারই সম্পূর্ণ অন্যায়। আজও আমি একথা বলছি। প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হককে আমি কয়েকবার বলেছি, ভাই ওরা যে অন্যায় করেছে, তাদেরকে কবর থেকে এনে ফাঁসী দেওয়া প্রয়োজন।

ঃ পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের সংঘাত কি ইসলাম ও কুফ্‌রের?

মা.আলী ঃ দেখ মবনু, পাকিস্তানের সংঘাতটা ইসলাম আর নন-ইসলামের ছিলো না। এই সংঘাত ছিলো দুই স্যাকুলার ক্ষমতালোভী নেতার অর্থাৎ শেখ মুজিব আর ভুট্টোর। ইসলাম যদি পাকিস্তানে থাকতো, তবে সমস্যাই আসতো না। ইসলাম জুলুম-নির্যাতনের অনুমতি দেওয়াতো দূরের কথা পাকিস্তানীয়ত অর্থাৎ জাতীয়তাবাদের পর্যন্ত অনুমতি দেয় না। দেখ, ক্ষমতা কার হাতে ছিলো। ক্ষমতা তো তার হাতেই ছিলো, যার হাতে যাওয়ার ছিলো না। আইয়ূব, ইয়াহিয়া, ভুট্টো কিংবা শেখ মুজিব ওদের কারোরই উদ্দেশ্য ইসলাম ছিলো না। ব্যক্তিগত জীবনেও তারা ইসলামের আশপাশেও ছিলো না। তাই আমি বলি যা হওয়ার হয়ে গেছে। এখন সংশোধন হওয়া প্রয়োজন। গোটা মুসলিম উম্মাহর স্বার্থে আমাদের আবার ঐক্যবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন।

ঃ সংশোধনের কথা বলছেন, কিন্তু তা কি সম্ভব? যারা একাত্তরে প্রাণ হারিয়েছে তাদেরকে ফিরিয়ে দেবে কে?

মা.আলী ঃ দেখ, উভয় পক্ষেই প্রাণ হারিয়েছে। যারা যুদ্ধের ময়দানে প্রাণ হারিয়েছে, ওদের কথা বাদ দাও। কিন্তু যাদেরকে ঘরে ঢুকে বিনা অপরাধে শুধু বাংগালী কিংবা উর্দু ভাষী হওয়ার অপরাধে হত্যা করা হয়েছে, ওদের জন্য উভয় গ্রুপেরই ক্ষমা চাওয়া উচিৎ এবং আলোচনার মাধ্যমেই সংশোধন করতে হবে। শেখ মুজিবুর রহমান যখন ১৯৭৪-এ পাকিস্তানে ইসলামী সম্মেলনে এসেছিলো, জিজ্ঞেস করেছিলাম, ইসলামাবাদ কবে আসছো? সে বললো, আগামীকাল ঢাকায় চলে যাচ্ছি। আমি বললাম, না না আমি কালকের কথা বলছি না। একেবারে কবে আসছো, সে কথা বলছি। সে বললো, এ কি করে হবে এত খুন-খারাবীর পর? আমি বললাম, যে খুন-খারাবী হয়েছে, এখানে বসে তার বিচার হবে। যে অপরাধী তার উপযুক্ত সাজা হবে। বিচারের জন্য এটাই উত্তম স্থান। এরপর সে চলে গেলো।

আরেকটি ব্যাপার তোমাকে বলি, "১৯৭১ সালের ডিসেম্বর মাসে ভুট্টো আমার এবং নুরুল আমীন সাহেবের কাছে আজিজ আহমদকে পাঠিয়ে জানতে চাইলো, শেখ মুজিবকে কি ফাঁসী দিয়ে দেব? উত্তরে আমরা বললাম, অসম্ভব, বরং তাকে মুক্তি দিয়ে ভুট্টো সাহেবের পক্ষ থেকে বলা হোক, এই নাও ক্ষমতা। তুমি দেশ চালাও।"

আমি ক্ষমতা চাই না। চাই শুধু দেশের ঐক্য। ভুট্টো এর পর কি করেছে, তা আমি জানি না। কারণ, এর পর আমি কায়রোতে এক সম্মেলনে চলে যাই।

ঃ পাকিস্তান আন্দোলনে আসাম থেকে যারা নেতৃত্ব দিয়েছেন, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য আপনাদের পরিবার। বাংলা ও আসামের সিলেট অংশ নিয়ে যে আপনারা ১১শ' মাইলের ব্যবধানে পাকিস্তানের সাথে যোগ দিলেন, তা কোন্ যুক্তিতে। তবু মেনে নেওয়া যেত যদি চারদিকে ইন্ডিয়া না হতো?

মা.আলী ঃ দেখ, আমরা পাকিস্তানের সাথে যোগ দেইনি; বরং আমরা পাকিস্তান সৃষ্টি করেছি। আজকের পাকিস্তান কিন্তু আমাদের লাহোর অধিবেশনের প্রস্তাবিত পাকিস্তান নয়। সেই পাকিস্তানের সীমানা নেপাল পর্যন্ত ছিল। যদি তেমন হতো, তবে নেপাল তাদের স্বার্থে আমাদেরকে পথ দিতো। বিনিময়ে আমরা তাদেরকে করাচী ও চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দর ব্যবহার করতে দিতাম। আমাদের দাবীর ভেতর সম্পূর্ণ কলিকাতা ও আসাম ছিলো। কিন্তু হিন্দু ও ইংরেজরা ইচ্ছে করে তা দেয়নি, যাতে পাকিস্তান ভেঙ্গে যায়। আসামের সিলেট তো অনেক কষ্ট করে আনতে হয়েছে।

ঃ বুঝলাম ইংরেজ ও হিন্দুরা ষড়যন্ত্র করে দেয়নি। কিন্তু আপনারা মানতে গেলেন কেন?

মা.আলী ঃ সেদিন যদি না মানতাম, তবে ইংরেজরা সম্পূর্ণ ক্ষমতা হিন্দুদের হাতে দিয়ে যেত। ফলে আজ কাশ্মীরে যা হচ্ছে আমাদের সবার অবস্থাও তা-ই হতো। সেদিন তা মেনে নেওয়ায় আজ কমপক্ষে পাকিস্তান কিংবা পূর্ব বাংলায় হিন্দুদের অত্যাচার সহ্য করতে হচ্ছে না। পূর্ব পাকিস্তান পৃথক হয়ে বাংলাদেশ হলেও একথা সত্য যে, আজো ভারত সেদিকে প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ করতে পারছে না পাকিস্তানের ভয়ে। অবশ্য অবৈধ ব্যবসার মাধ্যমে বাংলাদেশ আজ ভারতের বাজারে পরিণত হয়েছে। খবর পাচ্ছি।

ঃ ভারত থেকে পৃথক হয়ে পাকিস্তানের লাভ কি হলো? অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক অবস্থা যেমন ছিলো। তেমনই তো আছে। ভারতের কালচার, হিন্দী ছবি ও অবৈধ মাল সবই তো চলছে এখানে?

মা.আলী ঃ তাদের অনেক কিছু আমাদের দেশে চলছে সত্য, কিন্তু নিয়ন্ত্রণটা তাদের হাতে নয়। তাছাড়া ভারতের মার্কেটে গিয়ে দেখ পাকিস্তানের মালও প্রচুর আছে। কিন্তু কথা হলো, এখন তো উপমহাদেশের মুসলমানদের দাঁড়ানোর মতো, স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলার মতো জায়গা আছে। দেখ, শেখ মুজিব একাত্তরের পর ১৯৭৪-এ প্রথম পাকিস্তান সফর করে। এই সফর ছিলো তার স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলা। ফলে দেশে ফিরে সে ভারতের প্রতি আঙ্গুল উঁচিয়ে বলতে পেরেছে "তোমরা ভুলে যেও না আমরা বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশ"। এই সাহসের প্রেরণা সে কোথায় পেলো? পাকিস্তান না থাকলে উপমহাদেশের রাজনীতি একা ভারত এবং হিন্দুদের নিয়ন্ত্রণে থাকতো। আজ ভারত যেমন সুপার পাওয়ার, তেমনি পাকিস্তানও। আজ যদি উভয় পাকিস্তান এক

থাকতো, তবে অবস্থা ভিন্ন হতো। একটা বিরাট শক্তি হতো।

ঃ ভারতের বুকে যারা পাকিস্তানের স্বপ্ন দেখতেন, তাদের শ্লেগান ছিলো– "পাকিস্তান কা মতলব কেয়া-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্"। এখন কথা হলো, পাকিস্তানে কালেমার শাসন কতটুকু প্রতিষ্ঠিত হয়েছে?

মা.আলী ঃ পাকিস্তানের মূল সমস্যা তো এটাই। যদি 'লা ইলাহার' শাসন হতো, তবে তো সমস্যাই ছিলো না। আজ তো পাকিস্তানে এই দাবীতে আন্দোলন চলছে।

ঃ বর্তমানে তো আন্দোলনের কোন প্রয়োজন থাকার কথা নয়, যেহেতু পাকিস্তান প্রতিষ্ঠাকারী সংগঠন মুসলিম লীগ ক্ষমতায়?

মা.আলী ঃ ইভেন দ্যান। মুসলিম লীগ সরকার হওয়ার পরও যেটা করা উচিৎ, নওয়াজ শরীফ সরকার তা করছে না। ফলে আন্দোলন চলছে। এভাবেই যেতে হবে। ইসলামের ইতিহাসে দেখ কোনদিনই কোন কিছু হুট করে হয়ে যায়নি। আস্তে আস্তে করতে হবে।

ঃ আফগানিস্তানে বর্তমানে ইসলামী শরিয়তভিত্তিক শাসন চলছে। তাদের পক্ষে অল্প দিনে যা সম্ভব হলো ,পাকিস্তানের পক্ষে তা সম্ভব নয় কেন?

মা.আলী ঃ পাকিস্তান দীর্ঘদিন ইংরেজশাসিত ছিলো এবং আমরা তা ইংরেজদের হাত থেকে এনেছি। আফগানিস্তানকে ইংরেজরা শাসন করতে পারেনি। এখন কথা হলো, ইংরেজ শাসনের পরিবর্তন করবে পাকিস্তানীরা। তারা তা করছে না। তাই বলে পাকিস্তানের তো অপরাধ নয়। পিপলস পার্টি ক্ষমতায় থাকতে তাদেরকে সেক্যুলার বলে গালিগালাজ করা যেত, কিন্তু এখন মুসলিম লীগও কিছু করছে না। তাই আন্দোলন করতে হচ্ছে।

ঃ মুসলিম লীগ কেন করছে না?

মা.আলী ঃ পারে না।

ঃ কেন পারে না?

মা.আলী ঃ কারণ তার শিক্ষায়-ই তা নেই। সেও লোভী।

ঃ আপনি কি বলতে চাচ্ছেন যে, ইসলামিক গণতান্ত্রিক পাকিস্তানের শিক্ষা ব্যবস্থা স্যাকুলার বলে ইসলামী আইন কায়েম করা যাচ্ছে না?

মা.আলী ঃ না, এটা কথা নয়। এখানকার শিক্ষা ব্যবস্থায় ইসলাম শিখতে কোন প্রতিবন্ধকতা নেই। সমস্যা হচ্ছে দেশের পরিচালকরা। এখনো ইংরেজের আইন চলে। ইংরেজী ভাষায় ফাইল চলে। অথচ উর্দু আর বাংলা ভাষা নিয়ে কত আন্দোলন হলো। শোন, যখন বাংলা রাষ্ট্রভাষা হয়ে গেলো, তখন আতাউর রহমান খানের মন্ত্রীসভা। আমি সেখানে প্রথম ব্যক্তি, যে বাংলা ভাষায় ফাইল লেখা শুরু করি। মনোরঞ্জন ধর ছিলো তখন অর্থমন্ত্রী। আমি যখন তাকে বাংলায় টাইপ করে দরখাস্ত দিলাম, সে নামঞ্জুর করে

দিলো। ফলে, কেবিনেটে পাস হলো না। অথচ পার্লামেন্ট কর্তৃক স্বীকৃত বাংলা পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা। পূর্ব পাকিস্তানের অফিস-আদালতে এই ভাষা চলবে। অথচ সে আমার দরখাস্তই গ্রহণ করলো না। তেমনি পশ্চিম পাকিস্তানেও কেউ উর্দুতে ফাইল লিখে না। আজো না। তবে আমি লিখি। আমার কাছে কেউ উর্দুতে লিখলে আমি উর্দুতে লিখি। ইংরেজীতে লিখলে ইংরেজীতে লিখি। দেখো, কোন জিনিস শুধু সংবিধানে থাকলেই হয় না। আমল করার প্রয়োজন হয়।

ঃ আপনার সাথে দীর্ঘ আলাপ হলো। শেষ পর্যায়ে আপনার ব্যক্তিগত কোন কথা আছে কি?

মা.আলী ঃ তোমাকে আমি আখেরী কথা বলে দেই যে, এখনো সময় আছে সংশোধনের। ব্যাপার যাই হোক, সঠিক পথে সংশোধন হওয়া প্রয়োজন। কারো ন্যায্য অধিকার হরণ করে নয়। সকলের ন্যায্য অধিকারের ভিত্তিতে সমঝোতা প্রয়োজন। ২৭ বছর হয়ে গেলো পৃথকতার। যেভাবেই হোক এ পৃথকতা, আমি বলবো ভারত আমেরিকা মিলে আমাদেরকে ভেঙ্গে দুর্বল করেছে, আর তোমরা বলবে লিভারেশনের মাধ্যমে স্বাধীন হয়েছো। অথচ স্পষ্ট কথা, ইন্ডিয়ান আর্মী না হলে এই লিভারেশন সম্ভব হতো না।

ঃ আপনি কি বলতে চাচ্ছেন, পাক বাহিনী ভারতের কাছে পরাজিত হয়েছে?

মা.আলী ঃ হ্যাঁ, হ্যাঁ। এটাই বাস্তবতা। নিয়াজী তো কোন বাংগালীর কছে আত্মসমর্পণ করেনি। মজার ব্যাপার কি জান? বাংলাদেশী অনেকে বলে, ১৯৭১ সালে বাংগালীরা পাঞ্জাবীদেরকে পরাজিত করেছে। অথচ ওরা জানে না, অরোরা এবং নেয়াজী উভয়ই পাঞ্জাবী। তাই এখানে আমাদের বাংগালীদের গর্ব করার কিছু নেই। বাস্তবতা হচ্ছে পাঞ্জাবীর কাছে পাঞ্জাবীর আত্মসমর্পণ। অথবা হিন্দু কর্তৃক প্রেরিত শিখ পাঞ্জাবীর কাছে মুসলিম পাঞ্জাবীর আত্মসমর্পণ।

ঃ জনাব, আপনি যা-ই বলুন, বাস্তবে লড়াইটা করেছে বাংগালীরা। বাংগালীদের লড়াইয়ের কাছেই পাক সেনারা পরাজিত হয়েছে। শেষ পর্যায়ে আমাদের নেতৃত্বের দুর্বলতার সুযোগে গেইমটা ভারত নিয়ে গেলেও সফলতা প্রকৃতপক্ষে আমাদেরই হয়েছে?

মা.আলী ঃ দেখ, আমি বলছি না বাংগালী যুদ্ধ করেনি। আমি বলি, বাংগালী যদি ফ্রন্ট লাইনে না থাকতো, তবে ভারত পাকিস্তানের মাটিতে পা রাখতেই সাহস পেতো না। কিন্তু স্মরণ রেখ, তারা প্রথম থেকেই এর সাথে যুক্ত ছিলো। নক্সা থেকে শুরু করে ট্রেনিং পর্যন্ত তারা দিয়েছে। যাই-হোক, তা আজ আর বিষয় নয়। বিদ্রোহ-বিপ্লব অনেক দেশেই হয় তা আবার থেমে যায়। পূর্ব পাকিস্তানেও তেমনি হতো। এখন কথা হলো, যা হবার হয়ে গেছে। বিগত ২৭ বছর থেকে শিক্ষা নেওয়া প্রয়োজন। বাংগালী জাতীয়তাবাদ যদি সত্য হতো, তবে এখনো কেন পশ্চিমবঙ্গের বাংগালীরা হিন্দী

শাসকদের ছেড়ে বাংলাদেশের সাথে মিলিত হচ্ছে না? ওরা আসবে না। কারণ বাংলাদেশের শাসকরা ধর্মীয় বিশ্বাসে মুসলমান। আর ওপারের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারণ হিন্দু। এ থেকে প্রমাণিত হয়, ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদ সত্য নয়। ধর্মের একটা ব্যাপার থাকে সর্বদা। তাই আমি বলি–ONE NATION TWO STATE।

ঃ এর লক্ষ্য-উদ্দেশ্য কি?

মা.আলী ঃ অর্থাৎ যদিও বাংলাদেশ-পাকিস্তান দুই দেশ, কিন্তু বাস্তবে আমরা এক জাতি। তাই যার যার দেশের পরিচালনা নিজেরাই করবে। তবে প্রয়োজনে একে অন্যকে সাহায্য করবে এবং বহির্বিশ্বের সাথে মোকাবেলায় উভয় এক হয়ে শত্রুকে বুঝিয়ে দেব, আমরা এক জতি। আমরা মুসলমান। মোট কথা, আমাদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য শেরে বাংলার লাহোর প্রস্তাব মতো পাকিস্তান গড়ে তোলা।

ঃ শহীদ সোহ্রাওয়ার্দীর ONE NATION ONE STATE নীতিকে গ্রহণ না করে শেরে বাংলার ONE NATION TWO STATE নীতির ভিত্তিতে যদি পাকিস্তান হতো তবে এত সমস্যা হতো না। কিন্তু এখন অনেক পানি প্রবাহিত হয়ে গেছে। এখন আর পিছনে যাওয়ার সুযোগ নেই। তবুও বন্ধুত্বপূর্ণ একটা সম্পর্ক গড়ে উঠতো যদি পাকিস্তান আমাদের ন্যায্য পাওনা দিয়ে দিত। আমাদের হক আত্মসাৎ করে আমাদেরকে ভাই বলবেন তা হয় কিভাবে?

মা.আলী ঃ দেখ, '৭৪-এ একথাই আমি শেখ মুজিবকে বলেছিলাম। এসো বসি, দেখি কার কি ন্যায্য পাওনা। তা ছাড়া আমার ONE NATION ONE STATE-এর সংবিধানেও তা লেখা আছে যে, এক সাথে বসে আলোচনা করতে হবে কার কি অধিকার তা নিয়ে। দেখ দু' ভাইয়ের মধ্যে সংঘাত হয় আবার মীমাংসাও হয়। ভারতের সমর্থন নিয়ে সোভিয়েত সৈন্যরা আফগানিস্তানে আক্রমণ করলো, তখন পাকিস্তান আফগানিস্তানের পক্ষ নিলো। অন্যদিকে বাংলাদেশের মরহুম প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান মুসলিম বিশ্বকে সংঘবদ্ধ করে রাশিয়ার হাত থেকে আফগানিস্তানকে রক্ষায় প্রচুর সাহায্য করলো। এ থেকেই প্রমাণিত হয়, বিভিন্ন দেশে বসবাস করে বিভিন্ন ভাষায় কথা বললেও জাতিতে আমরা এক।

ঃ দেখুন, আমরা বাংলার মুসলমানরা সর্বদা মুসলিম উম্মাহ্র ঐক্যের পক্ষে। প্রেসিডেন্ট জিয়ার কথা তো আপনি নিজেই স্বীকার করলেন যে, মুসলিম উম্মাহ্কে এক প্লাটফরমে আনতে চেষ্টা করেছেন।

মা.আলী ঃ চেষ্টা শুধু নয়। সে নিয়ে এসেছিলো।

ঃ অন্যদিকে এত কিছুর পরও পাকিস্তানের মরহুম প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হক বাংলাদেশে গেলে সাধারণ মানুষ তাকে বিপুল স্বাগত জানায়। তিনি যখন চোখ মুছে মুছে বললেন ঃ "হামারা মুলুক জুদা হো গিয়া লেকিন হামারা খুন জুদা নেহী হোগা।" তখন বাংগালীরা তাকে শ্রদ্ধা জানিয়েছে। জিয়াউল হকের হৃদয়ে যে উদারতা ছিলো, তা যদি একাত্তর-পূর্ব সরকারগুলোর ভেতর থাকতো, তবে কি এত কিছু ঘটতো?

মা.আলী ঃ হ্যাঁ, জিয়াউল হক এক অসাধারণ ইনসান ছিলো। সে বাংলাদেশ থেকে এসে আমার কাছে খুব আনন্দ প্রকাশ করেছিল। সাইক্লোনের সময় গিয়েছিলো। আমিই তাকে প্রথম বলেছিলাম বাংলাদেশে সাহায্য পাঠানো প্রয়োজন। সে বললো, অবশ্যই প্রয়োজন, কিন্তু টাকা যে নেই। আমি একটা আইডিয়া দিলাম। সে দায়িত্বটা আমাকে দিলো। আমি এক থেকে দশ রূপী পর্যন্ত কুপন ছাপিয়ে সকল ব্যাংকে রেখে দিলাম বিক্রির জন্য এবং STATE BANK-M কে বললাম, তোমরা তদারক কর কোথায় কত জমা হয়। ৪৫ দিন পর STATE BANK জানালো ৪ কোটি ৭২ লক্ষ রূপী জমা হয়েছে। আজকের হিসাবে অনেক টাকা। জিয়াউল হক আমায় বললো নিয়ে যেতে। আমি বললাম তা হবে না। তোমরা বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিলেও আমি দেইনি। আমার পাসপোর্টে বাংলাদেশের ভিসা লাগাবো না। তুমি নিয়ে যাও। এরপর সে নিয়ে গেলো। ফিরে এসে খুব খুশি প্রকাশ করলো। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, তোমার কি মনে হয়, যারা পাকিস্তানের জনক, তারা কোনদিন পাকিস্তান ছেড়ে যেতো? কিন্তু ওদেরকে বাধ্য করা হয়েছে। সে বললো, তারা আমায় যেভাবে স্বাগত জানিয়েছে, তাতে তা-ই তো মনে হয়।

ঃ আপনি বাংলাদেশকে স্বীকারই করছেন না; অথচ আপনার দর্শন হচ্ছে ONE NATION TWO STATE। এখানে তো আপনি পৃথক রাষ্ট্রের অস্তিত্ব স্বীকার করে নিচ্ছেন?

মা.আলী ঃ দেখ, আমেরিকায় ৫২টি স্টেইট আছে। আমি তেমনি বলছি।

ঃ তাহলে কি আপনি কনফেডারেশনের কথা বলছেন?

মা.আলী ঃ না। আমি বলছি আসুন বসে আলোচনার ভিত্তিতে এমন পদ্ধতি গ্রহণ করবো, যা আগামী রাজনীতিতে নতুন সংযুক্তি হিসাবে প্রকাশ পাবে।

ঃ তাহলে আপনার ONE NATION TWO STATE গণতন্ত্রের মতোই একটি ফালতু স্লোগান মাত্র। এখানে কোন আইডিয়া নেই, আপনাদের শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে কি হবে?

মা.আলী ঃ ফালতু নয়। কথা হলো আমি যে আইডিয়া দেবো, তা কি তুমি গ্রহণ করবে? তাই বলি, বসে তোমার ও আমার মতামত মতো আইডিয়া তৈরী করা।

ঃ আপনি কি ব্যারিস্টার আজহারদের মতো আজো বাংলাদেশকে পূর্ব পাকিস্তান বলতে চান?

মা.আলী ঃ চা-ই কি শুধু? বলেও থাকি।

ঃ এটা কি পাগলামী নয় যে, ২৭ বছর পরও আপনি সাদাকে কালো বলছেন? তবে স্মরণ রাখবেন, আপনার বলা না বলায় বাংলাদেশের কোন লাভ-ক্ষতি হবে না। বাংলাদেশ আছে এবং থাকবে।

মা.আলী ঃ আরে মিয়া শোন (কিছুটা রেগে)। আমি অর্ধেক বাংলা নিয়ে বাংলাদেশ বলবো কেন? আমি তো চাই নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার বাংলা। যেদিন বেঙ্গল, আসাম ও পূর্ণিয়া জেলার কিছু অংশ নিয়ে বাংলা হবে, সেদিন মাহমুদ আলী বাংলাদেশ বলবে। আমি চাই পূর্ণ বাংলা।

ঃ পাকিস্তানও যে দাবী মতো হয়নি? তাহলে এটাকে পাকিস্তান না বলে হিন্দুস্তান বলুন।

মা.আলী ঃ আজো পাকিস্তন পূর্ণাঙ্গ হয়নি। আমাদের সংগঠন তাহরীকে তাকমীলে পাকিস্তানের অর্থই পূর্ণাঙ্গ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত করা।

ঃ পূর্ণাঙ্গ যখন হয়নি তবে অস্বীকার করুন, যেভাবে বাংলাদেশকে করছেন?

মা.আলী ঃ স্বীকৃতি অন্য ব্যাপার। বাংলাদেশ বলে আরেক দেশের কি প্রয়োজন? নামে তো কোন সমস্যা ছিলো না। পূর্ব পাকিস্তানে যে সমস্যা ছিল, তা কি আজকের বাংলাদেশে নেই? দেখ আসল সমস্যা হলো পূর্ব পাকিস্তানে জায়গা কম, জনসংখ্যা বেশি। যদি প্লান মতো হতো, তবে পূর্ব পাকিস্তানে জনসংখ্যার সমস্যা হতো না।

ঃ দেখুন জনাব, আপনি যে দর্শন বাজারে বিকাতে চাচ্ছেন, তা স্বাধীন বাংলায় চলবে না। কারণ, আপনি সাদাকে কালো দেখেন। অথচ বিলিজের স্পর্শে কালো রং প্রায় ২৭ বছর পূর্বে চলে গেছে। এখন বাংলাদেশই সত্য।

মা.আলী ঃ হা-হা-হা (এক অট্টহাসি)। মবনু মিয়া, আমারে হাসাইলা। কিছুদিন পরে বুঝবে মাহমুদ আলী কি বলতে চেয়েছিলো।

ঃ প্রকৃতপক্ষে আপনি বাস্তবতা অস্বীকার করছেন। ব্যারিস্টার আজহারদের মতো আপনিও পাগলামী করছেন।

মা.আলী ঃ না না, এটা সমস্যা নয়। তুমি স্টেইটের কি ব্যাখ্যা দেবে আমি কি দেব তা ভিন্ন কথা।

ঃ দুধ স্তন থেকে বেরিয়ে গেলে আর ঢুকানো যায় না। শেরে বাংলার কথা মতো হয়ে গেলে ছিলো ভিন্ন কথা। কিন্তু সোহরাওয়ার্দীর প্রস্তাব মতো হয়ে ভেঙ্গে যাওয়ার ফলে ভিন্ন অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে। তাই বুকে হাত দিয়ে বলতে পারি, আমরা আর পাকিস্তানী হবো না।

মা.আলী ঃ দেখ, একদিন সবাই বলবে মাহমুদ আলী যা বলেছে, তা-ই সত্য। আমি সে দিনের অপেক্ষায় থাকলাম।

ঃ জনাব, আপনার সে দিন কোন দিন আসবে না। '৪৭-এ যারা আমাদেরকে ছেড়ে ভারতে গেছে, তারা চায় বাংলাদেশ ভারতের সাথে মিশে যাক। আবার '৭১-এ আপনারা যারা পাকিস্তানে এসেছেন, তারা চান বাংলাদেশ আবার পাকিস্তান হয়ে যাক। আর আমরা যারা বাংলাদেশী, তারা বলি, আমরা যেমন '৪৭-এর ভারতীয় নির্যাতনের

কথা ভুলিনি, তেমনি '৭১-এর পাকিস্তানী নির্যাতনের কথাও ভুলব না। তাই আমরা দাঁড়িয়ে থাকতে চাই, প্রতিষ্ঠা চাই আমাদের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব নিয়ে। তাই বলছি, আপনার স্বপ্ন কোনদিন বাস্তবে রূপ নেবে না।

মা.আলী ঃ রূপ নেবে। একদিন নেবে। সোভিয়েতের যে অবস্থা হয়েছে, তা কি কেউ দু'দিন আগেও বুঝতে পেরেছে? জার্মান আবার এক হয়েছে।

ঃ দু' জার্মানের মধ্যে মাত্র এক দেয়ালের ব্যবধান আর পাক-বাংলার মধ্যে ব্যবধান এগারো শ' মাইলের।

মা.আলী ঃ আবার যুক্তরাষ্ট্রের হাওয়াই-এর সাথে আমেরিকার ব্যবধান পাঁচ হাজার মাইলের।

ঃ ওদের মাঝখানে কোন শত্রু রাষ্ট্র নেই। কিন্তু এখানে পাক-বাংলার মধ্যখানে শত্রু রাষ্ট্র রয়েছে।

মা.আলী ঃ আলাস্কা আর আমেরিকার মধ্যখানে কানাডা। যা পৃথক স্বাধীন একটি দেশ। দু'দেশের মধ্যখানে ভারতের মত দেশের কত উদাহরণ নেবে?

ঃ যুক্তি আর বাস্তবতা এক হয় না অনেক সময়। পাক-বাংলার ব্যাপারেও তাই। মানসিক ও সাংস্কৃতিকভাবেই বাংলাদেশী মুসলমান আর পাকিস্তানী মুসলমান এক নয়। ওরা সামাজিকভাবে একে অন্যকে হিংসা করে।

মা.আলী ঃ সিলেটি আর নন সিলেটির মধ্যে হিংসাহিংসি কি নেই। পাকিস্তান হওয়ার সময় সিলেটিরা সব চাইতে এগিয়ে ছিলো শিক্ষা ও অর্থের দিক থেকে। আজও মনে হয় আছে। তাই অন্য জেলার লোকেরা হিংসা করতো। আমি পাকিস্তান ডাক বিভাগের দায়িত্বে থাকাকালীন সময় আমার সেক্রেটারী ছিলো গিয়াস উদ্দিন চৌধুরী। তাঁর ছেলে মুহসিন আলী বর্তমানে পাকিস্তানে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত। সে সিলেটি। এর পূর্বে ছিলো সিলেটের শফি সামী। পাকিস্তান হওয়ার পর ১৭ জন মুন্সেফ নিয়োগ দেয়া হলো। ইন্টারভিউতে ১৭ জনই পাস করলো সিলেটি। অন্য জেলার কেউ পাস করলো না। ফলে ওরা আমাদেরকে হিংসার চোখে দেখতো। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের ব্যাপার অনেকটা সে রকম-ই। আস্তে আস্তে এগুলো দূর হবে।

ঃ আপনি অপেক্ষা করতে থাকুন। আমাদেরকে বিদায় দিন। সময় দেওয়ার জন্য অনেক ধন্যবাদ।

মা.আলী ঃ তোমাকেও ধন্যবাদ।

একাত্তর সম্পর্কে সাবেক পাক সেনা অফিসার রাও ফরমান আলীর কিছু কথা

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাসের সচেতন পাঠকদের কাছে অতি পরিচিত একটি নাম রাও ফরমান আলী। ১৯৬৭ সাল থেকে একাত্তর পর্যন্ত তিনি বাংলাদেশে (তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান) ছিলেন। প্রথম দুই বছর সেনাবাহিনীর অফিসারের দায়িত্বে থাকার পর ১৯৬৯ সালে তাকে গভর্নরের উপদেষ্টা নিয়োগ করা হয়। পাক বাহিনীর পরাজয়ের পর থেকে ১৯৭৪ সালে পর্যন্ত ভারতের জেলে ছিলেন। সত্তরোর্দ্ধ বৃদ্ধ সাবেক এই সেনা অফিসার বর্তমানে ইসলামাবাদে আছেন। ২২শে মার্চ ১৯৯৯ সালের বিকালে উপস্থিত হলাম তার ইসলামাবাদস্থ বাসায়। পরিচিতি পর্ব টেলিফোনে শেষ হয়ে যাওয়ায় তিনি আমাদের অপেক্ষায় ছিলেন। সালাম-কালামের পর জানতে চাইলাম–কেমন আছেন? হাসতে হাসতে বললেন–বৃদ্ধ বয়সে মানুষ যেমন থাকে।

ঃ একাত্তরে পাকিস্তান পক্ষের একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি আপনি। একাত্তর সম্পর্কে কি কিছু বলবেন? আপনার দৃষ্টিতে কে দায়ী?

রাও ফরমান আলী ঃ দেখুন, একাত্তরের ব্যাপারে কোন এক ব্যক্তি বা গ্রুপকে দোষী হিসাবে চিহ্নিত করা যাবে না। এটা তৈরী হয়েছে সরকার থেকে শুরু করে বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের কর্মতৎপরতা থেকে। একাত্তরের সূচনা প্রকৃতপক্ষে পাকিস্তানের জন্মের অনেক পূর্বে। একাত্তরে এসে তার বিস্ফোরণ ঘটেছে। লাহোর প্রস্তাবের পর বাংলার মুসলিম নেতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী কায়েদে আজমের কাছে প্রস্তাব করলেন, চৌধুরী রহমত আলীর প্লান মতো সম্পূর্ণ বাংলা ও আসাম নিয়ে স্বাধীন যুক্ত বাংলা গঠনের। জিন্নাহ্ বললেন, সামনে অগ্রসর হও। সোহরাওয়ার্দী সহেব যখন এই পথে অগ্রসর হতে লাগলেন, তখন হিন্দুরা প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ালো। তারা ভাবলো, সম্পূর্ণ বাংলা ও আসাম নিয়ে যদি যুক্ত বাংলা হয়, তবে মুসলমানরা সংখ্যায় বেশি হয়ে যাবে। ক্ষমতা তাদের হাতে থাকবে। কংগ্রেস বললো, আমাদের অসুবিধা নেই যুক্ত বাংলার ব্যাপারে, কিন্তু তা হতে হবে ভারতের অংশ। গান্ধীজীরও মৌন সমর্থন ছিলো তাই। সোহরাওয়ার্দী দেখলেন শেষ পর্যন্ত সব যাবে। তাই তিনি ১৯৪৬ ইংরেজীর ১০ই এপ্রিল মুসলিম লীগের দিল্লীর অধিবেশনে ইউনাইটেড পাকিস্তানের প্রস্তাব করলেন এবং তা পাস হয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত এভাবেই পাকিস্তানের আত্মপ্রকাশ ঘটে।

যদি লাহোর প্রস্তাব মতো দুই অংশ পৃথক স্বাধীন রাষ্ট্র হতো, তবে দুঃখ ছিলো না। কিন্তু লজ্জাজনক ঘটনার মধ্য দিয়ে পৃথকতা সত্যই দুঃখজনক। যদিও শেরে বাংলার লাহোর প্রস্তাব মতো পাকিস্তান না হয়ে সোহরাওয়ার্দীর দিল্লীর প্রস্তাব মতো পাকিস্তান হয়েছে হিন্দুদের প্রতিবন্ধকতার কারণে, কিন্তু তবুও সত্য যে, তাদের ভেতর থেকে তো

স্বাতন্ত্র্য যায়নি এবং তা আবার ময়দানে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। আর সেই ধারাবাহিকতায় শেষ পর্যন্ত একাত্তর। এখানে উভয় অঞ্চলের নেতাদেরই ভুল কর্ম জড়িত ছিলো। তবে বিশেষ করে পশ্চিম পাকিস্তানের নেতাদের ভুল ছিলো মারাত্মক। তারা বাংলার সাথে কলোনীর মতো ব্যবহার করেছেন, কোন ন্যায্য অধিকার দিতে রাজী ছিলেন না। ওরা গণতন্ত্রের কথা বলতেন, আবার ভয় করতেন যদি ক্ষমতা বাংলায় চলে যায়। পূর্ব পাকিস্তান থেকে খাজা নাজিম উদ্দিন মোহাম্মদ আলী বগুড়া এবং শহীদ সোহরাওয়ার্দী পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন। কিন্তু সোহরাওয়ার্দী ছাড়া বাকী দু'জনের কোন জনভিত্তি ছিলো না। আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা সোহরাওয়ার্দী, তাই এই দলেই মানুষ বেশি ছিলো। ওরা যখন স্বাধীনতার কথা বলেছে, সবাই তাদের পক্ষ নিয়েছে।

ঃ পাকিস্তানের জন্ম মুসলমানদের স্বাধীনতার জন্য, ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য। কিন্তু তা তো হলো না।

রাও আলী ঃ পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা নেতাদের কেউ ইসলামপন্থী ছিলেন না। পাকিস্তান তৈরীর উদ্দেশ্য ছিলো হিন্দুস্তানে মুসলিম শক্তি বৃদ্ধি করা। আমাদের এই অনৈসলামিক নেতৃত্বের ফলে নিজেদের শক্তি নিজেরাই ধ্বংস করে দিলাম।

ঃ এই সেক্যুলার নেতৃত্ব এলো কিভাবে?

রাও আলী ঃ বৃটিশ শাসিত হিন্দুস্তানে যারা মুসলিম নেতা ছিলেন, তারা ছিলেন যোগ্যতাসম্পন্ন। গোটা ভারতবর্ষে প্রায় একই অবস্থা ছিল। তারা অনেকেই পাকিস্তানের পক্ষে ছিলেন। কিন্তু পাকিস্তান হওয়ার পর যখন নির্বাচনের ভিত্তিতে নেতৃত্ব আসতে লাগলো, তখন দেখা গেলো যারা আসছে তারা প্রকৃতপক্ষে আঞ্চলিকতার জ্বরে আক্রান্ত। এখানে যোগ্যতার কোন গুরুত্ব ছিলো না। ফলে আন্তর্জাতিক যোগ্যতাসম্পন্ন নেতারা পেছনে যেতে লাগলেন এবং আঞ্চলিক সংঘাতগুলো জাতীয় রাজনীতিতে প্রভাব বিস্তার করতে লাগলো। গোটা জাতি যখন আঞ্চলিকতায় পরস্পরে প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠলো, তখন নীতি এবং ধার্মিকতার গুরুত্ব কমতে লাগলো। নেতাদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হয়ে গেলো যে কোনভাবে নির্বাচিত হওয়া। ফলে দেখা যায়, অনেক সেক্যুলার নেতাও নির্বাচনের সময় ধর্মের মুখোশ পরে সাধারণ মানুষকে ধোঁকা দিচ্ছে। এভাবেই বাংলা ও পাকিস্তানে সেক্যুলার নেতৃত্ব এসেছে।

ঃ পাকিস্তান যেসব কারণে ভেঙ্গেছে, তার একটি সামরিক শাসন। আপনি তৎকালীন একজন সামরিক অফিসার হিসাবে এর ব্যাখ্যা কিভাবে দিবেন?

রাও আলী ঃ হ্যাঁ, এটা একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ। পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে বাংগালী ছিলো না। আর সামরিক শাসন তো একমাত্র সৈন্যদের শাসন। আইয়ূব খান সকল রাজনৈতিক তৎপরতা নিষিদ্ধ ঘোষণা করলে বাংগালীরা মর্মাহত হলো। প্রথম কারণ, সেনাবাহিনীতে তাদের লোক নেই। দ্বিতীয় কারণ, রাজনৈতিক অধিকার হরণ।

রাজনৈতিক তৎপরতা নিষিদ্ধ ঘোষিত হওয়ার পর নেতৃত্ব চলে গেলো ছাত্রদের হাতে। ছাত্রদের স্বভাবজাত ধর্ম হলো বড় বড় স্বপ্ন দেখা। পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্ররাও পৃথক হয়ে বড় বড় অফিস, আদালত, সেনাবাহিনী ইত্যাদিতে চাকরির স্বপ্ন দেখতে লাগলো। সেই স্বপ্নই তাদেরকে সামনের দিকে নিয়ে গিয়েছিলো।

ঃ পশ্চিম পাকিস্তান আমাদের চাল-পাট সব শোষণ করে নিয়ে যেত তাই নয় কি?

রাও আলী ঃ উভয়পক্ষ যে সকল অপপ্রচার চালিয়েছিল, তা সর্বাংশে সত্য ছিলো না। যেমন মনে কর, বাংগালীরা বলতো, আমাদের চাল-পাট নিয়ে যাচ্ছে। তা কিন্তু সত্য ছিলো না। জনতাকে উত্তেজিত করতে এসব অপপ্রচারের প্রয়োজন ছিলো। তবে আবার কিছু কিছু প্রচার সত্যও ছিলো। যেমন বলা হতো, পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে জিনিসপত্রের মূল্য কম। একথা সত্য ছিলো। তেমনি বলা হতো পূর্ব পাকিস্তানকে শোষণ করে পশ্চিম পাকিস্তান উন্নত করা হচ্ছে। বাস্তবে ইসলামাবাদ ছাড়া পশ্চিম পাকিস্তানের কোন অঞ্চলই পূর্ব পাকিস্তান থেকে বেশি উন্নত হয়নি। কিন্তু ওখান থেকে যারা আসতো, তারা তো শুধু ইসলামাবাদ দেখেই চলে যেত। তুমি এখনো পাকিস্তানের যে কোন অঞ্চলের গ্রামে গিয়ে একথার সত্যতা যাচাই করে দেখতে পার।

ঃ একাত্তরে পাকিস্তানীদের ধারণা ছিলো বাংলায় কোন মুসলমান নেই। সৈন্যরা সেখানে কাফের হত্যা করছে?

রাও আলী ঃ বললাম তো রাজনৈতিক স্বার্থে উভয়পক্ষ থেকেই অপপ্রচার হয়েছে। সবাই একের সাথে তিন যোগ করেছে। পাকিস্তানের ভূট্টো সাহেবরা প্রচার করলেন বাংলাদেশে হিন্দুদের সাথে লড়াই চলছে। ফলে এখানের মানুষের বদ ধারণা সৃষ্টি হলো। অথচ আমি দেখেছি, পূর্ব পাস্তানের মুসলমান পশ্চিম পাকিস্তানের মুসলমান থেকে ধার্মিক। আর ভুট্টো সাহেবরা তো সেক্যুলার ছিলেন।

ঃ এই অপপ্রচারের কারণ কি?

রাও আলী ঃ প্রধান কারণ দূরত্ব। যদি পাশাপাশি হতো, তবে এসব অপপ্রচারে কাজ হতো না। একের সাথে অন্যের বন্ধুত্ব সৃষ্টি হত।

ঃ এই দূরত্বের কথা তো '৪৭-এর পূর্বেও জিন্নাহ সাহেবের সামনে বৃটিশরা উপস্থাপন করেছিলো?

রাও আলী ঃ আমি তো বললামই, পাকিস্তান আন্দোলনের প্রথম দাবী ছিলো পূর্ব ও পশ্চিম নিয়ে পৃথক দু'টি রাষ্ট্র গঠন করা। স্বয়ং গান্ধীজী বেঙ্গল ও আসাম নিয়ে পৃথক রাষ্ট্রের বিরোধিতা করলেন। এর পর অনেক আন্দোলনের মাধ্যমে বেঙ্গলের অর্ধেক এবং আসামের কিছু অংশ নিয়ে পূর্ব পাকিস্তান হলো। সোহরাওয়ার্দীর প্রস্তাবে শেষ পর্যন্ত এক পাকিস্তান হলো। সেই সময় সোহরাওয়ার্দীর অনেক ভাষণে এসব কথা বার বার এসেছে। খতিয়ে দেখতে পার, কেন এত দূরত্বের পরও এক পাকিস্তান হলো? তবে বুঝবে, সেদিনের এই সিদ্ধান্ত ভুল ছিলো না। যদি সেদিন সোহরাওয়ার্দী সিদ্ধান্ত নিতে

ভুল করতেন, তবে হয়তো বাংলার অবস্থা কাশ্মীরের মতো হতো। সোহরাওয়ার্দী সুবিজ্ঞ নেতা ছিলেন।

ঃ একাত্তরের ২৫শে মার্চ আপনারা যে মিলিটারী এ্যাকশনে গেলেন–এর কারণ কি?

রাও আলী ঃ নির্বাচনে মুজিব বিজয়ী হলেন। ভুট্টো সাহেব দুই মেজরিটি পার্টি দাবী করে সমস্যা সৃষ্টি করলেন। ভুট্টো সাহেবের এই দাবীর বিরুদ্ধে আমি প্রেসিডেন্ট সাহেব (অর্থাৎ ইয়াহিয়া)-কে বলেছি। সাথে সাথে প্রস্তাব করেছি, শেখ মুজিবকে প্রধানমন্ত্রী করা হোক। সে নির্বাচিত নেতা। এক দেশে তো দুই প্রধানমন্ত্রী হতে পারে না।

ঃ তখন আপনি কোন্ দায়িত্বে ছিলেন?

রাও আলী ঃ গভর্নরের উপদেষ্টা। পূর্ব পাকিস্তানে আমি '৬৭ থেকে '৬৮ এই দু'বছর সেনাবাহিনীর দায়িত্বে ছিলাম। এর পর থেকে '৭১-এর ১৬ই ডিসেম্বর পর্যন্ত গভর্নরের উপদেষ্টা। এটা বিষহীন সাপের মতো একটা দায়িত্ব। নিজস্ব কোন অফিস ছিলো না। গভর্নর হাউসেই থাকতাম। নির্বাচনের পর প্রেসিডেন্ট আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, কি করা! বলেছিলাম, নির্বাচিত প্রতিনিধির কাছে ক্ষমতা দেয়া হোক। তা করা হলো না। ২৪শে ফেব্রুয়ারী কিংবা ১লা মার্চ কেন্দ্র থেকে বলা হলো ৩রা মার্চ যে পার্লামেন্ট বৈঠক হওয়ার কথা ছিলো তা হবে না। ফলে পূর্ব পাকিস্তানে প্রতিবাদ আন্দোলন শুরু হলো। শেখ মুজিব ৭ই মার্চ পল্টন ময়দানে ঘোষণা দিলেন অসহযোগ আন্দোলনের। ১৬ই মার্চ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া পূর্ব পাকিস্তান গেলেন। ১৭ ও ১৮ই মার্চ দু'দিনের আলোচনার মাধ্যমে উভয়ের মধ্যে সমঝোতা হলো। কিন্তু তা কার্যকর করতে ভুট্টো সাহেবের মতামতের প্রয়োজন ছিলো। ১৯শে মার্চ তিনি ঢাকায় পৌঁছেন। প্রেসিডেন্ট বললেন, আমি নির্বাচিত প্রতিনিধির কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করে বিদায় নেব। ভুট্টো সাহেব বললেন, আপনি আলোচনা ছাড়া ক্ষমতা হস্তান্তর করতে পারেন না। মুজিব বললেন, জনতার রায়ের পর এ ব্যাপারে আর কোন আলোচনার প্রয়োজন নেই। এখানে আবার মতানৈক্য দেখা দিলো।

২৩শে মার্চ 'ইয়াওমে পাকিস্তান'। মুজিব এই দিন তার বাড়ীতে পাকিস্তানের পতাকার পরিবর্তে বাংলাদেশী পতাকা উত্তোলন করলেন। বাংলাদেশী পতাকা গাড়ীতে উড়িয়ে প্রেসিডেন্টের সাথে দেখা করতে আসেন। অনেকে এর বিরুদ্ধে কথা বললেও প্রেসিডেন্ট ছিলেন নীরব। এদিকে গোটা দেশের সেনাবাহিনী ছিলো অবরোধের মুখে। ২৪শে মার্চ প্রেসিডেন্টের নির্দেশে সেনাবাহিনী নিজেদের হাতে ক্ষমতা নিয়ে নেয়। এরপর শুরু হয় এ্যাকশন। এডমিরাল এস এম, আমি এবং সাহেবজাদা ইয়াকুব খান লিখিতভাবে মিলিটারী এ্যাকশনের বিরোধিতা করেছি। আমাদের প্রস্তাব ছিলো রাজনৈতিক আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করা হোক। এটা সম্ভব ছিলো। রাত দশটা-এগারোটার দিকে সেনাবাহিনীর এক ইউনিট ঢাকা থেকে নারায়ণগঞ্জ যেতে চাইলে ছাত্র-জনতার পিকেটিং-এ আটকা পড়ে। এ সময় একদল পুলিশ সেনাবাহিনীর

ইউনিটে গুলি চালায়। প্রথম সংঘাতটা এভাবেই শুরু হয়। সেনাবাহিনীর কাছে শক্তিশালী অস্ত্র ছিলো তাই বাংগালীরা বেশি আহত হলো, প্রাণ হারালো।

তোমার প্রশ্ন ছিলো এ্যাকশনের কারণ কি? প্রকৃত কারণ তো ইয়াহিয়া ও ভুট্টো সাহেব বলতে পারবেন। তবে ধারণার ভিত্তিতে আমি দু'টো কারণ বলতে পারি।

প্রথমতঃ হতে পারে, সেনাবাহিনীর প্যারালাল সরকার গঠনের লক্ষ্যে এ্যাকশন। দ্বিতীয়তঃ হতে পারে শেখ মুজিব কর্তৃক সরকার অস্বীকার করায় বাস্তবিক অর্থে পূর্ব পাকিস্তানে কোন সরকার ছিলো না। তাই নতুন সরকার প্রতিষ্ঠার চেষ্টা।

ঃ একাত্তরে যে রাজাকার বাহিনী গঠন করেছিলেন, তার উদ্দেশ্য কি বাংগালী দিয়ে বাংগালীকে ধ্বংস করা ছিলো?

রাও আলী ঃ না না। একাত্তরে এ উদ্দেশ্যে রাজাকার বাহিনী গঠন করা হয়নি। মুজাহিদ বাহিনী ও রাজাকার বাহিনী গঠন করা হয়েছিলো হিন্দুস্তানের সাথে যুদ্ধ সংঘটনের প্রশ্নে। ১৯৬৫ সালের যুদ্ধে বাংগালীরা সাহসী ভূমিকা রেখেছিল।

ঃ অনেকে মনে করেন, আইয়ূব খানের উপর আমেরিকার ভূত আছর করেছিলো। এশিয়ার রাজনীতিতে প্রভাব বিস্তারের উদ্দেশ্যে আমেরিকা চায়নি পাকিস্তান শক্তিশালী হোক। তাই আইয়ূব খানকে দিয়ে পাকিস্তান ভাঙ্গার ব্যবস্থা করেছে– তাদের এ তথ্যটি সঠিক?

রাও আলী ঃ আইয়ূব খানের কারণে পাকিস্তান ভেঙ্গেছে, এ কথা সঠিক নয়। সে তো রাজনৈতিকভাবে পূর্ব পাকিস্তানকে প্রাপ্য অধিকার দিতে চেয়েছে। এ নিয়ে আব্দুস সবুর খানের সাথে তার আলাপও হয়েছিলো।

ঃ কি নিয়ে?

রাও আলী ঃ সবুর খানকে সে বলেছিলো, তোমরা পৃথক হয়ে দেশ চালাও। সবুর খান পাকিস্তান ভাঙতে চাননি। আইয়ূব খানের সাথে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট কেনেডীর সম্পর্ক তেমন ভালো ছিলো না। আইয়ূব খান অত্যন্ত ব্যক্তিত্বসম্পন্ন লোক ছিলেন। তৎকালীন দুনিয়ার শাসকদের মধ্যে চেহারায় ও লম্বায় অত্যন্ত আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন তিনি। আর কিছুর জন্য না হলেও শুধু এই কারণে তিনি বিশ্বে দ্রুত পরিচিতি লাভ করেছিলেন। প্রেসিডেন্ট কেনেডি সাহেবের স্ত্রী আইয়ূবের প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছিলেন। (তুমি এ সব লিখবে না কিন্তু)। তাই একদিন কেনেডি আইয়ূব খানকে বললেন, "তুমি নিজেকে অনেক কিছু ভাবতে শুরু করেছো। তোমার সাইজটা একটু ছোট কর"।

আসলেই আইয়ূব যেমন লম্বা ছিলেন, তেমনি ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ছিলেন। স্বয়ং ভারতের রাজনীতিকরা পর্যন্ত বলতেন "আমাদের দেশে একজন আইয়ূবের প্রয়োজন।" মোটকথা, তৎকালীন সময় তিনি এশিয়ার টাইগার ছিলেন। তিনি আমেরিকাকে পরিস্কার বলে দিয়েছিলেন- "পাকিস্তান বন্ধু চায় মাষ্টার চায় না।" আজকের মতো সে দিনও আমেরিকা শক্তিশালী ছিলো। তারা চায়নি কেউ মাথা উঁচু করে দাঁড়াক। এদিকে

বিবেচনা করলে হয়ত বা তুমি বলতে পার, আইয়ূবের প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়ে পাকিস্তানকে ভেঙ্গে দেয়া হয়েছে। তা ছাড়া আরেকটি কারণে আইয়ূব খানকে দায়ী করা যায়, তা হলো মোনাইম খানকে গভর্নর নিয়োগ করে দীর্ঘ দিন রাখা। মোনাইম খান সাহেবের বাংগালী জনসাধারণের সাথে কোন সম্পর্ক ছিলো না। তিনি সর্বদা পশ্চিম পাকিস্তানের সাথে সম্পর্কিত ছিলেন। প্রাদেশিক গভর্নরের দায়িত্ব হয় স্থানীয় জনসাধারণের সাথে কেন্দ্রের যোগাযোগ করা। তিনি এতে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন। তার কারণে স্থানীয় ছাত্র-জনতা, রাজনীতিক, শ্রমিকরা বিদ্রোহী হয়ে উঠে। সে সময় ব্যক্তিগত সফরে আমি পূর্ব পাকিস্তানে গিয়ে দেখেছি, মানুষ যতটুকু আইয়ূব খানের বিরুদ্ধে, তা থেকে বেশি মোনাইম খানের বিরুদ্ধে। মোনাইম খানকে বাংলার কেউ পছন্দ করতো না। ফলে দেশ বিভক্তির দিকে অগ্রসর হতে থাকে।

ঃ একাত্তরে আপনি ঘটনাস্থলে ছিলেন। যা হয়েছে তা কি আপনি জুলুম মনে করেন?

রাও আলী ঃ এটা অবশ্যই জুলুম। তবে কমবেশি দু'পক্ষই জুলুম করেছে। প্রথমদিকে বাংগালীরা যে এ্যাকশনে গিয়েছিলো, তাও কিন্তু জুলুম ছিলো।

ঃ আপনার কথা আমি বুঝতে পারছি না।

রাও আলী ঃ উর্দুভাষী বলে বাংগালীরা বিহারীদেরকে হত্যা, নির্যাতন করেছে। রংপুর-সৈয়দপুর অঞ্চলে ৭ই মার্চ থেকে ২৫শে মার্চ পর্যন্ত বিহারীদেরকে কতলে আম (গণহত্যা) করা হয়েছে। ময়মনসিংহে চারশ' পশ্চিম পাকিস্তানীকে হত্যা করা হয়েছে। ব্রাহ্মণবাড়ীয়াতে প্রচুর বিহারীকে হত্যা করা হয়েছে। মেজর রহিম যখন ব্রাহ্মণবাড়ীয়া ক্লিয়ার করেন, তখন প্রচুর পশ্চিম পাকিস্তানী ও বিহারী শিশু ও নারীর লাশ আবিষ্কার করেন। সে সময় রেলওয়েতে প্রায় সবলোক পশ্চিম পাকিস্তানী ছিলো। কেউ বাঁচেনি।

ঃ এই যে বললেন সকল কর্মচারী পশ্চিম পাকিস্তানী ছিলো, তাহলে পূর্ব পাকিস্তানে কি চাকরির যোগ্য লোক ছিলো না?

রাও আলী ঃ পাকিস্তান স্বাধীন হয়েছে বৃটিশ শাসন থেকে। পূর্ব বাংলার রেলওয়েতে সে সময় যারা ছিলো, পাকিস্তান হওয়ার পর তারাই রয়েছে। ওরা ছিলো বেশির ভাগই কলকাতার লোক। পাকিস্তানে তারা মুহাজির ছিলো। হিজরতের পর তারা পশ্চিম পাকিস্তানে বসতি স্থাপন করেছিলো।

ঃ আপনি যাদের কথা বলছেন, তারা হয়তো রাজাকারদের মতো পাক সেনাদেরকে সাহায্য করেছে?

রাও আলী ঃ দেশের সরকারকে সরকারী কর্মচারীরা সাহায্য করলে নিশ্চয় তা কোন অন্যায় নয়।

ঃ সরকার যদি অত্যাচারী হয়?

রাও আলী ঃ এ নিয়ে আমি তোমার সাথে তর্কে যেতে চাই না। এতক্ষণ যা বললাম, তা একদিকের। ২৩ ও ২৪ মার্চ পর্যন্ত এই দিকের জুলুম অব্যাহত ছিলো। এরপর শুরু হয় সেনাবাহিনী কর্তৃক জুলুম। মিলিটারী এ্যাকশনে ঢাকায় প্রচুর লোক প্রাণ হারায়। বাংগালীরা অনেক আগেই ভারত থেকে ট্রেনিং নিয়ে এসেছে। উভয় গ্রুপের শক্ত লড়াই শুরু হয়। আস্তে আস্তে মিলিটারী ঢাকা থেকে বের হয়ে গ্রামে-গঞ্জে যেতে শুরু করে। ওরা যেখানেই গেছে সেখানেই বিহারীরা সাহায্য করেছে। ফলে প্রচুর বাংগালী প্রাণ হারিয়েছে। যে সব যুদ্ধে সাধারণ মানুষ জড়িয়ে যায়, সে সব যুদ্ধে প্রাণহানি বেশি ঘটে। বন্দী অবস্থায় কোন মানুষকে হত্যা করা হারাম। কিন্তু পাকিস্তানী মিলিটারীরা যশোর-পাবনায় প্রচুর লোককে বন্দী করে হত্যা করেছে। এসব ঘটনা সামনে নিয়ে আমি বলতে পারি, ২৫ শে মার্চের পর বাংগালীদের উপর জুলুম করা হয়েছে। তবে বাস্তব কথা হচ্ছে সুযোগ মতো উভয়েই জুলুম করেছে।

ঃ নির্বাচনের ফলাফল শেখ মুজিবের পক্ষে যাওয়ার পরও আপনারা একশনে গেলেন কেন?

রাও আলী ঃ আমি তো বললামই এই এ্যাকশন সম্পূর্ণ অন্যায়, অযৌক্তিক এবং অপ্রয়োজনীয় ছিলো।

ঃ তবে গেলেন কেন?

রাও আলী ঃ প্রেসিডেন্ট (ইয়াহিয়া) নিজে ঢাকায় বসে নির্দেশ দিয়েছেন। তখন তো সামরিক শাসন ছিলো।

ঃ আপনি এজন্য প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়াকে দায়ী করছেন?

রাও আলী ঃ হ্যাঁ, অবশ্যই। তবে সে একা নয়। মুজিব ও ভুট্টো পরিস্থিতি খারাপ করেছে এবং ইয়াহিয়া পরিস্থিতি মোকাবেলায় সিদ্ধান্ত নিতে ব্যর্থ হয়েছে, সমাধান দিতে পারেনি, অবস্থা নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনি। এ জন্য এই তিনজন দায়ী।

ঃ বিচারপতি হামিদুর রহমান কমিশনের রিপোর্ট সম্পর্কে কিছু বলবেন কি?

রাও আলী ঃ এই রিপোর্ট ছিলো অসম্পূর্ণ। তা ছিলো শুধু মিলিটারীর বিরুদ্ধে। ফলে এর ভিত্তিতে শুধু মিলিটারীর লোকদের শাস্তি হয়েছে। রাজনীতিকদের সম্পর্কে কিছুই ছিলো না। অথচ ঘটনার জন্মদাতা, নির্দেশদাতা তারাই।

ঃ আপনি কি মনে করেন রাজনীতিকদেরও শাস্তি হওয়া প্রয়োজন?

রাও আলী ঃ তাদের অনেকেই এখন আর বেঁচে নেই। বিচার এখন আল্লাহ্ ছাড়া কে করবে?

ঃ হামিদুর রহমান কমিশনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য কি ছিলো?

রাও আলী ঃ এই কমিশনের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য ছিলো একটাই, কেন পূর্ব পাকিস্তানে মিলিটারী পরাজিত হলো? গোটা পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করা তাদের উদ্দেশ্য ছিলো না। তাই এই কমিশনের ভূমিকা খুব সীমাবদ্ধ ছিলো। আমি বলি, যদি

রাজনীতিকরা সমস্যা সৃষ্টি না করতেন এবং এ্যাকশনের নির্দেশ না দিতেন, তাহলে সেনাবাহিনী এ্যাকশনে যেতো না। শেখ মুজিবকে প্রধানমন্ত্রী করলে সেনাবাহিনী কিংবা পাকিস্তানের কোন অসুবিধা হতো না। অনেকে বলেন, এমন করা হলে তারা সবকিছু নিয়ে যেতো। আমি বলি, পাকিস্তান তো উড়োজাহাজ নয় যে, চালিয়ে নিয়ে যাবে। তাছাড়া শেখ মুজিব সম্পর্কে আমি বলি, আরো কিছুদিন অপেক্ষা করা উচিত ছিলো। সমস্যার সমাধান কিংবা পৃথক হয়ে যাওয়ার বিষয়টা আলোচনার মাধ্যমে সম্ভব ছিলো। শেখ মুজিব প্রকৃতপক্ষে আলোচনার মাধ্যমে সমাধান চাইতেন। সমস্যা ছিলো তাজউদ্দিন আর ভুট্টো। তাদের ভূমিকাই আলোচনার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছিল। শেখ মুজিবের ভেতরের খবর আমি জানি। সে আমার বন্ধু ছিলো। আমি প্রায়ই তার ঘরে যেতাম। তার সাথে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলাপ হতো। আমি বুকে হাত দিয়ে বলতে পারি, তাকে সংঘাতের দিকে তাজউদ্দিন পুশ করেছে। মুজিব কোনদিন পাকিস্তান ভাঙতে চায়নি।

ঃ আপনি বলছেন যে, শেখ মুজিব স্বাধীনতা চাইতেন না?

রাও আলী ঃ না প্রথম দিকে তিনি চাইতেন না। একাত্তরের তার সকল বক্তব্য যদি তুমি মন দিয়ে শোন, তবে আমার সাথে একমত হবে। ব্যক্তি শেখ মুজিব আর আওয়ামী লীগ এক নয়। আওয়ামী লীগে বিভিন্ন চিন্তার লোক ছিল, বহু গ্রুপ ছিলো। তিনটি গ্রুপ তো প্রকাশ্যই ছিলো। এর মধ্যে এক গ্রুপের নেতা ছিলেন তাজউদ্দিন। এক গ্রুপের নেতা মুস্তাক আহমদ এবং আরেক গ্রুপের নেতা আব্দুস সামাদ আজাদ। তাজউদ্দিন ও আজাদ দু'জনই সেক্যুলার ছিলেন। তবে তাজউদ্দিন ভারতপন্থী থাকায় পাকিস্তান ভাঙ্গার পক্ষে ছিলেন। আর আজাদ সাহেব চাইতেন পাকিস্তানে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে সমস্যার সমাধান করতে। খন্দকার মুস্তাক ছিলেন ডানপন্থী। শেখ মুজিবের মতো তিনিও ভাবতেন আলোচনার মাধ্যমে আওয়ামী লীগের ক্ষমতা গ্রহণ। তবে পৃথকতা নয়। মুস্তাক ও আজাদের নিয়ন্ত্রণে শেখ মুজিব দীর্ঘদিন ছিলেন। কিন্তু পাকিস্তান সরকার যখন দাবী না মানার পক্ষে দৃঢ়তা দেখাতে লাগলো, তখন শেখ মুজিব প্রভাবিত হয়ে যান তাজউদ্দিনের যুক্তিতে। ১৮ই মার্চ শেখ মুজিব গভর্নর হাউসে তাজউদ্দিন ও কামাল হোসেনকে সাথে নিয়ে আসেন। আমি তখন সেখানে ছিলাম। আলোচনা শুরু হতে না হতেই তাজউদ্দিন উত্তেজিত হয়ে বলেন-"আমরা শান্তিপূর্ণ সমাধান চাই না। সমাধানের পথ আমরা খুঁজে নিয়েছি। প্রস্তুত হচ্ছি।"

শেখ মুজিব তখন তাজউদ্দিনকে থামিয়ে বললো- আপনি একটু বাইরে যান। তাজউদ্দিন চলে যাওয়ার পর শেখ মুজিব বললেন- দয়া করে আমাকে নতুন একটা তারিখ দিন। আমি সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করে নেব। এ কথা বলে তিনি চলে যান। আমি, জেনারেল ইয়াকুব (পরবর্তী সময়ে পাকিস্তানের মন্ত্রী সাহেবজাদা ইয়াকুব) এবং এডমিরাল এস এম গভর্নর হাউস থেকে কেন্দ্রে টেলেক্স পাঠালাম যে, দয়া করে আজ রাতেই নতুন তারিখ

দিন। আগামীকাল হবে অনেক দেরী। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, কোন তারিখ দেওয়া হলো না। যদি এই রাতে তারিখ দেওয়া হতো, তবে হয়তো বিষয়টা এত দূর গড়াত না। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা শেখ মুজিবের ছিলো। নতুন তারিখ দেওয়া হলো না। পুরাতন তারিখ বাতিল করা হলো। এর উপর আবার ভুট্টো সাহেব ঘোষণা দিলেন- "আমাকে ছাড়া এসেম্বলী বসতে পারবে না। পশ্চিম পাকিস্তানের যে লোক এই এসেম্বলীতে যাবে তার পা ভেঙ্গে দেব।" ফলে পরিস্থিতি খারাপ হতে থাকল। শত্রুরা সুবর্ণ সুযোগ কাজে লাগাল। আসলে পরিস্থিতি খারাপের জন্য ঐ রাজনীতিকরাই দায়ী। ভুট্টো দাবী করলো দুই মেজরিটি পার্টির ক্ষমতা ভাগাভাগির। অথচ এক পাকিস্তানে দুই প্রধানমন্ত্রী হয় কিভাবে? শেখ মুজিবের দল মেজরিটি ছিলো, তাকে ক্ষমতা দিলে সমস্যার সমাধান হয়ে যেত। তাছাড়া পাকিস্তানে এই সমস্যা সমাধানের মতো তখন কোন রাজনীতিক ছিলেন না। ভুট্টো সাহেবরা যখন দেখলেন, মুজিবকে তার দাবী থেকে পিছু হটান যাবে না, তখন ঢাকায় বসেই মিলিটারীর ক্ষমতা গ্রহণের প্লান করেন।

ঃ আপনার বক্তব্য থেকে স্পষ্ট, মুজিব আলোচনার মাধ্যমে সমাধানের পক্ষে ছিলেন কিন্তু ইয়াহিয়া ও ভুট্টো সেই সুযোগ দেননি?

রাও আলী ঃ যতক্ষণ পর্যন্ত শেখ মুজিবের বিশ্বাস ছিলো তিনি প্রধানমন্ত্রী হচ্ছেন, সেই সময় পর্যন্ত তার পক্ষ থেকে সমস্যা সৃষ্টি হয়নি। কিন্তু যখন ইয়াহিয়া-ভুট্টোর কারণে সমাধানে যেতে পারলেন না, তখন তাজউদ্দিন গ্রুপের ।

ঃ একাত্তরের পাক বাহিনীর আক্রমণের সাথে ইসলামের কি সম্পর্ক ছিলো। আপনারা কি বাংলার মানুষকে ইসলামের শত্রু ভাবতেন?

রাও আলী ঃ এখানে ইসলাম আসছে কেন? সংঘাত ছিলো দুই সেক্যুলার নেতার মধ্যে। মুজিব কিছুটা মধ্যপন্থী হলেও ভুট্টো সম্পূর্ণ সেক্যুলার ছিলেন। একাত্তরের সংঘাত ধর্ম নিয়ে নয়, শুধু ক্ষমতার মসনদ নিয়ে।

ঃ পাকিস্তানের জন্ম ইসলামের উদ্দেশ্যে। অথচ এখানে ইসলামী হুকুমত নেই?

রাও আলী ঃ তা সত্যিই আশ্চর্যজনক ব্যাপার। যে নেতাকেই জিজ্ঞেস করি, সে বলে আসবে। আমি বলি কিভাবে আসবে? পায়ে হেঁটে না উটে চড়ে। আজো এখানে প্রায় সকল দলের নেতাই বক্তৃতায় ইসলাম কায়েম করে থাকেন। কিন্তু বাস্তবে কিছুই নেই। অনেক নেতার তো ব্যক্তি জীবনেও ইসলাম অনুপস্থিত। লিয়াকত আলী খান OBJECTIVE REGULATION পেশ করেছিলেন যে, পাকিস্তান পরিচালিত হবে কোরআন সুন্নাহর বিধান মতে। তা জাতীয় সংসদে পাস হয়ে যায়, কিন্তু সিনেটে আজো পাস হয়নি।

ঃ মুসলিম লীগকে অনেকে রাজনৈতিক দল হিসাবে অস্বীকার করেন?

রাও আলী ঃ এটা কোন রাজনৈতিক নিয়মতান্ত্রিক দল ছিলো না। একটা মুভমেন্ট ছিলো মাত্র।

ঃ পাকিস্তান না হলে ভারতবর্ষের মুসলমানদের কি ক্ষতি হত?

রাও আলী ঃ ভারতে বৃটিশদের সহযোগিতায় হিন্দুদের আধিপত্য সৃষ্টি হয়েছিলো। বৃটিশরা ছেড়ে আসার সময় যে কংগ্রেসের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করছিলো, তারা সেক্যুলার মানসিকতার দাবী করলেও প্রকৃতপক্ষে তারা ছিলো ব্রাহ্মণ্যবাদী। মুসলমানদের প্রতি তারা বৈষম্যমূলক আচরণ করতো। স্বয়ং গান্ধীজীও মাঝে মধ্যে বলতেন, ভারতকে আমি রামরাজ্য করতে চাই। হিন্দু নেতাদের বৈষম্যমূলক আচরণ থেকেই গড়ে উঠে পাকিস্তানের চিন্তা। প্রকৃতপক্ষে পাকিস্তান কোন দেশের নাম নয়। পাকিস্তান হচ্ছে হিন্দুস্তানের মুসলমানদের মুক্তির স্লোগান।

ঃ পাকিস্তান তো আজো বৃটিশ ও হিন্দুদের নিয়মে চলছে বলে আমার ধারণা। তাহলে পাকিস্তান সৃষ্টি করে লাভ হলো কি?

রাও আলী ঃ লাভ অনেক হয়েছে। যখন পাকিস্তান ছিলো না এবং যদি না হতো, তবে মুসলমানরা ভারতে গোলামের মতো থাকতো। বিশ্বাস কর, পাকিস্তান হওয়ার পূর্বে গোটা উপমহাদেশের মুসলমানদের জানাই ছিলো না, দেশের সম্পদ কিভাবে আমদানী-রপ্তানী হয়। ব্যাংক, বীমা, ব্যবসা, শিক্ষা, রাজনীতি কিভাবে চলছে। বড় পদে হিন্দুরা ছিলো। দু'শ' বছরের শোষণের ফলে মুসলমানরা সর্ব দিকে পেছনে ছিলো। গোটা বাংলায় মুসলমানদের মধ্যে মাত্র একজন সিএসপি অফিসার ছিলো। চেয়ে দেখ, আজ পাকিস্তান হওয়ার কারণে মুসলমানেরা হিন্দুদের সাথে শুধু প্রতিযোগিতা নয়, অনেক ক্ষেত্রে এগিয়ে গেছে। ব্যাংকিং ব্যবস্থায় আজ মুসলমানরা প্রশংসনীয়ভাবে এগিয়ে আছে। আজকে পাক কিংবা বাংলায় যাদের ধনী দেখছো '৪৭-এর পূর্বে তাদের কোন অস্তিত্ব ছিলো না। মুসলমানদের মধ্যে বড় বড় ব্যবসায়ীও ছিলো না। গোটা লাহোরে মাত্র দু'একটি মুসলিম দোকান আনারকলিতে ছিলো। হিন্দু ও ইংরেজরা মিলে মুসলমানদেরকে এগিয়ে আসার সুযোগই দেয়নি। পাকিস্তান হওয়ার পর মুসলমানরা স্বাধীনভাবে কিছু করার সুযোগ পাচ্ছে। তুমি জিজ্ঞেস করে দেখ, মুসলমানরা হিন্দুদের সামনে চেয়ারে বসারও সুযোগ পেতো না। অথচ এই মুসলমানরা বৃটিশের পূর্বে প্রায় হাজার বছর ভারতবর্ষের শাসন করেছে। বৃটিশরা হিন্দুদের হাতে ভারত দিয়ে গেলো। নেহেরু যদিও নিজেকে সেক্যুলার হিসাবে প্রচার করতেন, বাস্তবে তিনি ছিলেন জাত ব্রাহ্মণ। আর যদি সেক্যুলারও হতেন, তবু মুসলমানদের জন্য ক্ষতি ছিলো। রাশিয়ার অবস্থা থেকে আমরা শিক্ষা নিতে পারি। তাই বলি, পাকিস্তান হওয়ায় হিন্দুস্তানের মুসলমানদের উপকার হয়েছে অবশ্যই।

ঃ পাকিস্তান হয়ে যদি লাভ হয়ে থাকে, তবে নিশ্চয় তা ভেঙ্গে ক্ষতিও হয়েছে। আপনি কি তাই মনে করেন?

রাও আলী ঃ পাকিস্তান ভেঙ্গে গেছে তা আমি বলি না। স্মরণ রাখা প্রয়োজন, পাকিস্তান কোন অঞ্চলের নাম নয়। ভারতবর্ষের যে অঞ্চলের মুসলমানই নিজেদের

স্বাধীনতা, স্বাতন্ত্র্যের কথা ভাববে সে-ই পাকিস্তানের চেতনায় উজ্জীবিত। সে-ই ১৯৪০-এর লাহোর প্রস্তাবের বাহক। সে-ই জিন্নাহ, শেরে বাংলা, সোহরাওয়ার্দী, কিংবা স্যার সলিমুল্লাহদের উত্তরসূরী। যারা বলে, দ্বিজাতিতত্ত্বের দর্শন ভুল ছিলো, তাদের চিন্তা সঠিক নয়। যদি তা ভুল হতো, তবে পশ্চিম বাংলার হিন্দু জনগোষ্ঠি স্বাধীন বাংলার সাথে মিশে যেত। কিন্তু তারা মিলতে পারছে না বাংলায় সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ মুসলমান হওয়ায়। আবার তারা হিন্দীভাষীদের সাথে থাকতে পারছে, কারণ ওরা হিন্দু।

ঃ ভারত, বাংলাদেশ, পাকিস্তান নিয়ে কেউ কেউ কনফেডারেশনের কথা বলছেন। এ সম্পর্কে আপনার মতামত কি?

রাও আলী ঃ ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের সাথে এই কনফেডারেশনের প্রচুর ব্যবধান রয়েছে। ইউরোপের প্রত্যেক দেশ তাদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখছে। এই রকম করলে তো কোন বাধা নেই। কিন্তু এর পূর্বে যাদেরকে নিয়ে কনফেডারেশন হবে, তাদের মধ্যকার মতানৈক্য দূর করতে হবে। আমার মতে, ভারত যে কনফেডারেশনের প্রস্তাব করছে, তা হতে পারে যদি কাশ্মীরকে স্বতন্ত্র রাষ্ট্র হিসাবে স্বীকার করা হয় এবং আফগানিস্তান ও মালদ্বীপকে সাথে রাখা হয়। অর্থাৎ-ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, কাশ্মীর, আফগানিস্তান, মালদ্বীপ, নেপাল, ভুটান, শ্রীলংকা নিয়ে কনফেডারেশন হতে পারে। তবে এর পূর্বে পাকিস্তান ও বাংলাদেশের সাথে ভারতের যে সমস্যা রয়েছে, তার সমাধান হওয়া জরুরী। নতুবা কোন প্রকার কনফেডারেশন বাতুলতা মাত্র।

ঃ বাংলাদেশে আপনি কতদিন ছিলেন এবং কোন্ কোন্ জেলায় ছিলেন?

রাও আলী ঃ ১৯৬৭ সাল থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত ছিলাম। মূলত ঢাকায়ই ছিলাম। তবে প্রায় সকল জেলা সফর করেছি।

ঃ কখনো কি সিলেট গেছেন?

রাও আলী ঃ দু'তিনবার গিয়েছি শাহ জালালের মাজার ও টি গার্ডেন দেখতে।

ঃ একাত্তরে নিয়াজীর আত্মসমর্পণকালে কোথায় ছিলেন এবং পাকিস্তানে কবে ফিরেন?

রাও আলী ঃ ঢাকায় Pow তে। ফিরে আসি ১৯৭৪ সালে।

ঃ ১৬ই ডিসেম্বরের পর থেকে ১৯৭৪ পর্যন্ত কোথায় ছিলেন?

রাও আলী ঃ ভারতের জেলে।

ঃ সেখানে কি কোন খারাপ ব্যবহার করা হয়েছে?

রাও আলী ঃ না, ভারতের অনেক সিনিয়র অফিসার বৃটিশ আর্মীতে আমার সাথী ছিলো। তারা আমায় শ্রদ্ধা দেখিয়েছে। তবে মেজর প্রকৃতির ছোট অফিসাররা একটু আধটু শয়তানী করেছে।

ঃ আপনি সিনিয়র হিসাবে শ্রদ্ধা পেয়েছেন। বাকীদের অবস্থা কি ছিলো?

রাও আলী ঃ আমার জানা মতে কারো সাথে কোন বদ ব্যবহার করা হয়নি।

ঃ যুদ্ধকালীন সময়ে আপনি বাংলাদেশে ছিলেন। রাস্তায় রাস্তায় লাশ দেখে আপনার কি অনুভূতি হয়েছিল?

রাও আলী ঃ আমি যে অফিসে ছিলাম, তার অবস্থা ভিন্ন ছিলো। একদিনের ঘটনা বলি। সে দিন আমার কাছে তিন শ্রেণীর লোক আসে। প্রথমত আসে যশোরের ডেপুটি কমিশনারের স্ত্রী। সে বাংগালী। পশ্চিম পাকিস্তানের মিলিটারী তার স্বামীকে হত্যা করেছে। শুনে দুঃখ পেলাম। দ্বিতীয়ত, দশ-বারজন নারী, পুরুষ ময়মনসিংহ থেকে আসে। তারা জানালো, তাদের সামনেই নিজের আত্মীয়-স্বজনকে হত্যা, ধর্ষণ এবং মাটি চাপা দেওয়া হয়েছে। মর্মাহত হলাম। ওরাও ছিলো বাংগালী।

তৃতীয় ঘটনা ঃ এই দিন বগুড়া থেকে জানানো হলো মিলিটারী ডিপুতে আক্রমণ করে একজন অফিসারকে হত্যা করা হয়েছে। তার গর্ভবর্তী স্ত্রীকেও মাথায় আঘাত করে হত্যা করা হয়েছে। দুঃখ পেলাম। বাংগালী হোক পাকিস্তানী হোক তারা ছিলো মুসলমান। তারা ছিলো আমার আত্মার অংশ। তাই কষ্ট পেয়েছি।

ঃ আপনার বিরুদ্ধে আমাদের অনেক অভিযোগ আছে। বিশেষ করে আপনার ডাইরীতে লেখা ছিলো, "সবুজ মাটি রক্তে লাল করে দেব"?

রাও আলী ঃ সবই ভুল প্রচার। একাত্তরে আমার কোন শক্তি ছিলো না। তোমরা হয়তো জানো না, গভর্নরের উপদেষ্টা নামমাত্র একটা পদের নাম। আমাকে সরকার সম্পূর্ণ দুর্বল করে দেয় যখন আমি মিলিটারী এ্যাকশনের বিরুদ্ধে প্রেসিডেন্টকে বলি। এরপর রাজনৈতিক দিকে আমি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠি। কারণ পূর্ব পাকিস্তানের প্রায় বড় বড় সব নেতার সাথে আমার ভালো সম্পর্ক ছিলো। ফলে বারবার আমাকে মিডিয়ার সামনে দাঁড়াতে হয়েছে। সবুজ মাটি লাল করার ঘোষণা আমার নয়।

প্রকৃত ঘটনা হলো, ঢাকাতে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির মিটিং ছিলো আনুমানিক নির্বাচনের এক বছর পূর্বে। এটা ভাসানীর দল। বাংলাদেশে দু'জন তোয়াহা ছিলো। একজন ইসলামিক এবং অন্যজন সেক্যুলার (নোয়াখালীর)। সেক্যুলার তোয়াহা সেই মিটিং-এ বলেছিলো, "আমি পূর্ব পাকিস্তানের সবুজ মাটি রক্তে লাল করে দেব।" আমাকে কোর হেড কোয়ার্টার থেকে জেনারেল ইয়াকুব তা জানালো। আমি এই কথাটি স্মরণ রাখার জন্য ডাইরীতে লিখে রাখি এবং তোয়াহা-কে খবর দেই। তাদের সাথে আমার এতটুকু বন্ধুত্ব ছিলো যে, আমি যখন বলেছি তোমাকে গ্রেফতার করা হবে না, তখন সে বিশ্বাস করেছে তাই হবে। সে আসে। জিজ্ঞেস করলাম, তুমি এসব কি বলেছো? সে বললো এটা আমার নয়। কাজী জাফরের বক্তব্য। আমি বললাম, এর অর্থ কি? সে বললো, এর অর্থ এদেশে কম্যুনিস্ট মতবাদ প্রতিষ্ঠিত করা, লাল হচ্ছে কম্যুউনিস্টের প্রতীক। সে চলে গেলো। আমার ডাইরীতে কথাগুলো রয়ে গেলো। গুরুত্ব দেইনি। আমাকে গ্রেফতার করার পর তারা আমার ডাইরী নিয়ে গেলো। প্রচার করলো,

জেনারেল ফরমান গোটা বাংলার মানুষকে হত্যা করার প্লান করেছিলো। এ কথা শেখ মুজিবও ভুট্টোকে বলেছিলো। তার দাবী ছিলো, সবাইকে ছেড়ে দিলেও ফরমান আলীকে ছাড়া যাবে না। আন্তর্জাতিক রেডক্রস সোসাইটি আমার কাছে এসেছিলো। আমি বিস্তারিত তাদেরকে বললাম। এরপর তা নিয়ে তদন্ত হয়েছে। এমনকি হামিদুর রহমান কমিশনও আমাকে জিজ্ঞাসা করেছে। আমি বললাম, দেখুন এটা আমার হাতের লেখা সত্য, কিন্তু কথা আমার নয়। একথা ১৯৬৯ ইংরেজীর ১৬ই জুন কাজী জাফর পল্টন ময়দানে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির মিটিং-এ বলেছিলেন। এরপর আমাকে ছেড়ে দেওয়া হয়। আজো আমি বলছি, ওকথা আমার নয়। কাজী জাফরের কথা।

ঃ আপনারা আমাদের বুদ্ধিজীবিদেরকে হত্যা করালেন কেন?

রাও আলী ঃ ১৬ই ডিসেম্বর আমাদের আত্মসমর্পণের পর বুদ্ধিজীবিদের হত্যা করা হয়েছে। তখন ভারতীয় সৈন্যদের নিয়ন্ত্রণে ঢাকাসহ গোটা পূর্ব পাকিস্তান ছিলো। আমার প্রশ্ন হলো, তাদের নিয়ন্ত্রিত এলাকায় বুদ্ধিজীবিদের হত্যা করলো কে? আমি মনে করি, এ জন্য যদি কাউকে দায়ী করতে হয়, তবে অবশ্যই ভারতকে।

ঃ নিয়াজী সত্যিই কি বলেছিলো, 'ভূমি চাই মানুষ নয়'?

রাও আলী ঃ শুনেছি সে বলেছিলো। সে অন্য প্রকৃতির মানুষ ছিলো।

ঃ নিয়াজী আত্মসমর্পণের চার ঘন্টা পূর্বেও না-কি হুংকার দিতো "যুদ্ধ করবো মরতে দম তক তবু আত্মসমর্পণ করবো না।"

রাও আলী ঃ চার ঘন্টা নয় চারদিন পূর্বে আমি তাকে বলেছিলাম, জনাব শুধু যদি ভারতের সৈন্য হতো, তবে কথা ছিলো। এই দেশের সাধারণ মানুষ যেখানে অস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছে, সেখানে যুদ্ধ করে লাভ নেই।

তখন সে এই উত্তর দিয়েছিলো।

ঃ নিয়াজীর চরিত্র না-কি খুব খারাপ ছিলো?

রাও আলী ঃ শুনেছি, মদ আর নারীর প্রতি তার দুর্বলতা ছিলো। নিয়াজীকে যখন দায়িত্ব দেওয়া হয় পূর্ব পাকিস্তানের, তখন আমি প্রেসিডেন্টকে বিষয়টা বিবেচনার জন্য বলেছিলাম। ইয়াহিয়া ও ভুট্টো জানতো, তারা যা চায় তা নিয়াজী ছাড়া কাউকে দিয়ে করানো অসম্ভব। সে একটা লম্পট ছিলো। প্রায়ই না-কি হুংকার দিতো "নসল (রক্তধারা) পাল্টিয়ে দাও।" আমি এসব তোমাকে বললাম শুধু তার চরিত্রটা বোঝাতে। তবে তুমি তা লিখতে যেও না।

ঃ আচ্ছা বুদ্ধিজীবী হত্যার সাথে রাজাকার বাহিনী কি জড়িত ছিলো?

রাও আলী ঃ আমি কি বলবো? তবে আমার ধারণা ওরা ছিলো না। কারণ আমাদের আত্মসমর্পণের দু'দিন পূর্বেই ওরা পালাতে শুরু করে। ১৬ই ডিসেম্বরের পর ওদের অস্তিত্বই খুঁজে পাওয়া যায়নি। আমরা ফিরে এসেছি পাকিস্তানে। রাজাকারদের অবস্থা

না ঘর কা না ঘাট কা। তাদের পক্ষে এত বড় কাজ করার সুযোগই ছিলো না। তাই আমার মনে হয় রাজাকাররা বুদ্ধিজীবিদেরকে হত্যা করেনি।

ঃ তাহলে আপনি বলতে চাচ্ছেন ভারত করেছে। কিন্তু প্রশ্ন হলো তারা করবে কেন?

রাও আলী ঃ হ্যাঁ, ভারত করতে পারে। আমাদেরকে বা রাজাকারদেরকে যে কারণে সন্দেহ করা হচ্ছে, একই কারণে ভারতও করতে পারে।

ঃ আমি একটা উর্দু ম্যাগাজিনে পড়েছি, জেনারেল ইয়াহিয়ার না-কি শুরা আর সাকী অর্থাৎ মদ আর নারীর নেশা ছিলো প্রচণ্ড এবং যখন পাক সৈন্যরা আত্মসমর্পণ করে, তখন জনৈক অফিসার তাকে জানিয়েছিল, "স্যার কায়েদে আজম কা পাকিস্তান টুট গিয়া।" প্রতি উত্তরে সে বলেছিলো – "টুটনে দে, পহলে নুরজাহান কা গানা শোননে দে।" ঐ ম্যাগাজিনে নুর জাহানের সাথে ইয়াহিয়ার ড্যান্স অবস্থার ছবিও প্রকাশ করা হয়েছিলো। আপনি এ সম্পর্কে কিছু জানেন কি?

রাও আলী ঃ আমার মদ্যপানের অভ্যাস নেই বলে তাকে নেশাগ্রস্ত দেখিনি। তবে সে মদ্যপায়ী ছিলো। শুনেছি খুব পান করতো। অনেক খেয়েও নেশাগ্রস্ত হতো না। আমার সাথে তার দেখা হয়েছে অফিস টাইমে। নারীদের সাথে বিশেষ করে নুরজাহানের সাথে সম্পর্কের কথা খুব প্রসিদ্ধ ছিলো। তবে এ সব কখনো আমার চোখে পড়েনি। ১৪ই ডিসেম্বর আমরা আত্মসমর্পণের নির্দেশ পাই। এই নির্দেশ সত্যই জেনারেল ইয়াহিয়ার কিনা তা জানতে ফোন করেও তাকে পাইনি। তিনি তখন নেশাগ্রস্ত। বাকী কিছু আমার জানা নেই।

ঃ সে যে নেশাগ্রস্ত তা বুঝলেন কিভাবে?

রাও আলী ঃ তার উল্টা-পাল্টা কথা থেকে।

ঃ আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে বাদী পক্ষকে কিছু বলতে চান কি, অর্থাৎ বাংলাদেশের মানুষের প্রতি আপনার কোন বক্তব্য আছে কি?

রাও আলী ঃ কথা তো একটাই যে, একাত্তরে আমি নিজের জানা মতে বাংগালীর কোন ক্ষতি করিনি। পাক সেনারাও বলতে পারবে না, রাও ফরমান আলী তাদেরকে ক্ষতিকর কোন নির্দেশ বা প্লান দিয়েছে। পাক সৈন্যদের অভিযোগ, আমি বাংগালীদের দালাল ছিলাম। আমি অনেক বাংগালীকে পিঞ্জিরা থেকে মুক্ত করেছি। আমি চাইতাম ক্ষমতা বাংগালীদের হাতে দেয়া হোক।

ঃ একাত্তরের ঘটনার জন্য ক্ষমা চাইবেন না?

রাও আলী ঃ বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য ভয়েরই ক্ষমা চাওয়া প্রয়োজন। অন্যায় দু' পক্ষ থেকেই করা হয়েছে। এখন নিজেদের স্বার্থে আত্মসমালোচনা প্রয়োজন। বাস্তবে পাকিস্তান কোন দেশের নাম নয়। এটা ছিলো হিন্দুস্তানের মুসলমানদের হিন্দুদের নির্যাতন থেকে বাঁচার একটি দর্শন। আর এই স্বার্থেই একে-অন্যের সাহায্য প্রয়োজন।

ঃ বিদায় বেলা বলছি অন্যায় আপনারাই করেছেন। ক্ষমা প্রথমে আপনারাই প্রার্থনা করবেন। ধন্যবাদ সময় দেওয়ার জন্য।

রাও আলী ঃ তোমাকেও ধন্যবাদ।

২৩শে মার্চ ঐতিহাসিক পাকিস্তান দিবস

ভারতবর্ষে ইংরেজ সাম্রাজ্য এত দ্রুত প্রতিষ্ঠিত এবং এত দীর্ঘায়ু হতো না, যদি হিন্দু সম্প্রদায়ের বড় একটি অংশের সহযোগিতা না পেত। অনেক বিখ্যাত হিন্দু বুদ্ধিজীবী মহোদয়গণ বৃটিশ শাসিত ভারতকে রামরাজ্য বলতেও লজ্জাবোধ করেনি। তাই বৃটিশ ক্যাপ্টেন টি মাকান ১৮১৩ সালে সিলেক্ট কমিটির কাছে বলেছিলেন, মুসলমানদের অপেক্ষা হিন্দুগণ বৃটিশ শাসনের প্রতি অধিকতর বিশ্বস্ত।

(আর, ওম – মিলিটারী ট্রানজেক অব দ্যা বৃটিশ ন্যাশন ইন বেঙ্গল – পৃঃ ৫৩)

এভাবে আরো অনেক ঐতিহাসিক তথ্য আছে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের প্রতি হিন্দুদের আনুগত্যের ব্যাপারে। মুসলমানদের বৃটিশ বিরোধী আন্দোলন যখন মোটামুটি দৃঢ়রূপ নিতে যাচ্ছে, তখনই (১৮৮৫ ইং) বৃটিশ আমলা এলান অক্টোভিয়ান হিউম কর্তৃক বৃটিশ সরকার ও হিন্দুদের মধ্যে লিয়াজোঁ বজায় রাখতে গঠিত হয় ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস। দীর্ঘদিন এই বৃটিশ আমলা কংগ্রেসের সভাপতির দায়িত্বেও ছিলেন। ১৮৯০-এর দিকে কংগ্রেসের ভেতর এমন কিছু হিন্দু তরুণের প্রবেশ ঘটে, যারা মুসলমানদের সাথে বৈরী মনোভাবাপন্ন হলেও বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদবিরোধী এবং তাদের প্রচেষ্টায় শেষ পর্যন্ত কংগ্রেস ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের স্বপক্ষের শক্তি হয়ে দাঁড়ায়। আফ্রিকা থেকে গান্ধীজী এসে এই গ্রুপের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন এবং মুসলমানদের সাথে আন্দোলনের লিয়াজোঁ স্থাপন করেন। কংগ্রেসে কিছু উদারপন্থী লোক থাকলেও কিন্তু সর্দার প্যাটেলের মতো মুসলিম বিদ্বেষী অসংখ্য নেতা ছিলেন। আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় এক সময় মুসলমানদের বুঝতে কষ্ট হলো না, কংগ্রেসের মুসলিমবিরোধী অপকৌশলসমূহ। এখান থেকেই শুরু হলো মুসলমানদের স্বতন্ত্র চিন্তা। যার ফলস্বরূপ ১৯০৬ সালে ঢাকার নবাব সলিমুল্লাহ খান বাহাদুরের বাড়ীতে নিখিল ভারত মুসলিম লীগের জন্ম।

এর পর শুরু হয় পৃথক মুসলিম রাষ্ট্রের চিন্তা-ভাবনা। আল্লামা ইকবাল এই ভাবনার জনক এবং চৌধুরী রহমত আলী এর আনুমানিক নক্সা তৈরী করলেও সেই রাষ্ট্রের রূপরেখা, প্রয়োজনীয়তা, সীমা ইত্যাদি কাগজে-কলমে প্রস্তাব আকারে উপস্থাপন করেন ১৯৪০ সালের ২৩শে মার্চ শের-এ-বাংলা এ কে এম ফজলুল হক মুসলিম লীগের লাহোর অধিবেশনে। যা এই দিনই সর্বসম্মতিক্রমে লীগের বৈঠকে গৃহীত হয়। এর পর শুরু হয় পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আন্দোলন। এই আন্দোলনের ভিত্তিতে ১৯৪৭ ইংরেজীর ১৪ই আগস্ট পাকিস্তানের জন্ম। এরপর থেকে প্রতি বছর ২৩শে মার্চ 'ইয়াওমে পাকিস্তান' অর্থাৎ পাকিস্তান দিবস হিসাবে পালন করা হয়। উনবিংশ শতকের শেষ

২৩শে মার্চ উদ্‌যাপন উপলক্ষে পাকিস্তানে প্রচুর সাজসজ্জা করা হয়। বিশেষ করে লাহোর আর ইসলামাবাদ ছিলো এই দিন অনুষ্ঠানমুখর। ইসলামাবাদের প্রধান সড়ক শের-এ-বাংলা ফজলুল হক রোড লাল, নীল-বাতি আর পতাকা দিয়ে সাজানো হয়। এক সপ্তাহ পূর্ব থেকে সড়কের আশপাশে সেনাবাহিনীর সদস্যরা ২৩শে মার্চে নির্দিষ্ট অনুষ্ঠানাদির জন্য প্রস্তুত হতে থাকে। শের-এ-বাংলা রোডে মূল অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফসহ বিভিন্ন মন্ত্রী, আমলা, রাজনীতিক নেতৃবৃন্দ, ব্যবসায়ী, বিদেশী রাষ্ট্রদূতসহ হাজার হাজার মানুষ রাস্তার দু'পাশে দাঁড়িয়ে বিভিন্ন গ্রুপের কুচ্‌কাওয়াজ দেখেন। এবারের প্রধান আকর্ষণ ছিলো দূরপাল্লার পারমাণবিক ক্ষেপণাস্ত্র ঘোরী। ইয়াওমে পাকিস্তান উপলক্ষে সারাদিন টেলিভিশনে বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্রচার করা হয়।

২৩শে মার্চ দুপুরের দিকে রাওয়ালপিন্ডি থেকে লাহোরের পথে যাত্রা শুরু করি। ইসলামাবাদ থেকে লাহোর পর্যন্ত যে মটরওয়ে করা হয়েছে, তা প্রায় ইংল্যান্ডের মটরওয়ের মতোই উন্নত। তবে অস্বীকার করা যাবে না DAEWOO EXPRESS BUS SERVICE-এর মান ইংল্যান্ডের থেকেও উন্নত। মরটরওয়ের বাসের সার্ভিসগুলো অত্যন্ত আকর্ষণীয়। ISLLAR KAHAR MSA নামী এক সার্ভিসে পনের মিনিটের যাত্রাবিরতি ছিলো খুবই আনন্দদায়ক। দুই ঘণ্টার মধ্যে আড়াইশ' মাইল অতিক্রম করে আমরা লাহোর এসে পৌঁছি।

ঐতিহাসিক লাহোর

ভারতবর্ষের ইতিহাসে লাহোর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি অধ্যায়। লাহোরকে 'লাহোর' কেন বলা হয় তা স্পষ্ট নয়। অনেকে বলেন রামার ছেলে লুহ-এর নামে এই নামকরণ। লাহোর দুর্গে আজো লুহের টেম্পল পাওয়া যায়। লাহোরের রাজনৈতিক গুরুত্ব কবে থেকে শুরু তা আজো নির্দিষ্ট করে বলা যাচ্ছে না। তবে ১৯৫৯ ইংরেজীতে মাটি খননের সময় প্রাচীন যে দুর্গটি আবিষ্কার হয়, গবেষকদের মতে সেটি শায়েখ আয়াজ কর্তৃক নির্মিত। শায়েখ আয়াজ ছিলেন সুলতান মাহমুদ গজনবীর খাদেম ও মন্ত্রী। সুলতান মাহমুদ গজনবীর শাসনকাল ছিলো ৯৯৭ খৃষ্টাব্দের দিকে। লাহোর দীর্ঘদিন ভারতবর্ষের মুসলিম শাসকদের রাজধানী ছিলো। মোঘলদের হাত থেকে তা শিখদের অধীনে চলে যায়।

লাহোরে চল্লিশ বছর শিখ রাজা রণজিত সিং-এর শাসন চলে। আফগানিস্তানে আহমদ শাহ আবদালীর শাসনামলে রণজিত সিং মুসলমানদের সাথে এক যুদ্ধে পরাজিত হয়ে ট্যাক্স দানের চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। আহমদ শাহ আবদালীর মৃত্যুর পর আফগানিস্তানে অন্তর্দ্বন্দ্ব শুরু হয়ে গেলে রণজিত সিং মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে শুরু করে।

এদিকে গোটা ভারতবর্ষে ইংরেজদের ষড়যন্ত্রে এবং হিন্দু ও শিখদের সহযোগিতায় মুসলমানরা ক্ষমতা হারাতে থাকে। রণজিত সিং-এর সাথে ইংরেজদের ছিলো চুক্তিভিত্তিক সম্পর্ক। ১৮৩৯ ইংরেজীতে রাজা রণজিত সিং-এর মৃত্যুর পর ইংরেজরা লাহোরের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করে। পাকিস্তান হওয়া পর্যন্ত তা ইংরেজদেরই দখলে থাকে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে কেন্দ্র করে বৃটিশ শাসনের শেষ পর্যায়ে লাহোর আবার রাজনৈতিক ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠে। ১৯৪০ সালের ২৩শে মার্চ মুসলিম লীগের লাহোর অধিবেশনে শের-এ-বাংলা এ কে এম ফজলুল হক পাকিস্তানের যে রূপরেখা প্রস্তাব করেন, তা ভারতবর্ষের রাজনীতিতে ঝড় সৃষ্টি করে। এর ভিত্তিতে শেষ পর্যন্ত ১৯৪৭ সালে পাকিস্তানের জন্ম হয়। আজো পাকিস্তানে জাতীয়ভাবে ২৩শে মার্চ পাকিস্তান দিবস (ইয়াওমে পাকিস্তান) হিসাবে উদ্‌যাপন করা হয়।

ঊনবিংশ শতকের শেষ ২৩শে মার্চ বিকাল তিনটায় লাহোর এসে পৌঁছলাম। ঢাকা ও করাচীর মতোই প্রায় ঘনবসতি ও বাণিজ্যিক শহর লাহোর। বাংলাদেশের মতোই লাহোরের আবহাওয়া ফসল উৎপাদন উপযোগী। পুরাতন ডিজাইনের দালান ও বাড়ী। লাহোর আমায় ডেকেছে তিনটি কারণে। প্রথমতঃ ডা. ইসরার আহমদের সাথে সাক্ষাৎ দ্বিতীয়তঃ আল্লামা ইকবালের স্মৃতিদর্শন এবং তৃতীয়তঃ লাহোর দুর্গ পরিদর্শন করে ভারতবর্ষের মুসলিম শাসকদের অধঃপতনের কারণ পর্যবেক্ষণ।

প্রিয় পাঠক, আমি যা দেখেছি, যা বুঝেছি, তাই উপস্থাপনের চেষ্টা করছি।

ডা. ইসরার আহ্‌মদের সাথে সাক্ষাৎ

ডা. ইসরার আহ্‌মদ পাকিস্তানের বিশিষ্ট বাগ্মী, বুদ্ধিজীবী, লেখক এবং রাজনীতিক ব্যক্তিত্ব। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে প্রথম সারির ছাত্রনেতা হিসাবে তাঁর ভূমিকা অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলো। স্বয়ং জামাতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা মওদুদী তাঁকে দাওয়াত করে তাঁদের ছাত্র সংগঠন জমিয়তে তালাবা-এ-ইসলামীতে নিয়ে আসেন। ডা. ইসরার আহ্‌মদ মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র অবস্থায় জমিয়তে তালাবার কেন্দ্রীয় সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। ছাত্র জীবন শেষে তিনি জামাতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার সদস্য হিসাবে জাতীয় রাজনীতিতে যোগ দেন। জামাতে ইসলামীর নির্বাচনে যাওয়া না যাওয়া নিয়ে এক পর্যায়ে মাওলানা মওদুদীর সাথে তাঁর মতানৈক্য হয়। শূরার বৈঠকে তাঁকে মত প্রকাশের সুযোগ না দিলে তিনি লিখিতভাবে জানিয়ে দেন, জামাতে ইসলামী যে গণতন্ত্রের পথ গ্রহণ করছে, তা দিয়ে প্রকৃত ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব নয়। এ পথ সুন্নতে রাসূল (সাঃ)-এর পরিপন্থী।

মাওলানা মওদুদী এতে ভীষণ ক্ষুব্ধ হন। এক পর্যায়ে ডা. ইসরার আহ্‌মদ জামাতে ইসলামী থেকে পদত্যাগ করেন। বর্তমানে 'তাহ্‌রীকে খিলাফত' নামে তাঁর একটি সংগঠন রয়েছে। যার উদ্দেশ্য 'খেলাফত আলা মিনহাজিন নুবুওয়াহ' প্রতিষ্ঠা। 'নেদা-এ-খিলাফত' নামে এই সংগঠনের একটি সাপ্তাহিক ম্যাগাজিনও রয়েছে। ইতোমধ্যে তাঁর বেশ কিছু বইও প্রকাশিত হয়েছে। পাঠক হিসাবেই তাঁর সাথে আমার মূল সম্পর্ক। ১৯৯৭ ইংরেজীতে তিনি লন্ডন সফরে আসলে টেলিফোনে দীর্ঘ আলাপ হয়। এই সূত্রে ২৩শে মার্চ রাত আটটায় তাঁর অফিসে উপস্থিত হই। প্রাথমিক আলোচনার পর মূল সাক্ষাৎকারে চলে আসি। জানতে চাই, আজকের বিশ্বে মুসলমানরা মজলুমের পর্যায়ে উপনীত হওয়ার কারণ কি?

উত্তরে তিনি বলেন, আমার মতে উম্মতে মুসলিমা বর্তমানে আল্লাহ্‌র গজবে নিপতিত। আমি একথা বলছি পবিত্র কোরআনের এই বিধানের ভিত্তিতে, যেখানে বলা হয়েছে, আল্লাহ্ পাক যে উম্মতকে তাঁর কিতাব ও হেদায়ত দান করেন, তারা যদি এর আমানত রক্ষা করে, হক আদায় করে অর্থাৎ আল্লাহ্‌র বিধান মতো আমল করে এবং বিশ্ববাসীকে এদিকে আহ্বান করে, তবে তাদের উপর আল্লাহ্‌র রহমত বর্ষিত হয় আর সাহায্য আসতে থাকে। কিন্তু যদি তারা তা না করে, উল্টো আল্লাহ্‌র বিধানের বিরোধিতা করতে থাকে, তবে সেই উম্মতের উপর আল্লাহ্‌র গজব অবতীর্ণ হয়। পবিত্র কোরআনে এর প্রমাণ হিসাবে ইহুদীদের কথা বলা হয়েছে। যেমন– সূরা বাকারাতেই এ সম্পর্কিত দু'টি আয়াত রয়েছে।

এক, 'হে বনী ইসরাঈল! আমার অনুগ্রহের কথা স্মরণ কর, যা আমি তোমাদেরকে দিয়েছি। আমি তোমাদেরকে বিশ্ববাসীর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি।' (আয়াত-১২২)

এই উম্মত সম্পর্কে আবার অন্য আয়াতে বলা হয়েছে– 'আর তাদের উপর আরোপ করা হলো লাঞ্ছনা ও পরমুখাপেক্ষিতা। তারা আল্লাহ্‌র রোষানলে পতিত হয়ে ঘুরতে থাকলো। এমন হলো এ জন্য যে, তারা আল্লাহ্‌র বিধি-বিধান মানতো না।' (আয়াত ঃ ৬১)

এই সব উম্মতকে লাঞ্ছিত ও পরমুখাপেক্ষী করে তাদের স্থানে মর্যাদাসম্পন্ন করে দেওয়া হলো উম্মতে মোহাম্মদী (সাঃ)-কে। এই উম্মতকে আল্লাহ্ পাক কিতাব দেন, দ্বীন দেন এবং দ্বীনকে পরিপূর্ণ করেছেন।

সাথে সাথে বলেছেন– 'এমনিভাবে আমি তোমাদেরকে মধ্যপন্থী সম্প্রদায় করেছি, যাতে করে তোমরা সাক্ষ্যদাতা হও মানবমন্ডলীর জন্য এবং যাতে রাসূল সাক্ষ্যদাতা হোন তোমাদের জন্য।' (বাকারা ঃ ১৪৩)

আমরা আজ এই কাজ করছি না বলে আজাবের মধ্যে বন্দী। বিশেষ করে যারা উম্মতে মুসলিমার নিউক্লিয়ার তাদের শ্রেষ্ঠ অংশ হলো আরব। আরবদের ফজিলতের বুনিয়াদ হচ্ছে তাদের ভাষায় হেদায়তের জন্য তাদেরকে আল্লাহ্ পাক মাধ্যম হিসাবে প্রথমে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু আজ তারা বিশেষ করে কলোনিয়াল রোল থেকে যারা আজাদ হয়েছে, তাদের কেউ ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেনি; বরং সরকারসমূহ উল্টো চলতে লাগলো। তাই বলছিলাম, এই সময় জঘন্য আজাব আরবদের উপর এসেছে। আজ তাদের বুকের উপর আল্লাহ্ কর্তৃক অভিশপ্ত এক জাতি বসে আছে। ঐ জাতির সামনে আরব মুসলমানদের আজ কিছু করার সাহস বা শক্তি নেই। কর্মক্ষমতাহীন বেইজ্জতী আর কাকে বলে? প্রথম দিকে ইসরাঈলী প্রতিনিধির সাথে এক রুমে কিংবা এক টেবিলে বসাকেও সহ্য করা হতো না। কিন্তু আজ এক এক করে চুক্তি হচ্ছে, স্বীকৃতি দেওয়া হচ্ছে, বন্ধুত্ব করা হচ্ছে। এমনকি উপসাগরীয় যুদ্ধের পর ইহুদীদেরকে নিয়ে মাদ্রিদে আরব শান্তি বৈঠক করা হয়েছে। জাতিসংঘের ইতিহাসে কোন দিন বৈঠক মাদ্রিদে হয়নি। কিন্তু গালফ যুদ্ধের পর হয়েছে এবং তা এ জন্য করা হয়েছে যে, মুসলমানদেরকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া যে, ১৪৯২ সালে স্পেন থেকে তোমাদেরকে উচ্ছেদ করা হয়েছিলো। ভুলে যেওনা, এটা তোমাদের পুরাতন কবরস্তান। এসো, এখানে বসে ইসরাঈলের সাথে চুক্তি করে নতুন কবর তৈরী কর।

আমার মতে, এর পর দ্বিতীয় আজাব আসে পাকিস্তানের উপর। এই দেশ তৈরী করা হয়েছিলো ইসলামের নামে। কলোনিয়াল রোল থেকে গোটা বিশ্বে আর কোন দেশ ইসলামের নামে সৃষ্টি হয়নি। তোমরা একে কোরবানী বলো আর যা-ই বলো তবু সত্য হলো, এই দেশের জন্য লাখো মুসলমানের প্রাণ দিতে হয়েছে। প্রচুর সম্পদ লুণ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু আমরা যে ওয়াদা আল্লাহ্‌র সাথে করেছিলাম, তা পূর্ণ করিনি। আমার

মতে আল্লাহ্‌র আজাবের মধ্যে এটিও একটি যে, পাকিস্তান দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে গেছে। একাত্তরে নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ, রক্তপাত হলো। ভাইয়ে ভাইয়ে শত্রুতা সৃষ্টি হলো। এমন কি একাত্তরের পর ড. কামাল হোসেন বললো—"যদিও এ দেশে মুসলমানরা শক্তিশালী, তবু আমরা পছন্দ করি না বাংলাদেশকে মুসলিম দেশ বলা হোক।"

আমি তাও তোমাকে বলে রাখি, আজো যে দুর্বল পাকিস্তান আছে, যদি এখানে ইসলাম প্রতিষ্ঠা না করা হয়, তবে আরেকটি আজাব অতি নিকটবর্তী।

ঃ অনেকে বলে, একবিংশ শতাব্দীতে ইসলাম ও মুসলমানরা বিশ্বকে নেতৃত্ব দেবে। এ প্রসংগে আপনি কি মনে করেন?

ডা. আহমদ ঃ কারা বলে তা আমি জানি না। তবে আমি মহানবী (সঃ)-এর হাদীসের মর্মার্থে আশাবাদী। বাস্তবে কিন্তু অবস্থা দেখে আশাবাদী হওয়া যায় না। তবু যেহেতু মহানবী (সঃ)-এর বাণী রয়েছে তাই বিশ্বাস করি। হযরত নোমান ইবনে বশির থেকে বর্ণিত এক হাদিস আহমদ ইবনে হাম্বল তাঁর মুসনাদে সংকলন করেছেন, সেই হাদীসের ভাষ্য অনুযায়ী বোঝা যায়, হযরত নবী করিম (সঃ) তাঁর সময় থেকে কিয়ামত পর্যন্ত পাঁচ সময়ের কথা বলেছেন। এক, নবুওয়াতের সময়। দুই, খিলাফত আলা মিনহাজি নুবুওয়াহ্-এর সময়। তিন, জালেম বাদশাদের সময়। চার, গোলামীর শৃঙ্খলে বন্দী শাসকদের সময়। পাঁচ, আবার খিলাফত আলা মিনহাজিন নুবুওয়াহ-এর সময়। যেহেতু একথাগুলো হাদিসের তাই এর উপর দৃঢ় বিশ্বাস রাখি। তা ছাড়া মুসলিম শরীফে মহানবী (সঃ)-এর আরেকটি হাদিস তুলে ধরা হয়েছে, মহানবী (সঃ) বলেছেন, "আল্লাহ্ পাক আমাকে পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত গোটা বিশ্বের জমিন দেখিয়েছেন। স্মরণ রেখ এই সকল এলাকায় আমার উম্মতের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাওয়ার পরই দুনিয়াকে ধ্বংস করা হবে।"

এ রকম আরো হাদীস আছে। মোট কথা, এমন হওয়ার উপর বিশ্বাস রাখা আমাদের ঈমানেরই একটি অংশ। বুনিয়াদীভাবে ঈমান তো গায়েবের বিশ্বাসকেই বলে। সূরা বাকারার প্রথমে মুত্তাকীদের পরিচিতিতে গায়েবের বিশ্বাসের কথা বলা হয়েছে। দুনিয়াতে আবার মুসলমানদের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার বিশ্বাস গায়েবের বিশ্বাসের মতোই। কারণ হাদিস সহীহ, সনদ শুদ্ধ; তাই একথার উপর অনড় বিশ্বাস রাখতেই হবে।

ঃ খেলাফত আবার ফিরিয়ে আনতে মুসলমানদের কি করতে হবে?

ডা. আহমদ ঃ এর উত্তরে আমি হযরত আবু বকর (রাঃ) ও ইমাম মালিক (রঃ)-এর বর্ণনাকে উল্লেখ করবো। হযরত আবু বকর (রাঃ) খলীফা নির্বাচিত হওয়ার পর এক ভাষণে বলেছিলেন–"এই যে আমাদের খেলাফত, তার প্রথম অংশের মতো শেষ অংশ হবে না।" হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর এই বক্তব্যকে সামনে রেখেই বলতে চাই, তবুও আমাদেরকে মহানবী (সঃ) ও সাহাবায়ে কেরাম যেভাবে খেলাফত প্রতিষ্ঠিত

করেছিলেন, সেভাবেই চেষ্টা করতে হবে। ইমাম মালিক (রঃ) বলেন, মিনহাজে মোহাম্মদ (সঃ)-এর উপর সূরা মায়েদায় যে রকম বলা হয়েছে, তেমনি তাওরাতে হযরত মূসা (আঃ) ও ইঞ্জিলে হযরত ঈসা (আঃ)-কেও বলা হয়েছে। মহানবী হযরত মোহাম্মদ (সঃ)-কে উদ্দেশ করে পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে ঃ

"আমি তোমাদের প্রত্যেককে একটি আইন ও পথ দিয়েছি।" (মায়েদা ঃ ৪৮)

আমাদের কাছে একথা স্পষ্ট যে, সকল নবী ও রাসূলের দ্বীন একই ছিলো, কিন্তু তাদের শরিয়ত এবং মিনহাজ ভিন্ন ছিলো। হযরত মূসা (আঃ)-এর সময়ে যখন তাঁর গোত্র গোলামীতে বন্দী ছিলো, তখন তাঁর শরিয়তে তাদেরকে মুক্ত করা ফরজ করা হয়েছিলো। অন্যদিকে হযরত ঈসা (আঃ)-এর সময় ফিলিস্তিন রোমানদের দখলে ছিলো। কিন্তু ঈসা (আঃ) তাদেরকে মুক্ত করার পরিবর্তে তাদের মধ্যে ঈমানের আলো জ্বালাতে চেষ্টা করেছেন। এভাবে একেক রাসূলের একেক মিনহাজ ছিলো। বর্তমানে আমাদের লোকেরা বিভিন্ন মিনহাজে কাজ করে যাচ্ছেন। যারা স্বাধীনতার জন্য ময়দানে যুদ্ধ করে যাচ্ছেন, তারা হযরত মূসা (আঃ)-এর মিনহাজে কাজ করে যাচ্ছেন। আর যারা শুধু দাওয়াতের কাজ করছেন তারা হযরত ঈসা (আঃ)-এর মিনহাজে আছেন। কিন্তু মিনহাজে মোহাম্মদী হলো এক ইনকিলাবী মিনহাজ। প্রথমে দাওয়াতের মাধ্যমে মনে ঈমানী শক্তি সৃষ্টি করা আজো প্রয়োজন আছে। যদিও আমরা মনে করি, আমাদের ঈমান আছে। কিন্তু বাস্তবে যে রকম হওয়া উচিৎ সে রকম নেই। যা আছে তা হলো উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত এক আকিদা মাত্র।

ঈমান সৃষ্টি হয়ে গেলেও শক্তি সঞ্চিত না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। লোকে তোমার উপর অত্যাচার করলেও তার প্রতিশোধ নেবে না। যখন শক্তি সঞ্চিত হয়ে যাবে, তখন মদীনার মতো একটি কেন্দ্র স্থাপন করে স্বশস্ত্র যুদ্ধ করতে হবে। এরপর আল্লাহ্‌র সাহায্য আসবে। এই মিনহাজ অনুসরণ ছাড়া খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে না। মোটকথা, খেলাফত প্রতিষ্ঠার জন্য তিনটি পর্যায় রয়েছে।

এক. দাওয়াতে দ্বীন।

দুই. শক্তি সঞ্চয় না হওয়া পর্যন্ত হযরত বেলাল ও হযরত খাব্বার (রাঃ)-দের মতো ধৈর্যের সাথে কাজ করে যাওয়া।

তিন. শক্তি ও কেন্দ্র হওয়ার পর লড়াই করা।

এই দু'টির মধ্যে যদি একটি হয়ে যায়, তবে অপরটি অর্জনের জন্য সর্বশক্তি প্রয়োগ করা। সুন্নতে রাসূল (সঃ)-এর মিনহাজ মতো লড়াইয়ের দুই অবস্থা।

এক. কতল করা। যেমন বদরের যুদ্ধে সত্তরজন কাফেরকে কতল করা হয়।

দুই. কতল হওয়া। যেমন ওহুদের যুদ্ধে সত্তরজন সাহাবী শহীদ হয়েছিলেন।

তবে স্মরণ রাখতে হবে, সে সময় আরবে কোন কেন্দ্রীয় সরকার ছিলো না। আজ

সরকার, পুলিশ, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সংগঠিত সৈন্য এবং এয়ারফোর্স সবই রয়েছে। তাই ইজতিহাদ করতে হবে। আমার মতে, বর্তমানের পরিস্থিতিতে ইজতিহাদ দুই প্রকার হতে পারে।

এক. গান্ধী যেমন বৃটিশবিরোধী আন্দোলনে নন ভায়লেন্স নীতি গ্রহণ করেছিলেন।

দুই. ইমাম খোমেনীর বাহিনী যেমন শাহের বিরুদ্ধে অস্ত্রের সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন।

এই দুই প্রকারের জন্য প্রয়োজন রয়েছে দৃঢ় ঈমান, শক্তিশালী সংগঠন, তরবিয়াত ও তাজকিয়াহ। এসব অর্জিত হওয়ার পর প্রচলিত স্রোতের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে। প্রচলিত তাগুতী সমাজ যখন ভাংগা সম্ভব হবে, তখনই খেলাফত আসবে।

ঃ এসব ঝামেলায় না গিয়ে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচনের মাধ্যমে কি ইসলাম বা খেলাফত প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়?

ডা. আহমদ ঃ অনেকে ভাবেন নির্বাচনের মাধ্যমে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করা যাবে; এভাবে একদিন কেল্লা ফতে হয়ে যাবে। গত পঞ্চাশ বছর থেকে বলে আসছি গণতন্ত্র বা নির্বাচনের মাধ্যমে কাজ হবে না। অতি নিকটের ঘটনা, আলজেরিয়ায় নির্বাচনে জয়ী হয়েও কাজ হয়নি। তুরস্কেও একই ঘটনা। তবে গেরিলা যুদ্ধের মাধ্যমেও কাজ হবে না। বর্তমান মিসর ও আলজেরিয়া থেকে আমাদের শিক্ষা গ্রহণ করা প্রয়োজন। কাজ হবে কেবলমাত্র সেই পদ্ধতিতে। যা সুন্নতে রাসূল (সঃ)-এর ভিত্তিতে আমি ইতোপূর্বে বর্ণনা করেছি।

ঃ আপনি যা বলছেন, এর সাথে ছয় উসূলের ভিত্তিতে পরিচালিত তাবলীগওয়ালাদের পার্থক্য কোথায়? অর্থাৎ তারা বলেন, ছয় উসুল সবাই মেনে নিলে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে। তাদের অনেকে জিহাদের প্রয়োজনীয়তাও অস্বীকার করেন। তারা "আমর বিল মারূফ"-কে-ই শুধু দায়িত্ব মনে করছেন। অথচ 'নাহী আনিল মুনকার' ছাড়া ইসলাম তো হুকুম-আহকাম নিয়ে পূর্ণতা পেতে পারে না।

ডা. আহমদ ঃ তাদের সাথে আমার কথার আকাশ-জমিন পার্থক্য। তাবলীগীরা জিহাদের কথা বলে না, নাহী আনিল মুনকারের উপর আমল করে না। তারা শুধু মিষ্টি দাওয়াতের কথা বলে, ব্যক্তি সংশোধনের কথা বলে। তারা সমাজ পরিবর্তনের কথা ভাবে না। মহানবী (সঃ)-এর ইনকিলাবী জীবনের সাথে তারা পরিচিত নয়। তারা শুধু 'ফাজায়েলে আমলের' জ্ঞান চর্চা করে। আর আমি বলছি, দাওয়াত বা তাবলীগের মাধ্যমে এমন একটি গ্রুপ তৈরী করা, যারা কতল হবে এবং কতল করবে। আমি জিহাদকে অস্বীকার কিংবা অপ্রয়োজনীয় মনে করছি না। আমি বলছি শক্তি সঞ্চয়ের পর জিহাদের কথা।

ঃ তালেবান মুভমেন্ট সম্পর্কে আপনার মতামত কি?

ডা. আহমদ ঃ তালেবানকে মুভমেন্ট বলা উচিৎ নয়। এটা কোন নিয়মতান্ত্রিক বিপ্লব বা পরিবর্তন নয়। এটা অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নিজ থেকে সৃষ্ট একটি বিস্ফোরণ। অর্থাৎ

সোভিয়েত বাহিনীর বিদায়ের পর অন্তর্দ্বন্দ্ব দেশটিকে ধ্বংস করে দিচ্ছিলো। কাবুলে চৌদ্দ বছরের সোভিয়েতবিরোধী যুদ্ধে যত ক্ষতি হয়নি, তার দশ গুণ বেশি হয়েছে চার বছরের গৃহযুদ্ধে। দেশের মানুষ নিরাশ ও দিশেহারা হয়ে পড়েছিল। এমনি এক সন্ধিক্ষণে তালেবান দাঁড়িয়ে দেশের মানুষকে বললো, আমাদের কাছে অস্ত্র জমা দাও আমরা শান্তি এনে দেব। মানুষ তাদের কথা বিশ্বাস করল। দেশের মানুষ তালেবানদের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করলো। এটা হয়েছে অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে। লক্ষণীয় বিষয় হলো, হাদীসে উল্লেখিত হয়েছে "আখেরী জামানায় জেরুজালেম রক্ষার জন্য যে বাহিনী তৈরী হবে তারা বের হবে খোরাসান থেকে।"

তোমাদের স্মরণ রাখতে হবে, খোরাসান আফগানিস্তানের একটি এলাকার নাম। আমি মনে করি, সেই প্রস্তুতি চলছে। অনেকে আপত্তি করছেন এই বলে যে, তালেবানদের শাসন ব্যবস্থা, শিক্ষা পদ্ধতি ইত্যাদি অনিয়মতান্ত্রিক। হ্যাঁ, কিছুটা আছে। তবে তা ঠিক হয়ে যাবে। আমার মতে, তালেবানদের আফগানিস্তানের সাথে এশিয়ার মুসলিম দেশগুলোর কনফেডারেশন হওয়া প্রয়োজন।

ঃ আপনি আফগানিস্তানের সাথে কনফেডারেশনের কথা বলছেন, অথচ বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের অনেকে বলছেন ভারতের সাথে কনফেডারেশনের কথা। এ ব্যাপারে আপনার অভিমত কি?

ডা. আহমদ ঃ আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আমাদেরকে যে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে, হতে পারে এটা তারই অংশ। আল্লাহ্‌ পাকের আজাব সম্পর্কে আমি আপনাকে ইতোপূর্বে বলেছি। পাকিস্তানে এখনো আমরা ইসলামী হুকুমত কায়িম করতে পারিনি। হিন্দুস্তানে যে আইন ছিলো তা আজো চলছে। সুদী ব্যবসা, সুদী ব্যাংকিং পদ্ধতি, মুক্ত অর্থনীতি ইত্যাদি হিন্দুস্তানে যেমন ছিলো আমাদের দেশেও তেমনি চলছে। বরং তারা আমাদের থেকে একদিক থেকে কিছুটা ভালো যে, সেখানে জায়গিরদারী বাতিল করা হয়েছে। আমাদের এখানে এখনো তা চলছে। কালচার, ব্যবহার, বেপর্দা ইত্যাদি তো তাদের মতোই আমাদের এখানেও চলছে। ভাষাগত দিক দিয়ে কিছু কিছু মিল রয়েছে। যেমন এখানেও পাঞ্জাবী চলে, সেখানেও। এই অবস্থায় যদি ইসলাম না থাকে, তবে কিভাবে পাকিস্তান আপন মহিমায় পৃথক সত্তা নিয়ে দাঁড়াবে? আর যদি পৃথক দর্শনের উপর পাকিস্তানের দাঁড়ানো সম্ভব না হয়, তবে মুসলিম ইন্ডিয়ার শত বছরের ইতিহাস-ঐতিহ্য ধ্বংস হয়ে যাবে।

স্যার সৈয়দ আহমদ খান যে কাজ শুরু করেছিলেন, আলীগড় যে চিন্তায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, যে চিন্তার উপর ১৯০৬ সালে মুসলিম লীগের জন্ম হল, ১৯৪০-এ শের-এ-বাংলা কর্তৃক মুসলিম লীগের লাহোর অধিবেশনে পাকিস্তানের রূপরেখা উপস্থাপন করা হল, এর পর পাকিস্তানের জন্ম হল। এসব এখন প্রায় একশ' বছরের কথা। যদি কনফেডারেশন করে পাকিস্তান ধ্বংস করা হয়, তবে একশ' বছরের ত্যাগ-সাধনা সবই

বিফলে যাবে। তবে যদি আমাদের এখানে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত থাকে এবং এর ভিত্তিতে একটা পদ্ধতি উপস্থাপন করে আমরা তাদেরকে বলতে পারি যে, এটা আমাদের নবী (সঃ) দিয়ে গেছেন, যা মানুষের জন্য আল্লাহ্র পক্ষ থেকে রহমত স্বরূপ। তখন যদি তারা তা গ্রহণ করে, তবে সেই ভিত্তিতে চুক্তি হতে পারে। নতুবা নয়।

খেলাফতের সাথে গণতন্ত্রের ব্যবধানটা কি?

ডা. আহমদ ঃ একটা ব্যবধান হলো, গণতন্ত্র যাদেরকে আইন প্রণয়নের অধিকারী মনে করে, কোরআন তাদেরকে আইন প্রণয়নে নিষেধ করেছে।

যদিও এটা বিস্তারিত আলোচনার বিষয়, তবু আপনাকে এ ব্যাপারে সংক্ষেপে দু'-চার কথা বলছি। লাহোরে অবস্থানরত আমেরিকার রাজনৈতিক বিষয়ক অফিসার খেলাফত সম্পর্কে জানার জন্য আমার কাছে এসেছিলো। আমি তাকে বললাম, দেখ, আমেরিকার সংবিধান দুনিয়ার সকল গণতান্ত্রিক সংবিধানের মধ্যে উন্নত। তুমি সেই সংবিধান নিয়ে এসো এবং এতে তিনটি কথা যুক্ত করে দাও।

এক. হাকিমিয়ত চলবে আল্লাহ্র–মানুষের নয়।

দুই. রাষ্ট্রের আইন প্রণীত হবে কোরআন ও হাদীসের ভিত্তিতে। সবাই ঐক্যবদ্ধ হয়েও কোরআন-সুন্নাহ বিরোধী আইন প্রণয়ন করা চলবে না। এই নিয়মে 'আমরুহুম শূরা বাইনাহুম' প্রতিষ্ঠিত হবে।

তিন. অমুসলিমরা খেলাফতের অধীনে নিরাপত্তাভিত্তিক এক সংখ্যালঘু জাতি হবে। কারণ খেলাফতের আন্তর্জাতিক নীতি হবে ইসলামের প্রচার ও প্রসার। তবে অমুসলিমদের জান, মাল, উপাসনালয় ইত্যাদির নিরাপত্তা দেওয়া হবে। ধর্মীয় ব্যাপারে তারা সম্পূর্ণ স্বাধীন থাকবে। এমনকি মসজিদ থেকেও বেশি তাদের ধর্মালয়ের নিরাপত্তা দেওয়া হবে। পবিত্র কোরআনের সূরা হজ্জে মসজিদের পূর্বে অমুসলিমদের উপাসনালয়ের কথা বলা হয়েছে। তাদের সব কিছু হবে। এমনকি তাদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক সকল বিষয়-আসয় যেমন বিয়ে, সম্পত্তি বণ্টন, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি চলবে তাদের আইনে। শুধু উচ্চ পর্যায়ে নীতি নির্ধারণে তারা অংশ নিতে পারবে না। আইন প্রণয়নে তাদের ভূমিকা থাকবে না। তবে তাদের দাবী ও সমস্যার কথা সরকারের নিকট উপস্থাপন করতে পারবে। এ জন্য তাদেরকে পৃথক পার্লামেন্ট তৈরী করে দেওয়া যেতে পারে।

এ তিনটি কথা যুক্ত করার পর পরামর্শের ভিত্তিতে সব কিছু করা যেতে পারে। এ তিনটি কথা সংবিধানে থাকার পর কেউ যদি কোরআন-সুন্নাহ্বিরোধী আইন প্রণয়ন করে, তখন যে কেউ প্রতিবাদ করলে সরকার সেই আইন বাতিল করতে বাধ্য থাকবে। আর এর নাম-ই খেলাফত। মোটকথা, খিলাফত আর গণতন্ত্রের মধ্যে ব্যবধান হচ্ছে সার্বভৌমত্বের অধিকারীর ব্যবধান। গণতন্ত্রে সকল সার্বভৌমত্বের মালিক বলা হয় জনগণকে এবং কোরআন-সুন্নাহ মতে সার্বভৌমত্বের মালিক আল্লাহ্।

ঃ অনেকে গণতন্ত্রকে কুফরী মতবাদ বলেন। আবার কেউ একটু অগ্রসর হয়ে গণতন্ত্রীকেও কাফের বলেন। আপনি কি মনে করেন?

ডা. আহমদ ঃ জনগণের সার্বভৌমত্বের এই বিশ্বাস অবশ্যই কুফরী এবং শিরক। যারা গণতন্ত্রী, তাদেরকে আমি পাপিষ্ঠ গোমরাহ্ মনে করলেও কাফের বলিনা। ইসলাম জনগণের সার্বভৌমত্বের কথা স্বীকার করে না। ইসলাম জনগণকে খলিফা মনে করে মাত্র।

ঃ ইসলামপন্থী অনেকেই তো গণতন্ত্রের পথে কাজ করছেন দেখছি। তারা ইসলামী গণতন্ত্রের কথা বলেন। আপনি কি মনে করেন?

ডা. আহমদ ঃ আমার মতে তারা বিভ্রান্ত। তারা সঠিক পথ অনুসরণ করছে না। আমি আজ পর্যন্ত গণতন্ত্রের জন্য এক মিনিটও নষ্ট করিনি। যারা গণতন্ত্রকে পছন্দ করে, তাদের দলেও যোগ দেইনি। দেখ, পাকিস্তানের দ্বীনি সংগঠনগুলো দু'টি ভুল করেছে।

প্রথম ভুল, তারা নির্বাচনের ময়দানে এসে ক্ষমতার দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়েছে। এর ফলে দ্বীন একটা দলীয় ইস্যুতে পরিণত হয়েছে। জনগণের ইস্যু নয়।

দ্বিতীয় ভুল, পাকিস্তানে যখন সামরিক শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন দ্বীনি সংগঠনগুলো সেক্যুলার সংগঠনগলোর সাথে এক প্লাটফরমে দাঁড়িয়ে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলন করেছে। ফলাফল কি হয়েছে? আইয়ুব খানের শাসন শেষ হয়েছে, এসেছে কে? ভূট্টো সাহেব। বর্তমান পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে একথা মানতেই হবে, আপনি যদি সেক্যুলারদের সাথে মিলে আন্দোলন করেন, তবে সেক্যুলার শাসনই আসবে। পাকিস্তানে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত না হওয়ার জন্য আমি সবচাইতে বেশি দায়ী মনে করি দ্বীনি সংগঠনগুলোর গণতান্ত্রিক পথ অনুসরণ করাকে।

ঃ মাওলানা আবুল আ'লা মওদুদী সাহেব প্রথম দিকে গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে ছিলেন। কিন্তু পরবর্তীতে তিনি গণতান্ত্রিক পথ অনুসরণ করলেন, নির্বাচনে গেলেন, যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনে ফাতেমা জিন্নাহকে সাহায্য করলেন। এ সম্পর্কে আপনার মন্তব্য কি?

ডা. আহমদ ঃ এ সবের বিরুদ্ধে আমি তখন কথা বলেছি। আমি এসব তৎপরতাকে ভুল মনে করি। পাকিস্তানের দ্বীনি সংগঠনগুলোর মধ্যে সর্বপ্রথম নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন মাওলানা মওদুদী। আমার মতে, এটা তাঁর অনেক বড় বিভ্রান্তি। পাকিস্তান হওয়ার পর মাওলানা মওদুদী মূল্যবান একটি কাজ করেছিলেন, যা অত্যন্ত উঁচু পর্যায়ের। তা হলো, তিনি দাবী করেছিলেন, পাকিস্তানের সংবিধান ইসলামী নীতি অনুযায়ী প্রণীত হবে। সে সময় পর্যন্ত জামাত কোন নির্বাচনে অংশ নেয়নি এবং প্রচলিত নিয়মানুসারে তা কোন তথাকথিত রাজনৈতিক দলও ছিলো না। তখন গোটা জাতি তাদের দাবীতে একমত ছিলো। মাওলানা শাব্বির আহমদ উসমানী (রঃ)-এর মতো উঁচু পর্যায়ের আলেম ও নেতা যিনি জামাতী না হয়েও মওদুদীর এই দাবীর সাথে একমত ছিলেন। তাই বলি, পদক্ষেপ শুদ্ধ ছিলো। যদি তা নিয়ে তিনি সামনে অগ্রসর হতেন,

তবে 'আমর বিল মারূফ নাহী আনিল মুনকারের নীতিতে' তাদের দাবী পূরণ হত। কিন্তু তিনি পা বাড়ালেন অন্যদিকে; নির্বাচনের ধোঁকায় পড়লেন। যারা বলে, আমি ক্ষমতায় গেলে ইসলাম কায়েম করবো, এ ধরনের কথা অনেক বড় বিভ্রান্তি। ফলে অনেক বড় ক্ষতি হয়ে গেলো। এর পর বাকী দলগুলো তার সাথে থাকলো না। আমার মতে, পাকিস্তানে ইসলামী হুকুমত কায়েম না হওয়ার জন্য সব চাইতে বড় দায়ী মওলানা মওদুদীর এই ভুল সিদ্ধান্ত।

ঃ এক সময় তো আপনি নিজেও মাওলানা মওদুদীর সাথে ছিলেন। জামাতের ছাত্র সংগঠন ইসলামী জমিয়তে তালাবার নাজিমে আলা ছিলেন। কিন্তু এর পর জামাত ছেড়ে দিলেন কেন?

ডা. আহমদ ঃ দেখ, সে সময় আমি যুবক ছিলাম। পাকিস্তানের জন্মলগ্নে, অর্থাৎ- ১৯৪৬ ইংরেজীতে আমি এস,এস,সি পরীক্ষা দেই। তখন আমার বয়স ১৫ বছর। হাই স্কুলের জীবনে আমি কাজ করেছি মুসলিম স্টুডেন্ট ফেডারেশনে। পাকিস্তান আন্দোলনে আমি পূর্ব পাঞ্জাবের জেলা ফেডারেশনের সেক্রেটারী জেনারেল ছিলাম। পাকিস্তান হওয়ার পর মাওলানা মওদুদী এখানে আসেন। আমাকে এই বলে তাঁর দলে যোগদান করতে বলেন যে, আমরা পাকিস্তানের সংবিধান ইসলামী করার জন্য আন্দোলন করছি। এ আন্দোলনে তোমাদের মত ঈমানদীপ্ত যুবকের প্রয়োজন। আমি তাঁর সাথে একমত হয়ে জমিয়তে তালাবা-এ যোগ দিলাম। তিনি যখন প্রথম নির্বাচনে গেলেন, তখনো আমি বুঝতে পারিনি এটা যে ভুল পদক্ষেপ। তখন আমার তা বোঝারও যোগ্যতা ছিলো না। ১৯৫৪ সালে ছাত্র জীবন শেষে জামাতে ইসলামীতে যোগ দিলাম এবং দলের রোকন হয়ে গেলাম। এরপর আমার বুঝে আসে, জামাতে ইসলামী ভুল পথে চলছে। দলের নীতিগত পরিবর্তন আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। আমি এমন একটা ধারণা নিয়ে জামাতে গিয়েছিলাম যে, তাদের মধ্যে তাকওয়াহ, লিল্লাহিয়ত, আদর্শ থাকবে; আমি তাদের সাথে থাকলে নিজেও এসবের উপর আমল করতে পারবো। কিন্তু দেখলাম, এসবের কিছুই তাদের মধ্যে নেই।

ঃ কেন নেই?

ডা. আহমদ ঃ নির্বাচনে অংশগ্রহণের পূর্বে জামাতে ইসলামী ছিলো একটি আদর্শবান ইসলামী ইনকিলাবী সংগঠন। কিন্তু নির্বাচনে গিয়ে হয়ে গেছে ইসলাম পছন্দ জাতীয়তাবাদী এক রাজনৈতিক দল। আমার এই চিন্তা আমি জামাতের বৈঠকে উপস্থাপন করলাম। ১৯৫৫ সালে জামাতের বার্ষিক সম্মেলনে তা উপস্থাপনের ইচ্ছে ছিলো। মাওলানা মওদুদী আমাকে সে সুযোগ দিলেন না। তিনি চারজন রোকন পাঠালেন আমার বক্তব্য বোঝার জন্য। আমি তাদের কাছে লিখিত বক্তব্যে উদাহরণসহ বোঝাতে চেষ্টা করলাম যে, জামাতে ইসলামীর নীতি পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে। এই পরিবর্তনটা এক প্রকারের বিভ্রান্তি। এই বিভ্রান্তির পথে আমরা এখনো তেমন অগ্রসর

হইনি বলে ফিরে আসার সুযোগ আছে। আমার অনুরোধ, ফিরে আসুন এবং নির্বাচনের পথ পরিত্যাগ করুন। আমার এই বক্তব্য বই আকারে প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু মাওলানা মওদুদীর আত্মবিশ্বাস ছিলো, নির্বাচনের মাধ্যমে উদ্দেশ্য সফল হবে। এই বিশ্বাস সম্পূর্ণ ভুল ছিলো। ১৯৫৭ সালে আমি যখন দেখলাম, জামাতের দ্বারা উদ্দেশ্য সফল হবে না, তখন নিজেই জামাত ত্যাগ করলাম। প্রায় ৪২ বছর হয়ে গেলো আমি জামাত থেকে বিচ্ছিন্ন।

ঃ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে আপনাদের স্লোগান ছিলো "পাকিস্তান কা মতলব কেয়া–লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" কিন্তু আজও তা বাস্তবে রূপ নিলো না। পাকিস্তান আন্দোলনের কর্মী হিসাবে এর কারণ কি মনে করেন?

ডা. আহমদ ঃ প্রথম কারণ হলো, যে মুসলিম লীগের মাধ্যমে পাকিস্তানের জন্ম, তা নিছক একটি মুসলিম জাতীয়তাবাদী সংগঠন ছিলো। এটি আদৌ দ্বীনি সংগঠন ছিলো না। এর নেতৃত্বও কোন দ্বীনি লোকের দখলে ছিলো না। তাদের প্রায় সকলেই ছিল সেক্যুলার প্রকৃতির। তারা আমলী মুসলমান ছিলো না। মুসলমানদের সংগঠন, তাই এর নাম হয়েছে মুসলিম লীগ। বর্তমানে তো অনেক মদ্যপায়ীও মুসলমান আছে। এমনকি মুসলিম লীগ তো কাদিয়ানীদেরকেও মুসলমান মনে করতো। তাই এমন সংগঠনের মাধ্যমে ইসলাম প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন অবাস্তব ছিলো। আমি ইতোপূর্বে বলেছি, এক্ষেত্রে দ্বীনি সংগঠনসমূহ কি ভুল করেছে। মোট কথা, মুসলিম লীগের নিকট তো ইসলাম প্রতিষ্ঠার আশাই করা যায় না। যাদের প্রতি আশা ছিলো, তারা ভুল পথে চললো। পাকিস্তানে ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠিত না হওয়ার এটাই কারণ।

ঃ মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর জীবনাচার, স্টাইল এবং নীতি কিছুই তো ইসলামিক ছিলো না। কোনভাবেই তো তিনি ইসলামী নেতা হওয়ার যোগ্যতা রাখতেন না। এর পরও তিনি হয়েছেন আপনাদের নেতা! কেন, এই সময় কি নেতৃত্বদানের মতো যোগ্য আলেম ভারতবর্ষে ছিলেন না?

ডা. আহমদ ঃ আসলে সে সময় অনেক আলেম চাইতেন হিন্দুদের সাথে থেকে আন্দোলন করে ইংরেজদের গোলামী থেকে মুক্তি পাওয়া। কিন্তু সাধারণ মুসলমান অনুভব করে, তাদের সিদ্ধান্ত ভুল। হিন্দুরা কখনো ইনসাফ করবে না। সুযোগ পেলে আটশ' বছরের গোলামীর প্রতিশোধ নেবে। এ জন্যই ঐ সব আলিমের কথা সাধারণ মুসলমানের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়নি। মাওলানা হোসাইন আহমদ মাদানী, মাওলানা আবুল কালাম আজাদ ছিলেন এই দলে। অন্যদিকে মাওলানা আশরাফ আলী থানবী, মাওলানা শাব্বির আহমদ ওসমানী, মাওলানা জাফর আহমদ ওসমানী প্রমুখ তো অনেক উঁচু পর্যায়ের আলেম ছিলেন। তবু তাঁরা জিন্নাহকে এই বুঝে সমর্থন করলেন যে, যদিও লোকটা দ্বীনদার নয়, তবে আজকের এই পরিস্থিতিতে যে রকম রাজনীতিকের প্রয়োজন, যে যোগ্যতার প্রয়োজন, ইংরেজদের ভাষা ও নীতি বোঝার মতো যে জ্ঞানের প্রয়োজন,

তা জিন্নাহর মধ্যে আছে। তাই তাকে গোটা জাতির পক্ষ থেকে আলাদা ভূখণ্ড আদায়ের লক্ষ্যে উকিল নিয়োগ করা যায়।

পাঞ্জাবের জামায়েত আলী শাহ উঁচু পর্যায়ের একজন পীর ছিলেন। তখন তাকে প্রশ্ন করা হয়েছিলো, কীভাবে আপনি একজন দাড়ী কামানো লোকের হাতে বয়াত হলেন? উত্তরে তিনি বলেছিলেন ঃ "আমি তাকে ইমাম বা আমীর হিসাবে গ্রহণ করিনি। তার কাছে বায়াতও নেইনি। আমাদের মুসলিম জাতির একটা মামলা চলছে হিন্দুদের সাথে। এই মামলায় একজন উকিল প্রয়োজন। এখন উকিল তো তাকেই নিয়োগ করতে হবে, যে আইন জানে এবং সাফল্য অর্জনের যোগ্যতা রাখে। আমরা তো এ প্রসংগে যোগ্য উকিল মনে করি মোহাম্মদ আলী জিন্নাহকে।" পীর সাহেবের এই উত্তর আমার মতে সঠিক ছিলো। পাকিস্তানের পোকায় খাওয়া মানচিত্র যদিও ইংরেজ এবং হিন্দুদের ষড়যন্ত্রের কারণে মানতে হয়েছে, তবু বাস্তবতা হলো যতটুকু হয়েছে তা জিন্নাহর লড়াইয়ের ফলে। যদিও ইসলামী হুকুমত হয়নি, তবু তো হিন্দুস্তানের উপর মুসলমানদের দু'টি আজাদ দেশ হয়েছে। যদিও বাংলাদেশ আজ আর পাকিস্তান নয়, তবু সত্য যে, বাংলাদেশও হিন্দুদের গোলামী থেকে মুক্ত একটি স্বাধীন মুসলিম দেশ। এখন এই দুই দেশেই আমাদের সুযোগ আছে, ইচ্ছে করলে ইসলামী শরিয়ত প্রতিষ্ঠিত করতে পারবো।

ঃ একাত্তরে বাংলাদেশে পাক সৈন্য কর্তৃক যে জুলুম-নির্যাতন হয়েছে, সে সম্পর্কে আপনি ১৯৯৬ সালের ডিসেম্বর সংখ্যা 'নেদা-এ-খেলাফত' সাপ্তাহিকীতে লিখেছেন। সেখানে হামিদুর রহমান কমিশনের রিপোর্ট ভুট্টো সাহেব কর্তৃক গায়েব করার কথা উল্লেখ করেছেন। আমি জেনারেল (অবঃ) রাও ফরমান আলীকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি বললেন—"সেই রিপোর্টে রাজনীতিকদের বিরুদ্ধে কিছুই ছিলো না। সবই ছিলো সেনাবাহিনী বিষয়ক। অথচ ঘটনার জন্য প্রকৃত দায়ী রাজনীতিকরা।" এ সম্পর্কে আপনার মতামত কি?

ডা. আহমদ ঃ আমার মতে তো এই ভুলের সূচনা হয়েছে স্বয়ং কায়েদে আজম থেকে। কায়দে আজম থেকে বড় দুই ভুল হয়েছে।

এক. তিনি দুনিয়ার সামনে নিজেকে এক সেক্যুলার নেতা হিসাবে প্রকাশ করতে চেয়েছেন। তা এ জন্য করেছেন যে, দুনিয়া যাতে ইসলাম আগমনের ভয়ে আতংকিত না হয়। এ জন্যই এক কাদিয়ানীকে পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং এক হিন্দুকে আইনমন্ত্রী করলেন।

ঃ এই দুই মন্ত্রীর নাম কি?

ডা. আহমদ ঃ চৌধুরী স্যার জাফর উল্লাহ খান কাদিয়ানী ছিলো। আর হিন্দু মন্ত্রীর নাম জগিন্দ্রনাথ মন্ডল। বাংলার মুসলমান সর্বদা সচেতন ও দ্বীনদার ছিলো। তারা ইসলামের জন্য পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলো। এই ঘটনায় তারা মর্মাহত হয়।

দুই. ভাষার সমস্যাটা কায়েদে আজম সঠিকভাবে বুঝতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। হিন্দির মোকাবেলায় উর্দু– এটা ভিন্ন কথা। কিন্তু মাতৃভাষার ব্যাপার তো অনেক গভীরের। পরামর্শদাতারা তাঁকে পরামর্শ দিয়েছিলো বটে, কিন্তু তাতে তিনি কর্ণপাত করলেন না। পাকিস্তান হওয়ার পরই স্যার আগা খান পরামর্শ দিয়েছিলেন, পাকিস্তানের সরকারী ভাষা আরবী করা হোক। আমার এক আত্মীয় জাহিদ হোসেন (পাকিস্তান স্টেট ব্যাংকের তৎকালীন ডাইরেক্টর)-ও কায়েদে আজমকে এই পরামর্শ দিয়েছিলেন। সিন্ধীরা বলেছিলো উর্দু না করে যদি আরবীকে সরকারী ভাষা করা হয়, তবে আমরা মেনে নেব। আমার মনে হয়, বাংগালীরাও আপত্তি করতো না। কিন্তু তা করা হলো না। এটা কায়েদে আজমের বড় ভুল। তিনি পূর্ব পাকিস্তান গিয়েও বুঝতে পারলেন না এ বিষয়ের গভীরতা। বাংগালীদের ভয় ছিলো যারা বিহার থেকে এসেছে তাদের মাতৃভাষা তো উর্দু। যদি তাদের ভাষাও উর্দু করা হয়, তবে বিহারীরা বাংগালী থেকে এগিয়ে যাবে। এটা যুক্তিসঙ্গত ভয়। এই ভয় সিন্ধীদেরও ছিলো। তাই আমার মতে, উর্দুকে জাতীয় ভাষা করার সিদ্ধান্ত ভুল ছিলো।

ভুল তো সেখান থেকে শুরু হয়েছে। এর পর রাজধানী করাচী থেকে ইসলামাবাদে নিয়ে আসা হলো। এ ছিলো আরেক ভুল। তখনকার বাংগালী নেতারা স্পষ্ট বললেন, এটা হলো সমাপ্তির সূচনা। কারণ পূর্ব পাকিস্তানের সাথে পশ্চিম পাকিস্তানের সরাসরি যোগাযোগ ছিল একমাত্র করাচীর সমুদ্র বন্দরের সাথে। চট্টগ্রাম থেকে জাহাজে কম ভাড়ায় করাচীতে আসা যেত। রাজধানী পরিবর্তনের ফলে পূর্ব পাকিস্তানের সাথে ইসলামাবাদের যোগাযোগ ব্যয়বহুল হয়ে গেলো। এছাড়া আরো অসংখ্য বিষয় রয়েছে। সামরিক শাসন আসার পর বাংগালীদের ধারণা হলো, যেহেতু সেনাবাহিনীতে সবাই পাঞ্জাবী তাই এই শাসন পাঞ্জাবীদের শাসন। শুধু পূর্ব পাকিস্তানে নয়, অন্যান্য প্রদেশেরও জনসাধারণের মনে এই ধারণা সৃষ্টি হয়েছিল। পূর্ব পাকিস্তানের হিন্দু সম্প্রদায় এটাকে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সুবর্ণ সুযোগ হিসাবে ব্যবহার করে। বাংগালী মুসলমানরা চিন্তা করলো সত্যিই তো, পাঞ্জাবীদের গোলামীর জন্য আমরা পাকিস্তানের জন্ম দেইনি। এসব কারণে পূর্ব পাকিস্তানে মুসলিম লীগের পরাজয় ঘটে যুক্তফ্রন্টের কাছে। এসবের রাজনৈতিক সমাধান করা যেত। তা করা হয়নি। শক্তি ব্যবহার করা হয়েছে। মোট কথা ভুলের এক দীর্ঘ তালিকা এখানে রয়েছে।

আমি ১৯৬৯ সালে লিখেছিলাম, পূর্ব পাকিস্তানে গণভোট দেয়া হোক এই প্রশ্নে যে, তারা আমাদের সাথে থাকতে চায় কি না? কারণ এই সিদ্ধান্ত একমাত্র তারাই নিতে পারে। যদি তারা আমাদের সাথে থাকতে না চায়, তবে দুনিয়ার কোন শক্তি নেই তাদের ধরে রাখার। যদি তারা পৃথক হতে চায়, তবে ভালো। সংঘাত সৃষ্টির আগে আলোচনার মাধ্যমে ভাই ভাই-এর মতো পৃথক হয়ে যাওয়া ভাল। এটা তো কোন ব্যাপার নয়। তারা পাকিস্তান থেকে পৃথক হয়ে গেলে তো কাফের হয়ে যাবে না; বরং আন্তর্জাতিক

রাজনীতিতে সঙ্গী আরেকটি মুসলিম দেশ বৃদ্ধি পাবে। আমি এসব কথা সেই সময় লিখেছি। কিন্তু আমাদের এখানে তো ইসলাম কিংবা গণতন্ত্র কোনটাই ছিলো না। সামরিক শাসন দীর্ঘদিন চেপেছিল আমাদের উপর। সামরিক লোকেরা সমস্যার রাজনৈতিক সমাধান থেকে শক্তি প্রয়োগকে বেশি বুঝে। এই শক্তি প্রয়োগের ফলে আমাদের শাস্তি হয়েছে। অনেক বড় শাস্তি।

ঃ একাত্তরের ব্যাপারে আমরা গোটা পাকিস্তানীদেরকে দায়ী মনে করি। এখানে এসে দেখি সাধারণ মানুষ একাত্তরের ব্যাপারে তেমন কিছু জানার সুযোগ পায়নি। বিভিন্ন লোকের সাথে আলাপ করে দেখলাম কেউ দায়ী করছেন আইয়ূব খানকে, কেউ ভুট্টোকে, আবার কেউ ইয়াহিয়াকে, শেখ মুজিবের প্রতিও অনেকের ক্ষোভ রয়েছে। আপনার মতে কে দায়ী?

ডা. আহমদ ঃ এটা দীর্ঘ আলোচনার ব্যাপার। আমি তোমাকে তো বললামই এ সংকটের শুরু হয়েছে স্বয়ং কায়েদে আজম থেকে। কায়েদে আজম যখন সেক্যুলারদের মতো ঘোষণা দিলেন, "ধর্ম হচ্ছে একজন মানুষের ব্যক্তিগত বিশ্বাস মাত্র।" তখন মুসলমানরা ভাবতে লাগলো, এই যদি হয় পাকিস্তান, তবে হিন্দুস্তানের সাথে পাকিস্তানের ব্যবধান কি? হিন্দুস্তানেও তো মুসলমানদের ব্যক্তিগত ধর্ম পালনে অসুবিধা নেই। ব্যক্তিগত ধর্মীয় বিশ্বাসের ব্যাপারে ভারতে আজো তো কোন বাধা নেই। পাকিস্তান তো হয়েছিলো ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠার জন্য। পাকিস্তান আন্দোলনের স্লোগান তো ছিলো– "পাকিস্তান কা মতলব কেয়া– লাইলাহা ইল্লাল্লাহ।"

কায়েদে আজম যে কোন কারণেই এই নীতি গ্রহণ করেন না কেন, তা তার ব্যক্তিগত ব্যাপার। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে, সাধারণ মুসলমানের ভেতর এর ফলে খারাপ ধারণা সৃষ্টি হয়। ধার্মিকতায় পূর্ব পাকিস্তানের মুসলমানরা পশ্চিম পাকিস্তানের মুসলমান থেকে এগিয়ে আছে। কায়েদে আজমের এই বক্তব্য তাই তাদেরকে বেশি আহত করে। ভাষার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতেও কায়েদে আজম ভুল করেছেন। তাঁর এই ভুল দু'টি ছিল অত্যন্ত মারাত্মক। যদিও কায়েদে আজম পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা নেতা, তবু স্মরণ রাখতে হবে, তিনি ফেরেস্তা ছিলেন না। ইমাম কিংবা মাসুমও ছিলেন না। তাঁর কাছ থেকেও ভুল হতে পারে এবং হয়েছেও। এরপর ভুলের উপর ভুল, আসল সামরিক শাসন। সর্বশেষ ভুল প্রধানমন্ত্রিত্বের লড়াই। পূর্ব পাকিস্তানের ছোট ছোট দলগুলোকে সাথে নিয়ে শেখ মুজিব ময়দানে আসলে ভুট্টো সাহেবও পশ্চিম পাকিস্তানের ছোট ছোট দলগুলোকে কলে-কৌশলে তার সাথে নিয়ে নিলেন। উভয় পক্ষেই আঞ্চলিকতা মাথা উঁচু করে দাঁড়ালো। সংখ্যানুপাতে শেখ মুজিব নির্বাচিত হলে ভুট্টো সাহেব প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ালেন। প্রস্তাব করলেন, দুই অংশে দুই প্রধানমন্ত্রী করা হোক। ভুট্টো সাহেবের যদি দেশপ্রেম থাকতো, সঠিক বুঝ থাকতো, তবে বলতেন, ঠিক আছে শেখ মুজিব যখন নির্বাচিত হয়েছে, তাকেই প্রধানমন্ত্রী করা হোক।

ঃ সাপ্তাহিক নেদা-এ-খেলাফত ম্যাগাজিনে আপনি বলেছেন, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় শেখ মুজিবের শাস্তি হওয়া উচিৎ ছিলো। এটা আপনি কিভাবে বললেন, মামলাটাই তো ছিল সামরিক সরকারের এক ষড়যন্ত্র?

ডা. আহমদ ঃ দেখ, আমি বলেছি এবং আজও বলছি যে, মামলা মধ্যখানে বন্ধ না করে চালিয়ে যাওয়া উচিৎ ছিলো। শেষ পর্যন্ত যদি প্রমাণিত হতো ষড়যন্ত্র মামলাই একটি ষড়যন্ত্র, তবে সরকারের চরিত্র সাধারণ মানুষের সামনে স্পষ্ট হয়ে যেত। আর যদি প্রমাণিত হতো, শেখ মুজিব দোষী, তবে তার শাস্তি হওয়া প্রয়োজন ছিলো। যে বাংগালী মুসলমানরা পাকিস্তান সৃষ্টি করেছিলো, তারা বুঝতো, শেখ মুজিবের আসল চাবি কোথায়। মধ্যখানে মামলা থামিয়ে ক্ষতি হয়েছে।

ঃ কারা থামালো এই মামলা?

ডা. আহমদ ঃ পাকিস্তানের নেতারা আইয়ূব খানকে প্রেসার দিলেন মামলা প্রত্যাহারের। আইয়ূব খান তাদের কথা শুনলো।

ঃ এতে লাভ হলো না ক্ষতি?

ডা. আহমদ ঃ বলা যাচ্ছে না। তবে আমার ধারণা, মামলা নিয়মতান্ত্রিকভাবে সমাপ্ত হলে ভালো হতো। যদি প্রমাণ হতো শেখ মুজিব ভারতের সাথে ষড়যন্ত্র করে পাকিস্তান ভাঙতে চাচ্ছে, তবে বাংলার মুসলমানরা তা সহ্য করতো না। পাকিস্তানের ব্যাপারে পশ্চিম পাকিস্তানী থেকে পূর্ব পাকিস্তানীদের মহব্বত বেশি ছিলো। মুসলিম লীগের জন্ম ঢাকায়। বাংলার মুসলমানদের ভোটে পাকিস্তানের জন্ম, ভারতবর্ষে মুসলিম লীগের শাসন সুদূর অতীত থেকেই যুক্ত বাংলায় ছিলো। তাই বলছি, যদি প্রমাণিত হয়ে যেত শেখ মুজিব পাকিস্তান ভাঙ্গার ষড়যন্ত্র করছে, তবে জনগণ তাকে নেতা হিসাবে গ্রহণ করতো না।

ঃ আপনি আপনার 'সুকুতে মাশরেকি পাকিস্তান' প্রবন্ধে লিখেছেন, ১১শ' মাইলের দূরত্বের যে দুই অঞ্চল নিয়ে এক পাকিস্তান হয়েছে, তা ভুল ছিলো। কারণ মধ্যখানে শত্রু দেশ ভারত। প্রশ্ন হলো, ভুলের উপর যে দেশের জন্ম, তার ঐক্য কিভাবে আশা করেন?

ডা. আহমদ ঃ দেখ আজো বলছি, এটা জিওগ্রাফিক্যাল ভুল ছিলো এবং এই ভুল করেছেন স্বয়ং বাংগালী নেতারা। নতুবা ২৩শে মার্চ ১৯৪০ এ লাহোর প্রস্তাবে স্পষ্ট দু'টি স্বাধীন রাষ্ট্রের কথা ছিলো। কিন্তু ১৯৪৬ সালে বাংলার নেতারা বললেন, দুই পৃথক রাষ্ট্রের কথা বাদ দিয়ে এক পাকিস্তান করা হোক। বাংলার মুসলমানেরা অত্যন্ত ইসলামী চেতনাসম্পন্ন।

ঃ পাকিস্তানে ইসলামী হুকুমত বা খেলাফত প্রতিষ্ঠিত করার জন্য বর্তমানে আপনার ভূমিকা কি?

ডা. আহমদ ঃ আমার সংগঠন তো চেষ্টা করে যাচ্ছে। কিন্তু মানুষ আমাদের দলে বেশি নেই। জামাতে ইসলামী এবং অন্যান্য ইসলামী দলে মানুষ আছে। আমি জীবনে

অনেক ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যদিয়ে এখানে এসে দাঁড়িয়েছি। যদিও আমাদের দলে মানুষ কম, তবে আমাদের চিন্তাধারা পরিষ্কার। আমরা যোগ্য লোক তৈরী করতে চেষ্টা করছি। স্পষ্ট করে বলা যাচ্ছে না, পাকিস্তানে কোন গ্রুপের হাতে ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠিত হবে।

ঃ বাংগালী মুসলমানদের প্রতি আপনার কোন পয়গাম আছে কি?

ডা. আহমদ ঃ কথা তো একটাই। সেখানে আপনারা খেলাফত প্রতিষ্ঠার জন্য সংঘবদ্ধ হোন। জনতাকে স্পষ্ট খেলাফতের ধারণা দিতে চেষ্টা করুন। খেলাফত প্রতিষ্ঠার জন্য বাংলাদেশ পাকিস্তান থেকে উপযুক্ত স্থান।

ঃ কিভাবে উপযুক্ত?

ডা. আহমদ ঃ সেখানে ফেরকাবাজী, সিলসিলাবাজী, গোত্রতান্ত্রিকতা তেমন নেই। আমাদের পাকিস্তানে বড় সমস্যা শিয়া-সুন্নির সংঘাত। এই বিষয়টা আমাদের রাজনীতি থেকে শুরু করে সেনাবাহিনী এবং পুলিশেও রয়েছে। আমাদের এখানে দেওবন্দী ও ব্রেলভীর যে সংঘাত, তা বাংলাদেশে ততটা নয়; আমি বরং দেখেছি, সেখানে উভয় পক্ষের বুজুর্গরা বিভিন্ন মৌলিক ব্যাপারে একে অন্যের সহযোগী হয়। তাই বলছি, খেলাফত প্রতিষ্ঠার জন্য পাকিস্তান থেকে বেশি উপযুক্ত স্থান বাংলাদেশ। সেখানে শুধু যোগ্য নেতৃত্বের প্রয়োজন।

ঃ আপনার অনেক সময় নষ্ট করলাম। সময় দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ।

ডাঃ. আহমদ ঃ তোমাকেও অনেক ধন্যবাদ।

মহাকবি আল্লামা ইকবাল

উর্দু ভাষায় ইকবালের মতো বিদ্যাবিশারদ কবি ও ব্যক্তিত্বের জন্ম উর্দূ সাহিত্যের সৌভাগ্য বলতে হবে। কবি আসাদুল্লাহ্ খান গালিবের পর উর্দূ সাহিত্যের দেহে নতুন প্রাণসঞ্চারে ইকবালের মতো কবির যে জন্ম হবে, তা কি কেউ চিন্তা করেছিলো? কেউ কি ধারণা করেছিলো, কবি গালিবের পর উর্দূ সাহিত্যকে গৌরবোজ্জ্বল সম্মানের ভিত্তিতে স্থাপিত করতে ১৮৭৭-এ পাঞ্জাবের সিয়ালকোটে ইকবালের জন্ম হবে?

'ইকবাল' নাম বিবেচনায় পিতা-মাতা যে দোয়া করেছিলেন, ইকবালের জীবনে এর মকবুলিয়াত সত্যে প্রমাণিত হলো। তাঁদের ইকবাল সনদ অর্থাৎ 'সৌভাগ্যশালী ছেলে' এক সময় ভারতবর্ষ অতিক্রম করে রোম, ইরান এবং ইউরোপের অনেক জ্ঞানী, বুদ্ধিজীবী বিশেষ করে সাহিত্যিকদের হৃদয়ে সম্মানজনক স্থান করে নিতে সক্ষম হয়েছেন। ইকবাল অনেক ক্ষেত্রে উর্দূ সাহিত্যের মহাকবি গালিবকেও অতিক্রম করে গেছেন। আমরা গালিবের অনেক কথার সাথে ইকবালের মিল দেখতে পাই। ইকবালের এক সময়ের সহপাঠী বিশিষ্ট কবি ও গবেষক আব্দুল কাদির মোহাম্মদ তা-ই বলেছেন, "আমি যদি পুনর্জন্মের বিশ্বাসী হতাম, তবে অবশ্যই বলতাম যে, উর্দূ ও ফার্সী কবিতার

জন্য যারা মির্জা গালিবের ভক্ত ছিলো, তারা তাদের প্রিয় কবির মৃত্যুর পর তাকে শান্তিতে বিশ্রাম করতে দেয়নি, তাকে বাধ্য করেছে কোন দেহে এসে আবার কবিতার বাগানে সেচকার্য করতে, ফলে তিনি পাঞ্জাবের এ অংশ– যাকে সিয়ালকোট বলে সেখানে পুনর্জন্ম নিয়েছেন এবং গালিবের পুনর্জন্ম হচ্ছেন আল্লামা ইকবাল। (দ্রঃ কুল্লিয়াতে ইকবালের ভূমিকা)।

তবে, এরপরও অনেক ক্ষেত্রে ইকবাল ব্যতিক্রম ছিলেন। ইকবালের মধ্যে আমরা কবি হাফিজের কিছু প্রভাব পেলেও বাস্তবে তিনি ছিলেন বিশ্ব সাহিত্যের কেন্দ্রভূমিতে বিচরণকারী কবি-সাহিত্যিকদের গর্ব মাওলানা জালাল উদ্দিন রুমির কাব্য ও চিন্তাধারায় প্রভাবিত। এ জন্যেই ইকবাল গবেষকরা স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, “Rumi is to Iqbal what virgil is to dante” অর্থাৎ “দান্তের কাছে যেমন ভার্জিল তেমনি ইকবালের কাছে রুমির স্থান।”

আল্লামা রুমির কাব্য ও চিন্তাধারায় শুধু ইকবালই প্রভাবিত ছিলেন না, বরং গোটা মুসলিম বিশ্বসহ ইউরোপ, আমেরিকার কবি ও চিন্তাবিদরাও প্রভাবিত ছিলেন। জার্মান কবি গ্যাটে ও রুকার্টের উপর রুমির প্রভাব ছিলো বলে গবেষকরা স্বীকার করেছেন। যেমন Dr. Annemerie Schimmle তাঁর বিখ্যাত লেখা Where east meets west-এ লিখেছেন—“Ruckert's master pleces are deeply influence by oriental language and poetry,—The mystical poetry of Jalaluddin Rumi was made known by him to the Geı mans; all his life he was a faithful companion to him.”

মাওলানা জালাল উদ্দিন রুমির জন্ম ১২০৭ খৃস্টাব্দে খোরাসানের অন্তর্গত বাল্খ শহরে। মৃত্যু ১২৭০ খৃস্টাব্দে। তাঁর বিখ্যাত অমর কাব্য ‘মসনবী’। এতে রয়েছে তাঁর কবি জীবনের ১৩ বছরের বাণী। ৬ খণ্ডে প্রায় ৪৭ হাজার পংক্তি রয়েছে এতে।

আল্লামা ইকবালের কাব্য প্রতিভার প্রকাশ হতে থাকে তাঁর স্কুল জীবনেই। স্কুল শেষ করে তিনি ভর্তি হলেন শিয়ালকোট কলেজে। এই কলেজের বিশেষত্ব ছিলো যে, এখানে আকাবির আলেমদের পদচিহ্ন অনুসরণ করা হয়। সিয়ালকোট কলেজের অধ্যাপক বিজ্ঞ আলেম-এ-দ্বীন মৌলভী সৈয়দ মীর হোসাইন প্রাচ্যের জ্ঞানের উপর দরস দিতেন। তাঁর শিক্ষা দানের বিশেষ মহত্ব ছিল, যারা তাঁর কাছে আরবী কিংবা ফার্সী শিখতো, তাদের মধ্যে সেই ভাষার বিশুদ্ধতা এসে যেতো। কলেজ জীবনে ইকবাল আরবী এবং ফার্সী শিক্ষা নিয়েছিলেন মৌলভী সৈয়দ মীর হোসাইনের মতো সুযোগ্য শিক্ষকের কাছে। ইকবাল-স্বভাবে সাহিত্যজ্ঞান কুদরতীভাবে সঞ্চিত ছিলো। মৌলভী সৈয়দ মীর হোসাইনের কাছে আরবী ও ফার্সী শিখে সোনায় সোহাগা হয়ে গেলেন। তখন পাঞ্জাবের প্রায় এলাকায় উর্দূ বাহাস এবং কবিতাচর্চা কম-বেশি চলতো। ইকবালের ছাত্র জীবনে সিয়ালকোটেও কবিতা পাঠের আসর বসতো। সেই আসরকে কেন্দ্র করেই ইকবালের

কবিতা লেখার সূচনা। উর্দূ কবিতায় তৎকালীন সময় কবি নওয়াব মির্জা খান দাগ দেহলভীর অনেক সুখ্যাতি ছিলো। কবি দাগ নামে তিনি সর্বজন পরিচিত ছিলেন।

সেই সময়ের অনেক কবি তাঁর শিষ্য ছিলেন। যারা দূরে থাকতেন, তারা পত্র ও গ্রন্থ সংশোধনীর মাধ্যমে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে নিতেন। সংশোধনীর জন্য অনেকেই ডাক মাধ্যমে তাঁর কাছে লেখা পাঠাতেন। প্রয়োজনীয় সংশোধন করে তিনি আবার ফেরৎ দিতেন। কবি দাগ গজলে সুন্দর ভাষা ব্যবহারে সেই সময়ে তুলনাহীন ছিলেন। অনেকের মতো ইকবালও প্রাথমিক দিকে তাঁর কাছে কবিতা পাঠাতেন। পত্র মাধ্যমে কবি দাগের সাথে এক সময় তাঁর সু-সম্পর্ক গড়ে ওঠে। যদিও ইকবালের প্রথম জীবনের লেখায় এমন কিছু ছিলো না, যার দ্বারা তিনি তখনই সুখ্যাতি পেতে পারেন, তবুও কবি দাগ তাঁর কবিতা পড়ে মন্তব্য করেছিলেন, "পাঞ্জাবের এই ছাত্র কোন সাধারণ কবি নয়, তাঁর লেখায় তেমন সংশোধনের প্রয়োজন নেই।" যদিও কবি দাগের সাথে ইকবালের শিষ্যত্বের সম্পর্ক বেশি দিন ধরে রাখা প্রয়োজন হয়নি, তবুও এই সম্পর্কের কথা স্বীকার করেছেন তিনি। কবি দাগের নাম উর্দূ কবিতায় এতই প্রভাবশালী ছিলো যে, ইকবালের হৃদয়ে দাগের সাথে অদেখা এই সামান্য সম্পর্কের গুরুত্ব অনেক ছিলো। অন্যদিকে দাগের জীবদ্দশায়ই সর্বসাধারণের কাছে ইকবাল কবি হিসাবে এতই মর্যাদা পেয়েছিলেন যে, স্বয়ং দাগ গর্ব করে বলেন, "আমি যাদের লেখা সংশোধন করে দিয়েছি তাদের একজন ইকবাল।"

সিয়ালকোট কলেজ থেকে আই,এ পাস করার পর ইকবাল বি,এ পড়ার জন্য লাহোর চলে আসেন। দর্শন শাস্ত্রের প্রতি তাঁর অত্যন্ত আকর্ষণ ছিলো। লাহোর এসে তিনি শিক্ষক হিসাবে 'প্রফেসর আরনল্ড' এর মতো দার্শনিককে পেয়ে গেলেন। প্রফেসর আরনল্ডও ইকবালের মেধা ও আগ্রহ দেখে বিশেষ স্নেহে তাঁকে পড়াতে শুরু করেন। প্রফেসর আরনল্ড ইংল্যান্ডের লোক। তাঁর রচনা শক্তি ছিলো ক্ষুরধার। জ্ঞান সন্ধানের আধুনিক পদ্ধতি সম্পর্কে তিনি ছিলেন খুবই সচেতন । এই অসাধারণ যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি ইকবালের আগ্রহ দেখে উৎসাহিত হলেন। নিজের যোগ্যতা থেকে কিছু দান করতে চাইলেন। বাস্তবে অনেকটা সফলও হয়েছেন। প্রফেসর আরনল্ড আলীগড়ে শিক্ষকতার সময় ইকবালের মতো আরেক মুক্তা পেয়েছিলেন। সেই মুক্তাকে তিনি তাঁর জ্ঞানভান্ডার থেকে অনেক কিছু দিয়ে যোগ্য একটি অলংকারে রূপান্তরিত করেছিলেন। তিনি হলেন ভারত উপমহাদেশের সর্বজন শ্রদ্ধেয় জ্ঞানী মাওলানা শিবলী নু'মানী (রহঃ)। প্রফেসর আরনল্ড মাওলানা শিবলী নু'মানীর মতো আরেক মুক্তা পেয়ে চমক সৃষ্টির সাধনায় লেগে গেলেন। ছাত্র-শিক্ষকের মধ্যে যে সুসম্পর্ক সৃষ্টি হয়েছিলো, তা শেষ পর্যন্ত ইকবালকে ইংল্যান্ড টেনে নিয়ে গেল। ইকবাল ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দর্শনশাস্ত্রে উচ্চ ডিগ্রী নিয়ে জার্মান হয়ে দেশে ফেরেন। তিনি ইংল্যান্ড অবস্থানকালে প্রচুর ফার্সী সাহিত্য চর্চা করেন। শেষ পর্যন্ত এই চর্চার সারমর্ম নিয়ে 'আসরার-ই-খুদী'

গবেষণাধর্মী দার্শনিক গ্রন্থ লিখে প্রকাশ করেন। জার্মান বিশ্ববিদ্যালয় এই গ্রন্থের জন্য তাঁকে ডক্টরেট ডিগ্রী প্রদান করে। ইকবালের এই গ্রন্থকে বিশ্বজ্ঞানীরা দর্শন শাস্ত্রের সারবত্তা বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন। কবি আবদুল কাদির বলেন, "প্রফেসর আরনল্ড এই ভেবে খুশি হলেন যে, আমার প্রচেষ্টা সফল হয়েছে এবং আমার ছাত্র ইকবাল আমার জন্য জ্ঞানের জগতে খ্যাতির শীর্ষ চূড়ায় আসীন হয়েছে। (–কুল্লিয়াতে ইকবাল)

ইকবাল তাঁর জ্ঞানের শীর্ষ মনযিলে পৌঁছতে যেমন পেয়েছেন যোগ্য পথপ্রদর্শক, তেমনি তিনি শিক্ষা নিয়েছেন বড় বড় জ্ঞানী ও আলেমদের কাছ থেকে। সিয়ালকোটের মৌলভী সৈয়দ মীর হোসাইন থেকে শুরু করে কবি দাগ, প্রফেসর আরনল্ড এবং ক্যামব্রিজের প্রফেসর ড. নিকলসনের নাম এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ড. নিকলসন ১৯২০ সালে প্রথমে ইকবালের প্রসিদ্ধ ফার্সী কবিতা আসরার-ই-খুদী ইংরেজীতে অনুবাদ করে সাথে ভূমিকা ও পাদটীকা লিখে ইউরোপ ও আমেরিকার জ্ঞানী মহলে ইকবালের পরিচিতি ঘটিয়েছিলেন। তৎকালীন সময়ে হিন্দুস্তানের জ্ঞানীদের মধ্যে যাদের সাথে ইকবালের সম্পর্ক ছিলো, তাঁর লেখায় তাদের অনেকের প্রভাব আশ্রয় নিতো। বিশেষ করে মাওলানা শিবলী নু'মানী, মাওলানা সালেহ, মরহুম আকবরের নাম উল্লেখযোগ্য। অন্যদিকে তাদের উপরও ইকবালের প্রভাব ছিলো। শিবলী নু'মানী তাঁর অনেক বক্তব্যে এবং মরহুম আকবর শুধু বক্তব্যেই নয়, অনেক কবিতায়ও আল্লামা ইকবালের কথা বলেছেন। প্রখ্যাত কবি ও গবেষক আব্দুল কাদির আল্লামা ইকবালের স্মৃতিচারণে বলেন ঃ

"১৯০১ ইংরেজীর আনুমানিক দু'তিন বছর পূর্বে লাহোরের এক কাব্যালোচনায় ইকবালের সাথে আমার প্রথম দেখা। এই মাহফিলে তিনি স্বদলে আসেন এবং তাদের দিয়ে কবিতা আবৃত্তি করান। তখনও লাহোরে ইকবাল তেমন পরিচিত নন। সেই দিন তিনি যে গজল পাঠ করেন, তা আকারে ছোট হলেও ছন্দ ও বিষয় ছিলো অসাধারণ। অনেক ভালো লাগলো। এরপর দু'তিন বার এই মাহফিলে তিনি এসেছেন। তাঁর কবিতা শুনে সুধীজন বুঝতে পেরেছিলেন যে, এ সম্ভাবনাময় কবি বিজয়ী বেশে শীঘ্রই ময়দানে আসছেন। এই কাব্যালোচনা সভা প্রথম দিকে শুধু লাহোর কলেজের ছাত্র এবং এমন কিছু লোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিলো, যারা সাহিত্যের সাথে সম্পর্কিত। তবে কিছু দিনের মধ্যে তা উন্নতমানের সাহিত্য মজলিসের রূপ নেয় এবং অনেক খ্যাতিমান ব্যক্তি উপস্থিত হতে থাকেন।

এই মজলিসের এক আসরে আল্লামা ইকবাল তাঁর 'হিমালয়' কবিতা পাঠ করেন। এই কবিতায় ইংরেজদের ধারণা, ফার্সী শব্দের গাঁথুনি এবং জন্মভূমির সৌন্দর্যের স্বাদ ছিলো। সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে বিপরীত স্রোতের কারণে এই কবিতা দারুণ গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে। ফলে বিভিন্ন মহল থেকে তা প্রচারের আহ্বান আসতে থাকে। কিন্তু ইকবাল সংশোধনীর অজুহাতে তা প্রকাশ করতে দিলেন না। আমি যখন উর্দূ ভাষা ব্যবহারের

উন্নতি সাধনে "রিসালা-এ-মাখযান" ম্যাগাজিন প্রকাশের ইচ্ছে করলাম, তখন ইকবালের সাথে আমার বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক হয়। তিনি অঙ্গীকার করেন, মাখযানের কবিতা বিভাগে কবিতা লেখার। প্রথম সংখ্যা প্রকাশের সময় আমি তাঁর কাছে গিয়ে কবিতা চাইলে তিনি তৈরী হয়নি' বলে জানালেন। আমি বললাম, 'হিমালয়' কবিতা দিয়ে দিন। কিন্তু তিনি দিতে চাইলেন না। তাঁর ধারণা ছিলো, এতে প্রচুর ক্রুটি রয়েছে। কিন্তু আমার ধারণায় এই কবিতাটি ছিল অসাধারণ। তাই জবরদস্তি করে কবিতাটি আমি নিয়ে আসি। মাখযানের প্রথম খন্ডে ইকবালের এই কবিতা প্রথম প্রকাশিত হয় এবং এটাই ইকবালের প্রথম প্রকাশিত উর্দু কবিতা। (– কুল্লিয়াতে ইকবালের ভূমিকা)

আব্দুল কাদির সম্পাদিত 'মাখযান' ম্যাগাজিন প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯০১ সালের এপ্রিল মাসে। এ থেকে আমরা বলতে পারি, ১৯০১ সালে আল্লামা ইকবালের কবিতা প্রথম ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত হয় এবং প্রথম প্রকাশিত কবিতা "হিমালয়"। ১৯০৫ সালে ইংল্যান্ড আসার পূর্ব পর্যন্ত ইকবাল নিয়মিত মাখযানে লিখেছেন। মাখযানের মাধ্যমে তাঁর প্রথম পরিচিতি আসে। এর পর বিভিন্ন মাহফিল থেকে কবিতা আবৃত্তির জন্য ইকবালের আহ্বান আসতে থাকে। ছাত্র জীবন শেষে ইকবাল সরকারী কলেজে অধ্যাপনা শুরু করেন। এই সময় তিনি রাত-দিন শিক্ষামূলক আলোচনা ও কর্মে প্রতিটি মুহূর্ত অতিবাহিত করেন। ইকবাল যখন মনোযোগ দিয়ে লিখতেন, তখন অনবরত কবিতা সৃষ্টি করে যেতেন। তিনি শুধু বলতেন, অন্যরা লিখতো। তাঁর কাব্যপ্রতিভা ছিল আল্লাহ্-প্রদত্ত। তিনি সাধারণ কবিদের মতো কাগজ-কলম নিয়ে শব্দ খুঁজে খুঁজে কবিতা লিখতেন না। ইকবালের কবিতা সৃষ্টির খরগতি দেখে অনেকেই স্বীকার করেছেন যে, "ইকবাল সঞ্চিত বাক্যচিত্তে প্রবাহিত এক সমুদ্র বা বহমান এক ঝর্ণা।"

তাঁর কবিতা সৃষ্টি হতো অকস্যাৎ এবং বিশেষ অবস্থার ভাবাবেশে। এখানে ইকবালের সাথে মাওলানা রুমির প্রচুর মিল রয়েছে।

রুমী গবেষকগণ মনে করেন 'রুমী সাধারণ অর্থে কবি নন, কাব্য তাঁর জীবনের সাধনা-তপস্যার অমৃতময় ফল। কাব্য তাঁর বিলাস নয়, তাঁর অতীন্দ্রীয় ও আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার বাহন'। অন্যদিকে মাওলানা রুমির কবিতা যেমন সাধারণ অনুবাদকের দ্বারা ব্যাখ্যা সহজসাধ্য নয়, তেমনি ইকবালের ক্ষেত্রেও। এখানে শুধু অনুবাদ বা গবেষক হলেই কাজ সমাধা হবে না, বরং এর সাথে প্রয়োজন হৃদয়ের ঔজ্জ্বল্য ও সাধনালব্ধ অভিজ্ঞতা। আমরা উদাহরণ হিসাবে বলতে পারি, বাংলা ভাষায় যারা ইকবাল অনুবাদ করেছেন, তাদের অনেকেই ব্যর্থ হয়েছেন। এদের মধ্যে এমন অনেকও আছেন, যারা উর্দু, ফার্সী এবং বাংলায় স্কলার। অথচ এক্ষেত্রে কবি ফররুখ আহমদের সফলতা অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। কবি ফররুখ আহমদ কিন্তু ফার্সী জানতেন না। তিনি ইংরেজী থেকে অনুবাদ করে শুধু হৃদয়ের আলো আর সাধনালব্ধ অভিজ্ঞতা দিয়ে সফল হয়েছেন। কেননা আল্লামা ইকবালের সাথে কবি ফররুখ আহমদের আদর্শিক সম্পর্ক ছিলো, তাঁর ছিলো হৃদয়ের ঔজ্জ্বল্য।

আল্লামা ইকবালের একটি বিশেষ গুণ ছিলো, তিনি সুমধুর কণ্ঠে গানের মতো কবিতা পড়ে নিজেও হর্ষ উল্লাস করতেন এবং অন্যদেরকেও এতে শরীক করতেন। তাঁর মেধাশক্তি এতই সুতীক্ষ্ণ ছিলো যে, কোন কবিতা একবার শুনলে মুখস্থ হয়ে যেত এবং তা ভুলতেন না। কবিদের মধ্যে এমন স্মৃতিধর কবির কথা আমরা আর শুনিনি। কারো নির্দিষ্ট করে দেয়া বিষয়ের উপর ইকবাল কবিতা লিখতেন না এবং এমন মানসিকতাও তাঁর ছিলো না। অনুরোধ অনুযায়ী কবিতা লেখার মানসিকতা না থাকায় তিনি বেশির ভাগ অনুরোধ রক্ষায় অপারগতা প্রকাশ করতেন। ইকবালের বন্ধু কবি আব্দুল কাদির বলেন ঃ

শুধুমাত্র লাহোরের "আঞ্জুমানে হেমায়েত-এ-ইসলামে"র বার্ষিক জলসায় ইকবাল বেশ কয়েকবার গিয়েছেন এবং কবিতা পাঠ করেছেন। প্রথম দিকে তিনি কবিতার মতো আবৃত্তি করতেন। কিন্তু এবার কিছু বন্ধু অনুরোধ করলেন সুর দিয়ে গানের মতো কবিতা পড়তে। এরপর তিনি সুর দিয়েই পড়তেন। ইকবালের কণ্ঠে ছিলো মহান আল্লাহ পাকের এক বিশেষ দান; যেমন ছিলো দরাজ তেমনি সুমিষ্ট। হেমায়েত-এ-ইসলামের বার্ষিক জলসায় ইকবালের কবিতা আবৃত্তি শোনার জন্য প্রায় বিশ-পঁচিশ হাজার শ্রোতার সমাবেশ ঘটতো। যতক্ষণ তিনি আবৃত্তি করতেন, ততক্ষণ শ্রোতারা নীরব বসে থাকতো। যারা এর সারমর্ম বুঝতো, তারা তো মুগ্ধ হতোই, এমনকি যারা বুঝতো না তারাও মুগ্ধ হতো। (− কুল্লিয়াতে ইকবালের ভূমিকা)

আল্লামা ইকবালের কবি জীবনের দ্বিতীয় অধ্যায় শুরু হয় ইউরোপ অবস্থানকালে। সময়টা হলো ১৯০৫ থেকে ১৯০৮ সাল। ইংল্যান্ড অবস্থানকালে তিনি কবিতা লেখায় তেমন সময় দিতে পারেননি। একেবারে লিখেননি তা কিন্তু নয়। খুব কম লিখেছেন। তবে সেই কবিতাগুলো আলাদা বৈশিষ্টের কারণে সুধী মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। কবি আব্দুল কাদির বলেন ঃ

"ইকবালের তিন বছরের ইংল্যান্ড অবস্থানকালীন সময়ের দু'বছর আমি সেখানে ছিলাম, প্রায় দিন দেখা হতো। একদিন ইকবাল আমাকে বললো, সে স্থির সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, আর কবিতা লিখবে না, কসম করে, কবিতা চর্চা ছেড়ে দেবে। কবিতা লিখে যে সময় নষ্ট হয়, তা সে অন্য কজে ব্যয় করবে। আমি বললাম, দেখ তোমার কাব্য চর্চা ত্যাগ করা ঠিক হবে না। তোমার কবিতায় যে ভাব ও আবেগ রয়েছে, তা আমাদের জাতি জাগৃতিতে মোক্ষম হাতিয়ার হবে। তোমার আল্লাহ্-প্রদত্ত কাব্য প্রতিভাকে কখনো ধ্বংস করা উচিৎ নয়। একথা শুনে ইকবাল কিছু দুর্বল হলেন এবং কবিতা লেখা থেকে নিবৃত্ত হলেন না। তবে এই প্রতিজ্ঞা করলেন, প্রফেসর আরনল্ড যে রায় দেবেন, তার উপর শেষ সিদ্ধান্ত হবে। জ্ঞান রাজ্যের সৌভাগ্য বলতে হবে যে, প্রফেসর আরনল্ড সিদ্ধান্ত দিলেন যে, ইকবালের জন্য কাব্যচর্চা ত্যাগ মোটেও জায়েয নয়। তিনি কবিতায় যে সময় নষ্ট করেন, তা নিজের জন্যই শুধু নয় বরং দেশ ও জাতির জন্যও উপকারী।

ইকবালের মধ্যে কবিতা ত্যাগের যে চিন্তা এসেছিলো, তা এখানেই শেষ হয়ে গেলো। (–কুল্লিয়াতে ইকবাল)

এরপর ইকবাল নতুন ধারায় অগ্রসর হতে থাকেন। অর্থাৎ-ইকবাল তখন ফার্সীকে উর্দূর স্থানে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করলেন। তাঁর সুফিবাদী চিন্তাগত দর্শন জ্ঞানের সাথে গভীরভাবে পরিচিত এবং সুন্দর চিন্তাধারা প্রকাশের দিকে দৃষ্টি দিয়েছেন যারা, তারা অবশ্যই লক্ষ্য করছেন যে, এখানে ফার্সীর মোকাবেলায় উর্দূর মূলধন খুব কম।

ইকবালের ফার্সীতে প্রবেশের মধ্যে একটি ঘটনা আছে। একদিন এক বৈঠকে বন্ধুমহল থেকে ইকবালকে ফার্সী কবিতা আবৃত্তির অনুরোধ করা হলো। অনেকে জানতে চাইলেন, তিনি ফার্সী কবিতা জানেন কি না? প্রত্যুত্তরে তিনি বললেন, "দু'একটি কবিতা পাঠ ছাড়া কখনো ফার্সী কবিতা লেখার চেষ্টা করিনি।" এই বৈঠক থেকে উঠে এসে ইকবাল বাকী রাত ফার্সী কবিতা লেখার চেষ্টা করেন। রাতে দু'টি কবিতা সৃষ্টি করে ফেলেন। এই থেকেই ইকবালের ফার্সী কবিতার জগতে আত্মনিয়োগ। ইংল্যান্ড থেকে ফিরে ইকবাল উর্দূ কবিতা লিখলেও তাঁর আকর্ষণ ছিলো ফার্সীর প্রতি। ইকবাল সুফিবাদ বিষয়ক লেখার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন সম্ভবত কবি হাফিজের প্রভাবে। ইকবালের সময়ে বিশ্বের বড় বড় কবিদের উপর হাফিজের প্রভাব ছিলো প্রচণ্ড। আমরা যদি লক্ষ্য করি, ইকবালের সমকালীন বাংলা ভাষার কবি রবীন্দ্রনাথের উপর হাফিজের প্রভাব যেমন ছিলো, তেমনি প্রখ্যাত জার্মান কবি গ্যাটেও হাফিজ দ্বারা অনুপ্রাণিত ছিলেন। অনেকে তো রবীন্দ্রনাথের অনেক কবিতাকে হাফিজের অনুবাদ মনে করেন। তবে হাফিজ দ্বারা অনুপ্রাণিত কবিদের সাথে জীবনবোধ ও চেতনার ক্ষেত্রে ইকবালের বিরাট পার্থক্য ছিলো। তারা মরমী বা সূফী ধারায় শুধু প্রেমের কবি হিসাবে খ্যাতি লাভ করেছেন। কিন্তু আল্লামা ইকবাল যেমন ছিলেন প্রেমের কবি, তেমনি জাগরণের কবি, স্বাধীনতার কবি, ওহীর রসে উজ্জীবিত কবি। সত্য কথা বলতে কি, ইকবাল শেষ পর্যন্ত গালিবকে অতিক্রম করে গিয়েছিলেন। ইকবালের সাথে আমরা বাংলা ভাষার কবিদের মধ্যে প্রথমে কাজী নজরুল ইসলাম এবং পরে কবি ফররুখ আহমদের একটা মিল খুঁজে পাই। যদিও এই তিন কবির মধ্যে আধ্যাত্মিকতায় ফররুখ অনেক উপরে এবং আমলী জীবনে অত্যন্ত মুত্তাকী ছিলেন।

১৯০৮ সালের পর ইকবালের কাব্যচর্চায় নতুন ধারা সৃষ্টি হয়। ফার্সী ভাষাকে উর্দূতে নিয়ে আসার যে চিন্তা তাঁর মাথায় ছিলো, তা আস্তে আস্তে কাগজে প্রকাশ হতে থাকে। আসরার-ই-খুদী, যবুরে আজম, জাবীদ নামা, পাস চে বায়াদ কার্দ আয় আকওয়ামে গারব ইত্যাদি এরই ফসল। এর মধ্যে আসরার-ই-খুদী গ্রন্থকে বলা হয় ইকবালের মসনবী। এই গ্রন্থই ইকবালকে বিশ্ব সাহিত্যাঙ্গনে পরিচিত করে তুলেছে। ইকবালের আরো দু'টি ফার্সী গ্রন্থ হলো–রুমুয-ই-বেখুদী এবং পয়াম-ই মাশরিক। এই বইগুলো অসাধারণ বুদ্ধিভিত্তিক। রুমুয-এ-বেখুদী ভাষার দিকে অত্যন্ত সহজ এবং

দর্শনের দিকে অসাধারণ। পয়াম-ই-মাশারিক ইকবালের বিরাট এক কৃতিত্ব। এই বই এর ভাষা রুমুয-এ-বেখুদী থেকেও সহজ। ইকবালের ফার্সী চর্চা দেখে উর্দুভাষী ইকবাল ভক্তরা অত্যন্ত নিরাশ হয়ে গিয়েছিলেন। বাস্তবে কিন্তু যে কাজ উর্দুতে সম্ভব হয়নি, তা ইকবাল ফার্সীতে করেছেন। তাছাড়া ইকবাল ভক্তদের আনন্দিত হওয়ার কথা যে, তৎকালীন সময় গোটা মুসলিম বিশ্বে ফার্সী চর্চার প্রভাব ছিলো।

ফার্সী চর্চার মাধ্যমে ইকবাল মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে পৌঁছতে সক্ষম হয়েছেন। তাছাড়া ইকবালের দৃষ্টিভঙ্গি এত উত্তম ও সুন্দর ছিলো যে, তার বিস্তৃত প্রচারটা জরুরী ছিলো। স্বীকার করতেই হবে যে, ফার্সী চর্চার কারণে ইকবালের মতো যোগ্য লেখককে অতি দ্রুত পাশ্চাত্যের সাহিত্যিকগণ জানার সুযোগ পেয়েছেন। ইউরোপের একজন উচ্চমানের কবির লেখা 'পাশ্চাত্যের শান্তি' গ্রন্থের উত্তরে ইকবাল 'পয়াম-ই-মাশরিক' (প্রাচ্যের বাণী) লিখেছেন। এতে অত্যন্ত সুন্দরভাবে চিকিৎসামূলক দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ ঘটেছে। এই গ্রন্থে তিনি অনেক বড় বড় জটিলতার সমাধান দিয়েছেন, যা এর পূর্বে এত সুন্দর করে আর কেউ দেননি। 'পয়াম-ই-মাশরিক' প্রকাশিত হওয়ার পর সুধী মহলে আল্লামা ইকবাল 'তরজুমানে হাকীকত' (সত্যের মুখপাত্র) হিসাবে উপাধি লাভ করেন। এই বইয়ের কবিতাগুলো থেকে প্রমাণিত হয় যে, যিনি প্রথমে এই উপাধি উচ্চারণ করেন, তিনি মোটেও অতিশয়োক্তি করেননি। ইকবালের ফার্সী চর্চার প্রভাব উর্দূ চর্চায়ও পড়েছিলো। ইকবালের উর্দু কবিতা গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'বাঙ্গে দারা' "বালে জিব্রীল" এবং "যরবে কলীম"। আল্লামা ইকবালের জীবনের শেষপ্রান্তে এসে ১৯৩৬ ইংরেজীতে 'যরবে কলীম' প্রকাশিত হয়। আল্লামা ইকবালের কবিতার মধ্যে 'শেকওয়াহ' ভারতবর্ষের মুসলমানদের অনেককে মর্মাহত করেছিলো। এই সময় কেউ কেউ তাঁকে 'কাফের' ফতোয়াও দিয়েছিলেন। তৎকালীন ভারতবর্ষের সর্বজন শ্রদ্ধেয় শায়খুল হাদীস আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী (রঃ) এই ফতোয়ায় অংশ না নিয়ে সরাসরি লাহোর এসে কবির সাথে দেখা করেন এবং এক মাস কবির বাড়ীতে অবস্থান করে 'জওয়াবে শেকওয়াহ' লেখিয়ে ফতোয়া প্রত্যাক্ষাণ করান। ঢাকার সুপ্রতিষ্ঠিত ইসলামিক ম্যাগাজিন 'মাসিক মদীনা'র সম্পাদক মাওলানা মুহিউদ্দীন খানের কাছে জানতে চেয়েছিলাম এই ফতোয়া সম্পর্কে? তিনি বলেন, "ফতোয়া মূলত এই কবিতার জন্য ছিলো না। ইকবাল তখন কাদিয়ানী সম্প্রদায়ের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন, মূলত ফতোয়া ছিলো তার উপরই। আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী (রঃ) ইকবালকে কাদিয়ানীরা যে মুসলমান নয়, তা বোঝাতে সক্ষম হওয়ায় ইকবাল এর পর কাদিয়ানীদের বিরুদ্ধে লিখেন। ইকবাল কাদিয়ানীদের বিরুদ্ধে যে প্রবন্ধ লিখেছেন, এই বিষয়ে এর মতো উন্নত প্রবন্ধ আজ পর্যন্ত কেউ লিখতে পারেননি। আল্লামা ইকবাল মুসলিম জাগরণের কবি ছিলেন। ভারতবর্ষের মুসলমানদের স্বাধীনতার জন্য পৃথক মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্নদ্রষ্টা ছিলেন। ১৯৩৮ সালের ২১শে এপ্রিল ইকবাল তাঁর

হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষিত মাবুদের সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে চিরদিনের জন্য এ গ্রহ ত্যাগ করেন।

আল্লামা ইকবালকে আমাদের দেখার সুযোগ হয়নি। এই সুযোগও আর নেই। তেইশে মার্চ ১৯৯৯ সালের সকালে লাহোর বাদশাহী মসজিদের নিকটস্থ আল্লামা ইকবালের মাজার জিয়ারতে যাই। অত্যন্ত সংরক্ষিতভাবে সম্মানজনক অবস্থায় মর্মর পাথরের কবরটি দু'জন পুলিশের পাহারায় রয়েছে।

২৩শে মার্চ ছিলো পাকিস্তান জাতীয় দিবস, তাই ফুলে ফুলে ঢাকা গোটা মাজার। মাজারের সামনে পাকিস্তানের জাতীয় পতাকা পত পত করে উড়ছিলো। ভক্তরা জিয়ারতের উদ্দেশ্যে আসা-যাওয়া করছেন। সূরা ফাতিহা পাঠ করে মহান আল্লাহ্ পাকের কাছে প্রার্থনা করলাম– হে প্রভু! তুমি ইকবালকে হাশরের বিচারেও সৌভাগ্যবান করো।

লাহোর দুর্গ

লাহোর শহরের উত্তর-পশ্চিম কোণে ঐতিহাসিক লাহোর দুর্গ। ১১৮৬ খৃস্টাব্দে আফগান শাসক শাহাব উদ্দিন ঘোরী কর্তৃক তা প্রতিষ্ঠিত। শাহাব উদ্দিন ঘোরী সম্পর্কে আফগানিস্তানের ইতিহাস পর্বে আলোচনা করা হয়েছে। ১২৪১ খৃস্টাব্দে এই দুর্গ মোগলদের দখলে যায় এবং ১২৬৭ খৃস্টাব্দে তার সংস্কার করা হয়। ১৩৯৮ খৃস্টাব্দে আমীর তাইমুর দুর্গটি ধ্বংস করে দেয়। সুলতান মোবারক শাহ ১৪২১ খৃস্টাব্দে দুর্গটি পুনঃসংস্কার শুরু করলে পাঁচ মাসের ভেতর তা আবার ধ্বংস করে দেওয়া হয়। ১৪৩২ খৃস্টাব্দে শেখ আলী তা পুনঃসংস্কার করেন। হুমায়ূনের শাসনামলে কাবুল থেকে মির্জা কামরানের আগমন উপলক্ষে দুর্গের গেইট তৈরী করা হয়। বাদশাহ আকবর পুরাতন মাটির দুর্গটি ভেঙ্গে চুন সুড়কী দিয়ে শক্ত দুর্গ তৈরী করেন। বাদশাহ জাহাঙ্গীর আকবরের শীশ মহল, গোসলখানা, খাবখানা এবং দেওয়ানে খাস ভেঙ্গে ১৬৪৬ খৃস্টাব্দে তার নিজের জন্য "দৌলতখানা-এ-খাস ও আম" প্রাসাদটি তৈরী করেন। বাদশাহ শাহজাহানের শাসনামলে এই প্রাসাদের নিকটে ৪০টি স্তম্ভ দিয়ে "দেওয়ানে আম" প্রাসাদটি তৈরী করা হয়। ১৭৯৯ ইংরেজীতে ইংরেজদের সহযোগিতায় লাহোর দুর্গ শিখ রাজা রনজিত সিং-এর দখলে চলে যায়। চল্লিশ বছর তা রনজিত সিং-এর দখলে ছিলো। ১৮৩৯ খৃস্টাব্দে রনজিত সিং-এর মৃত্যুর পর ১৮৪৬ খৃস্টাব্দে বৃটিশরা সরাসরি তা দখল করে নেয়। বৃটিশরা তাদের প্রয়োজন মতো দুর্গের কোন অংশকে জেল হিসাবে ব্যবহার করেছে এবং কোন অংশকে ঘোড়া রাখার স্থান। ১৯২৪ সালে বৃটিশ প্রত্নতাত্ত্বিকদের কাছে হস্তান্তরের পর প্রায় পাঁচ বছর লেগেছে এর আবর্জনা পরিষ্কার করতে। বর্তমানে পাকিস্তান সরকারের সংরক্ষণে তা একটি আকর্ষণীয় পর্যটন এলাকা।

২৪শে মার্চ সকালে আল্লামা ইকবালের কবর জিয়ারত শেষে ঐতিহাসিক লাহোর দুর্গের ভেতরে গেলাম।

আলমগীরী গেইট

মোগল শাসকদের মধ্যে জিন্দাপীর বলে খ্যাত আদেল বাদশাহ সম্রাট মুহিউদ্দিন আলমগীর ওরফে আওরঙ্গজেব। তিনি যেমন ছিলেন ইসলামী নীতিতে একনিষ্ঠ, তেমনি জ্ঞানী। তাঁর শাসনামলে রাজ্য পরিচালনার জন্য বিজ্ঞ এবং মুত্তাকী উলামা কর্তৃক একটা শরিয়তসম্মত আইন গ্রন্থ রচনা করা হয়েছিলো। যা ফতোয়া-এ-আলমগীরী হিসাবে বিশ্বব্যাপী বিখ্যাত। আজো মুসলমানরা অনেক সমস্যার ইসলামসম্মত সমাধানের জন্য ফতোয়া-এ-আলমগীরীর শরণাপন্ন হয়ে থাকেন। ১৬৭৩ খৃস্টাব্দে সম্রাট আলমগীর বাদশাহী মসজিদে যাতায়াত পথে একটি বিরাট গেইট স্থাপন করেন। বর্তমানে এটি লাহোর দুর্গের প্রধান গেইট হিসাবে ব্যবহার করা হয়। 'আলমগীরী গেইট' হিসাবেই ইতিহাসে এই গেইট পরিচিত।

মুতি মসজিদ

বাদশাহ জাহাঙ্গীরের শাসনামলে (১৬১৭–১৮) মামুর খানের তত্ত্বাবধানে সাদা মার্বেল পাথর দিয়ে একটি মসজিদ তৈরী করা হয়। মসজিদের গম্বুজ দেখতে মুতি পাথরের মতো বলেই তা মুতি মসজিদ হিসাবে খ্যাত। আমাদের জানা মতে, ভারতে এ রকম আরো তিনটি মুতি মসজিদ আছে। যার একটি হলো আগ্রা দুর্গের ভেতর, এটি তৈরী করেছিলেন সম্রাট শাহজাহান। দ্বিতীয়টি হলো দিল্লী দুর্গের ভেতর, এটি তৈরী করেছিলেন সম্রাট আওরঙ্গজেব, তৃতীয়টি হচ্ছে পুরাতন দিল্লীতে, যা তৈরী করেছিলেন শাহ আলম বাহাদুর শাহ। ১৭৯৯ সালে রাজা রনজিত সিং কর্তৃক লাহোর দুর্গ মুসলমানদের হাত থেকে চলে যাওয়ার পর শিখরা অত্যন্ত অসম্মানজনকভাবে মসজিদটিকে সরকারী কোষাগার হিসাবে ব্যবহার শুরু করে। মসজিদের পাঁচ দরজার মধ্যে চারটিকে তারা বন্ধ করে দেয় এবং প্রধান দরজাকে মজবুত করে রাখার ব্যবস্থা করে। মসজিদের নিকটস্থ যে অংশে মোগল বাদশাহদের আদালত বসতো, সেখানে পাহারাদারদের থাকার সুবিধা করে দেওয়া হয়। মার্বেলের তৈরী গম্বুজের পাশে বক্স করে পাহারাদারের চৌকি বসানো হয়। মসজিদের ভিটায় গর্ত করে নীচে স্বর্ণ-রৌপ্য এবং মুদ্রা রাখার ব্যবস্থ' করা হয়। দীর্ঘ চল্লিশ বছর এই অবস্থায় ছিলো। ১৯০০ খৃস্টাব্দের ৭ই ফেব্রুয়ারী বেঙ্গলে এক বক্তব্যে লর্ড কার্জন বলেন ঃ

"When I was at lahore in April last I found the exquisite little Moti masjid or peari mosque in the fort which was created by jahangir exactly three hundred years ago, still used for the profane purpose to which it had been converted by Ranjit Singh viz as a Government treasury."

(Splendour of lahore fort by Md Aasim Dogar, P-31)

অর্থাৎ–আমি ১লা এপ্রিল যখন লাহোর যাই, তখন দেখতে পাই, দুর্গের ভেতর ছোট একটি মুতি মসজিদ। এই মসজিদটি জাহাঙ্গীর তিনশ' বছর পূর্বে তৈরী করেছিলেন। রনজিত সিং কর্তৃক তা পরিবর্তন করে কোষাগার হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। আমি এই সুন্দর বিল্ডিংকে তার পূর্বের অবস্থায় নিয়ে যেতে চাইলাম। এই সুন্দর বিল্ডিং-এর প্রকৃত রূপ রনজিত সিং-এর সময় শতকরা একজনও দেখতে পায়নি।"

শেষ পর্যন্ত ১৯০৩-৪ খৃস্টাব্দে লর্ড কার্জনের নির্দেশে মুতি মসজিদ পুনঃসংস্কার করা হয়। এই মসজিদের অস্তিত্ব এখনো থাকলেও নামাজ পড়া হয় না।

টেম্পল -এ লুহ

আলমগীরী গেইটের পাশে দুর্গের দক্ষিণ পশ্চিম দিকে পুরাতন গেইটে যাওয়ার পথে একটি শিখ টেম্পল রয়েছে, যা রামার ছেলে লুহের নাম অনুসারে টেম্পল-এ লুহ হিসেবে পরিচিত। বৃটিশদের দখলে লাহোর দুর্গ যাওয়ার পর তারা এই টেম্পলকে মদের গুদাম হিসেবে ব্যবহার করে।

দেওয়ান-এ-আম

মোগল শাসকদের বিলাসিতার স্মৃতি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে আজো লাহোর দুর্গে বাদশাহ আকবর কর্তৃক নির্মিত "দেওয়ান-এ-খাস ও আম"। ঐতিহাসিকদের মতে, লাহোর দুর্গে মোগলদের সবচাইতে পুরাতন প্রাসাদ এটি। ১৫৪৭ খৃস্টাব্দের ২৯শে ডিসেম্বর বাদশাহ আকবর এই প্রাসাদের কাজ সমাপ্তির পর এক বিরাট উৎসবের আয়োজন করেছিলেন বলে ঐতিহাসিকরা উল্লেখ করেছেন। এই প্রাসাদে হাওয়াখানাসহ মোট ১১৪টি রুম ছিলো। বাদশাহ যে স্থানে দাঁড়িয়ে প্রজাদের সামনে বক্তব্য দিতেন, তা হলো দেওয়ান-এ-আম। যা ছিলো মার্বেল পাথরের তৈরী এবং এর পেছনে ১২টি রুম ছিলো।

দেওয়ান-এ-খাস

লাহোর দুর্গের উত্তর দিকের মধ্যভাগে ৫৩ ফুট লম্বা ৫১ ফুট প্রস্থ এবং ২০ ফুট ৫ ইঞ্চি উচুঁ মার্বেল পাথরের তৈরী দেওয়ান-এ-খাস। এখানে রাজা অবসর সময় স্বপরিবারে প্রকৃতিকে উপভোগ করতেন বলে এর অপর নাম 'হাওয়া খানা'। দেওয়ান-এ-খাসের দক্ষিণ দিকে অবস্থিত খাবগাহ, অর্থাৎ স্বপ্নপুরী। এর পাশেই তুর্কি হাম্মামখানা অর্থাৎ-গোসলখানা। খাবগাহ ও হাম্মামখানার মূল্যবান জিনিসগুলো শিখ ও বৃটিশরা নিয়ে যায়। হাম্মামখানার মূল্যবান ধাতব দ্রব্য খুলে নিয়ে বৃটিশরা কাঠ লাগিয়ে রাখে। হাম্মামখানার ভেতর হয়ে পশ্চিম দিকে ছোট রাস্তায় অগ্রসর হয়েই একটা খোলা গুমেআজ ছিলো, যার নাম দরদগাহ, অর্থাৎ বেদনাস্থল। গোসলের পূর্বে রাজা-রাণী এখানে বসে সুখ-দুঃখের কথা বলতেন।

শীশ মহল

বাদশাহ্ শাহজাহান তাঁর স্ত্রী মমতাজ মহলের জন্য একটি আকর্ষণীয় প্রাসাদ তৈরী করেছিলেন। তাজমহল তৈরীর পূর্বে তা ছিলো দুনিয়ার সবচাইতে সুন্দর প্রাসাদ। কিন্তু মমতাজ মহলের আর এই মহলে থাকা হলো না। এর পূর্বেই তিনি মারা গেলেন। মমতাজকে আগ্রায় কবর দিয়ে শাহজাহান সেখানে শীশ মহল থেকেও আকর্ষণীয় সৌধ তৈরীর পরিকল্পনা করলেন। মোগল সাম্রাজ্যের বড় বড় কারিগরকে ডেকে স্মৃতিসৌধ গড়ার নির্দেশ দেয়া হলো। কারিগররা তাদের সম্পূর্ণ মেধা ও শ্রম ব্যবহার করে তৎকালীন পৃথিবীর সবচাইতে আকর্ষণীয় সৌধটি তৈরী করলো। আর এটাই হলো তাজমহল। বাদশাহ্ শাহজাহান তার স্ত্রীর প্রেমে যে প্রাসাদ তৈরী করেছিলেন, তা আজো বিশ্ব প্রেমিক-প্রেমিকার ভ্রমণ স্থান হিসাবে শীর্ষে রয়েছে।

এদিকে শিখ রাজা রনজিত সিং-এর সময় শীশ মহল তাঁর সরকারী অফিস হিসাবে ব্যবহার করা হয়। ইংরেজ ঐতিহাসিককদের মতে শিখরা শীশ মহলের মূল্যবান সবকিছু খুলে নিয়ে গেছে। শীশ মহলের পূর্ব দেয়ালের পাশে ছোট একটি মহিলা মসজিদ ছিলো। শীশ মহলের পর এটাই ছিলো লাহোর দুর্গের সবচাইতে আকর্ষণীয় বিল্ডিং। রাজা রনজিত সিং মসজিদ ভেঙ্গে মূল্যবান জিনিস নিয়ে তার নিজের ব্যবহারের জন্য একটি প্রাসাদ তৈরী করে। সেখানে এখান সাদা মারবেলের তৈরী ভিটা রয়েছে।

মসজিদী গেইট

বাদশাহ আকবর লাহোর দুর্গের পূর্ব দিকে একটি গেইট নির্মাণ করেছিলেন। এই গেইটের পাশে ১৬১৩ সালে আকবরের স্ত্রী মরিয়ম জামানী একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। মসজিদে যাওয়ার পথে গেইটটি ছিলো বলে তাকে মসজিদী গেইট বলা হতো। কিন্তু শিখ শাসনামলে এই নাম বিকৃত করে বলা হতো "মস্তী গেইট" অর্থাৎ পাগলের দরজা। যেহেতু ইংরেজরা শিখদের কাছ থেকে লাহোর দুর্গ নিয়ে গিয়েছিলো, তাই তারাও এই নাম ব্যবহার করে।

শালিমার বাগ

বর্তমান পাকিস্তানের প্রসিদ্ধ ও আকর্ষণীয় একটি পার্ক শালিমার বাগ। লাহোর দূর্গের সাথে এই পার্কের ঐতিহাসিক যোগসূত্র রয়েছে। দুর্গের গেইট থেকে বর্তমানে পার্কের গেইট কিছুটা দূরত্বে হলেও পেছন দিকে কিন্তু গায়ে গায়ে লাগানো। রাজা-রাণীরা এখানে এসে প্রেম প্রেম খেলা খেলতেন। নব্য প্রেমিক-প্রেমিকাদের জোড়ায় জোড়ায় বসে থাকাও চোখে পড়ার মতো। শালিমার বাগ থেকে বের হয়ে টেক্সী করে হোটেলে ফেরার পথে ড্রাইভার প্রায় ক্ষুব্ধ হয়ে বললোঃ "–যদি রাজা-বাদশাহরা এত বিলাসিতা না করতো, তবে আজ ভারতবর্ষের মুসলমানদের এত দুর্ভোগ হতো না। হযরত ওমর (রাঃ) তো খেজুর গাছের নীচে বসে অর্ধবিশ্ব শাসন করেছেন।"

সালাম পাকিস্তান

লাহোর থেকেই শুরু হলো আমার বিদায়পর্ব। সন্ধ্যা ছয়টায় ট্রেনে উঠি। ট্রেন সার্ভিস বাংলাদেশ থেকে তেমন উন্নত নয়। সকাল দশটায় করাচী পৌঁছার কথা থাকলেও আসতে আসতে দুপুর হয়ে যায়। করাচীর অবস্থা গোটা পাকিস্তানের মধ্যে উচ্ছৃংখল। এখানে প্রকাশ্য অস্ত্র প্রদর্শনী নিয়মিত একটি ব্যাপার। পুলিশের চরিত্র সম্পর্কে পূর্বেই বলা হয়েছে। মানুষের জান-মালের কোন নিরাপত্তা নেই। এরপরও করাচীতে আমার তিন দিন থাকতে হলো। এত অনিয়ম আর উচ্ছৃংখলার মধ্যেও এ করাচীকে আমার কাছে নিজের শহর বলে মনে হয়েছে। এর প্রধান কারণ হয়তো এই শহরে প্রচুর বাংগালীর অবস্থান। অনেকের সাথেই বাংলা ভাষায় মন খুলে কথা বলা সম্ভব হয়েছে। করাচীর মাদ্রাসাগুলোতে প্রচুর বাংগালী ছাত্র-শিক্ষক রয়েছেন। আমার ছোট বেলার সহপাঠি আব্দুল মুনতাকিম পাকিস্তানের সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি মুফতি তকী উসমানী সাহেব কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 'সেন্টার ফর ইসলামিক ইকনমিক্স'-এর পরিচালকের দায়িত্বে রয়েছে। এছাড়া সে ইতোমধ্যে পাকিস্তানের জাতীয় পত্রিকা দৈনিক জংগ-এর নিয়মিত লেখক হিসাবে অনেকটা সুপরিচিত হয়ে উঠেছে। দীর্ঘ বার বছর পর তার সাথে দেখা হওয়ায় অনেকটা আনন্দিত হলাম।

কান্দাহারে নির্মিতব্য (ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়) জামেয়া ওমর

কাবুল ঃ সেকালের সিনেমা হল এখন সমাজসেবা কার্যালয়